কামিনী রায়ের অগ্রন্থিত গদ্যরচনা

ভূমিকা

অলোক রায়

সংকলন

অভিজিৎ সেন

অনিন্দিতা ভাদুড়ী

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।

পরিচিন্তন

এখনকার শিশুদের কথা জানি না। আমাদের শৈশবে স্কুলে পড়বার সময়ে কামিনী রায়ের কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটত, কারণ তখন যে-কোনো স্কুলপাঠ্য বইতে অবধারিতভাবে স্থান পেত তাঁর কবিতা। বিশেষভাবে 'সুখ' নামে কবিতাটি যার শেষ স্তবক আমাদের সকলেরই কণ্ঠস্থ ছিল—

> আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
> আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
> সকলের তরে সকলে আমরা,
> প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। (সুখ, *আলো ও ছায়া*)

অবশ্য কবিতার প্রথমাংশের সঙ্গে শেষাংশের একটা আপাতবিরোধ আছে। কবিতাটি শুরু হয়েছিল 'বিষাদ, বিষাদ, সর্বত্র বিষাদ, নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই/কাঁদিবার তরে মানব জীবন, যতদিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।' —এই আকৃতি নিয়ে। তারপর যেন বিষাদের প্রত্যুত্তর হিসেবে 'আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর...কার্যক্ষেত্র অই প্রশস্ত পড়িয়া, সমর-অঙ্গন সংসার এই' ইত্যাদি তত্ত্বকথার অবতারণা করা হয়েছে। জীবনসায়াহ্নে কবি পত্রে জানিয়েছেন, "১৮৮০ সালের জুন মাসের ৩০শে তারিখ মীরজাফার্স লেনের বাড়িতে রচিত। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার ছয় মাস পূর্বের লেখা। পরে ইহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত—সর্বদাই জানাইতেন যে, তাঁহার জীবন দুঃখময় এবং ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্ধকার। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ছলেই, এবং তিনি প্রবাসে যাইবার পূর্বে আমার নিকট একটি কবিতা চাহিয়াছিলেন সেজন্যও বটে, আমি এই কবিতা রচনা করি। 'গিয়াছে ভাঙিয়া সাধের বীণাটি সে আমার'—আমার বীণা নহে। সকলের ভাল লাগিয়াছে বলিয়া এটা রাখিয়া দিয়াছিলাম। নতুবা বয়সের অনুচিত 'পাকামি' হইয়াছে বলিয়া কবে ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। সাড়ে পনের বৎসর ছিল তখন আমার বয়স। তৎপূর্বে আমি কবে সংসারে প্রবেশ করিলাম, আমার বিশেষ দুঃখ কি, নৈরাশ্য কেন—এ সকল প্রশ্ন অনেকে করিয়াছেন, উত্তর দিবার ছিল না।" (দ্র. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বঙ্গের মহিলা কবি*)। তবে কামিনী রায়ের সমগ্র সাহিত্যজীবন পর্যালোচনা করলে 'সুখ' কবিতাটিকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা যায় না। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে 'জীবনের প্রতি একটি গহন গম্ভীর দৃষ্টি', প্রমথনাথ বিশী ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষা ধার করে যাকে বলেছেন 'high seriousness', প্রায় সব সাহিত্যিকের রচনায় দেখা যায়। কামিনী রায়ের রচনাও তার ব্যতিক্রম নয়।

উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতার ধারায় প্রধান কবিদের মধ্যে কামিনী রায়কে স্থান দিতে হবে। তাঁর প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থ *আলো ও ছায়া, নির্মাল্য, পৌরাণিকী*-র প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৮৯, ১৮৯১, ১৮৯৭। *মাল্য ও নির্মাল্য* কাব্যগ্রন্থটি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত

হলেও, গ্রন্থান্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল ১৮৮০-১৮৯৭। অল্পবয়সে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁকে 'উদ্বুদ্ধ' করেছে। পরিণত বয়সে তিনি পত্রে লিখেছেন "তাঁহার নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যাহা পাইয়াছি গ্রহণ করিয়াছি, সমালোচনা করিবার ইচ্ছা কখনও হয় নাই, এখনও হইতেছে না। পিতা মাতা বা ধাত্রীকে যেমন মানুষ চিরদিন ভালবাসে, তাহাদের গুণাগুণের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করে না, আমারও কতকটা সেই রকম।" হেমচন্দ্রের কবিতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য কামিনী রায়ের সাহিত্যাদর্শ বুঝতে সাহায্য করে—"রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রীতি, নারীজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ—এ সকল তাঁহার মতো তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেকালে কলা-কুশলতা (art) হইতে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার জলদগম্ভীর ভাষা শুনিয়া আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিত। সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে ঠেলিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত ; আজকাল যেন বাছা বাছা বাঁধা বুলি আগে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেই জন্য ভাব জমাট হয় না, ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়।' (মন্মথনাথ ঘোষকে লেখা চিঠি, ১১ জুলাই ১৯২৩)। *আলো ও ছায়া* বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ তিনি 'পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'কে উৎসর্গ করেছেন—

> তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্বাদ তব
> সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
> বিংশতি বরষ ধরি' যেই গীত হার,
> আজ লোকান্তর হতে তাই উপহার
> লহ এ ভক্তের হাতে ;—আজ মনে হয়
> তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা নয় ;

আমাদের মনে পড়বে, *আলো ও ছায়া* প্রথম প্রকাশকালে হেমচন্দ্র স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভূমিকা লিখে দেন, "কবিতাগুলি আজকালের 'ছাঁচে' ঢালা। যাঁহারা এ ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে বলিতে পারি না ; তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহারাও লেখকের অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিবেন।" মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের *মানসী* কাব্যগ্রন্থ তখনও প্রকাশিত হয়নি। ১৮৮০ সালে কামিনী রায়ের পক্ষে হেমচন্দ্রের *কবিতাবলী*-র (১৮৭০, ১৮৮০) অনুসরণ স্বাভাবিক ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর যে কোনো একটি কবিতা গ্রহণ করা যেতে পারে—

> উঠিবে চমকি নিদ্রিত শরীর,
> শিরায় শিরায় ছুটিবে রুধির,

বিস্মিত শ্রবণে বাজিবে গম্ভীর
　　　　পরিচিত গীতধাব ;

উঠিবে কাঁপিয়া বায়ুব মণ্ডল,
উচ্ছ্বসি উঠিবে সাগবের জল,
সহসা হৃদয় হইবে চঞ্চল,
　　　　ঘুচিবে ঘুমের ভার। (সাগর সঙ্গীত, ডিসেম্বর ১৮৮০)

তবে কামিনী রায়ের স্বাতন্ত্র্যও এই নিতান্ত অল্প বয়সে লেখা কবিতায় ধরা পড়েছে। উনিশ শতকেই হেমচন্দ্রের মনে হয়েছে তাঁর কবিতা 'আজকালের ছাঁচে ঢালা।' বিশ শতকে কামিনী রায়ের কবিতায় আরও বড়োরকমের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। হয়তো এই পরিবর্তনের বীজও তাঁর প্রথম দিকের রচনার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে তিনি চিঠিতে লিখেছেন—"আমার মনে হয় আমি কিছু অকাল-পক্ক ছিলাম। কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই লিখিয়াছি, কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন। যাহা শীঘ্র বাড়ে, তাহা শীঘ্রই নষ্ট হয়, প্রকৃতির মধ্যে ইহা সর্বদাই দেখি। অশ্বত্থ বটাদি বনস্পতি ধীরে বাড়ে, যত দীর্ঘায়ু হয়, লাউ কুমড়া শশা অন্য শাকাদি সে রকম হয় না। দুদিনে বাড়ে দুদিন বাদে মরে। যে সব ছেলে precocious তাহাদের মধ্যে কেহই বড় হইয়া বড়লোক হয় না। আমার মধ্যেও একটা precocity ছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি দেখা গেল না। অবশ্য সারাজীবন কতকগুলি প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়াই আসিতে হইয়াছে। সাহিত্যের সাধনা ও অনুশীলনের সুযোগ ঘটে নাই। মনের জড়তাও ছিল।" কামিনী রায়ের পরিণত বয়সের রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভব করা যায়। অনুরূপা দেবীর মনে হয়েছিল, "কামিনী রায় পূর্ববর্তী কবিদের চেয়ে বহির্জগৎ দেখবার সুযোগ বেশি পেয়েছিলেন বাংলার যুগান্তকারী কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ে, তাঁর চিন্তার পরিধিও তাই ব্যাপকতর।' *(সাহিত্যে নারী : স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি,* ১৯৪৯, পৃ. ১২৫)। এইভাবে যেন দুই স্বতন্ত্র যুগের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছেন কামিনী রায়। রচনার সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য, তবে সেই সঙ্গে আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় বাংলা সাহিত্যে তাঁর ঐতিহাসিক অবস্থান।

অধুনা বাংলাদেশে, বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে বৈদ্যপরিবারে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ১২ অক্টোবর কামিনী রায়ের জন্ম হয়। পিতা চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) বরিশাল গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, কলকাতায় সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে আসেন। সেখানে কিছুদিন পড়ার পরে এঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। কিন্তু কলকাতায় 'স্বাস্থ্য ভঙ্গ' হওয়ায় ঢাকায় আইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন, সেখান থেকে লোয়ার গ্রেড ও হায়ারগ্রেড প্লিডারশিপ পরীক্ষা দেন। এই সময়েই (১৮৭০) তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অত্যুচ্চ আদর্শবাদ ও নীতিবোধ নিয়ে আইন-ব্যবসায় সাফল্য লাভ সহজ নয়। সৌভাগ্যবশত ১৮৭৩ সালে তিনি মুনসেফের চাকরি পান, এবং তারপর মুনসেফ ও

সাবজজ হিসেবে সারাজীবন সরকারি চাকরি করেন। তবে *মহারাজ নন্দকুমার* (১৮৮৫), *দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ* (১৮৮৬), *অযোধ্যার বেগম* (১৮৮৬), *ঝান্সীর রাণী* (১৮৮৮) প্রভৃতি বই লেখার জন্য তাঁকে সরকারের বিরাগভাজন হতে হয়। চণ্ডীচরণকে বাঙালি বিশেষভাবে মনে রেখেছে *Uncle Tom's Cabin*-এর অনুবাদ *টমকাকার কুটীর* (১৮৮৫) উপন্যাসের জন্য।

কামিনী রায়ের চরিত্রগঠনে ও সাহিত্যসৃষ্টিতে পিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। যখন কামিনীর বয়স মাত্র সাত বছর, তখন বাবা তাঁকে একটি *উপাসনা প্রণালী* দিয়ে উপাসনা পদ্ধতি শেখাতেন। সেই সঙ্গে বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মেয়েকে গাইতে হত ব্রহ্মসংগীত। দশ বছর বয়সে কামিনীকে কলকাতায় মিস এক্রয়েড প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। তবে মায়ের অসুস্থতার জন্য ছ'মাসের বেশি এই স্কুলে পড়া সম্ভব হয়নি। চণ্ডীচরণ তখন মানিকগঞ্জে কর্মরত, সেখানে দেড়বছর কামিনীর শিক্ষার ভার সম্পূর্ণত স্বহস্তে রেখেছিলেন।—"প্রাতঃকালে উপাসনাদি সমাপন করিয়া তিনি আমাকে নিকটে ডাকিতেন এবং নানাবিধ সদ্‌গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশ সকল একখানি খাতাতে উদ্ধৃত করাইতেন ও তাহার অর্থ বলিয়া দিতেন। এই সকল অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া পর দিবস তাঁহার নিকট আবৃত্তি করিতে হইত। প্রধানতঃ বাইবেল ও Conway's Sacred Anthology নামক পুস্তকে সংগৃহীত নানা দেশের ধর্ম ও নীতি গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ বাক্যাবলী এইরূপে শিক্ষা দিতেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকবণ, পাটীগণিত ও জ্যামিতি রীতিমত পড়াইতেন। ইতিহাস অধিকাংশ সময়ে মুখে মুখে বলিতেন। দ্বিপ্রহবে নিযুক্ত রাখিবার জন্য অনুবাদ ও parsing-এর যথেষ্ট কাজ দিয়া যাইতেন। কাছারী হইতে আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া, যখন জলযোগ করিতেন, তখন আমাকে কাছে দাঁড় করাইয়া সেদিনকার নির্দিষ্ট যে পাঠ তাহা পরীক্ষা করিতেন। এতদ্ভিন্ন Morning and Evening Meditations নামক পুস্তক হইতে একটি করিয়া কবিতা বা ধর্মসঙ্গীত মুখস্ত বলাইতেন।" (স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন, *শ্রাদ্ধিকী*, ১৯১৩)। তারপর বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে (বেথুন ফিমেল স্কুল) 'বোর্ডার' হিসেবে বারো বছর বয়সে কামিনীর নতুন জীবনের সূচনা হয়। এই সময়ে সন্তানের 'সুশিক্ষাবিধান ও চরিত্র-গঠন' বিষয়ে চণ্ডীচরণের চিন্তাভাবনার পরিচয় *শ্রাদ্ধিকী* বইতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে—"স্কুলে গিয়া পাছে আমাব রুচি ও অভ্যাস তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ না হয়, এই ভয়ে যেন সর্বদা ভীত ছিলেন। এই কয়েকদিন সাজসজ্জা ও বিলাসিতা, বাহিরের সভ্যতা ও আড়ম্বরের বিরুদ্ধে কথায় যতদূর সাবধান করা যায় তাহা করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্কুলে কিরূপ ব্যবহার করিব ; পাঠাদিতে অধিক অনুরক্ত ও খেলা গল্প ও লঘু আমোদের বিরোধী দেখিয়া, সমবয়স্কারা বিদ্রূপ করিলে, তাহাদিগকে কি বলিব ; এবং আপনার মনকেই বা কি বলিয়া দৃঢ় রাখিব এ সকল কথা বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের একখানি নোট বুক ছিল, তাহা বাহির করিয়া আমাকে দিয়া লিখাইলেন— My life mission is higher than that of my school companions.—আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমার সহপাঠিনীদিগের অপেক্ষা উচ্চতর। এবং এই কথাই সর্বদা মনে রাখিতে অনুরোধ করিলেন। এই চিন্তাটি আমার মনে মুদ্রিত করিয়া, আত্মাভিমান বা অহঙ্কার নহে,

কিন্তু জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব জ্ঞান উন্মেষ করিয়া দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। আমি সবিশেষ চিন্তা না করিয়া, বিনা বাক্য ব্যয়ে, তাঁহার আদেশ মত কথাটি লিখিয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু উহা আমার বাল্য ও যৌবনের সকল সুখের কণ্টক হইয়া আমাকে কেবলই যন্ত্রণা দিয়াছে। দুঃস্বপ্নের মত এখনও মাঝে মাঝে উহা আমাকে মুহূর্তের জন্য পীড়া দিয়া যায়।"

পিতা-পুত্রী-সংবাদ কামিনী রায়ের পরবর্তী সাহিত্যজীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। আপাতত আমাদের এইটুকু জানলে চলবে, স্কুলে ও কলেজে কামিনী পিতার প্রত্যাশা মতো আদর্শ ছাত্রী হিসেবে জীবন গড়ে তুলেছেন। ১৮৮০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা, ১৮৮৩ সালে এফ. এ. পরীক্ষা এবং ১৮৮৬ সালে সংস্কৃতে অনার্স-সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখনও পর্যন্ত মহিলা গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ১৮৮৬ সালে বি. এ. উপাধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বেথুন স্কুল কমিটির পক্ষে দুর্গামোহন দাশ ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কামিনীকে স্কুলে শিক্ষকতার জন্য আহ্বান করেন। মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহী হলেও "তাহাদিগের জন্য অর্থকরী বিদ্যার আবশ্যকতা তিনি [চণ্ডীচরণ] বহুকাল স্বীকার করেন নাই। কন্যারা চাকরী করে বা চিকিৎসাদি ব্যবসার দ্বারা অর্থোপার্জন করে, তাহা ইচ্ছা করিতেন না।" কিন্তু ১৮৮৬ সালে নিজের কর্মজীবনে অশান্তি ঘটায় পদত্যাগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন বাধ্য হয়ে কন্যাকে শিক্ষকতা গ্রহণে অনুমতি দেন—"তোমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছি, চাকরী করিয়া খাইবে বলিয়া নহে। তুমি চাকরী করিবে একথা আমার মনে করিতেও ক্লেশ হয়। কিন্তু আমি নিজে চাকরী ছাড়িয়াছি, এতকাল তোমাকে যে ভাবে রাখিয়াছি, আর সে ভাবে রাখিতে পারি, এমন সাধ্য হইবে না ; তোমার কোন অভাব দেখাও কষ্টকর হইবে। কাজেই আর তোমার চাকরী করা সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিতেছি না। তুমি নিজের আয়ে অন্ততঃ নিজের অভাব সকল দূর করিতে পারিবে।"

বেথুন ফিমেল স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষিকারূপে কামিনী সেনের কর্মজীবনের সূচনা হল (১৮৮৬)। ১৮৯০-৯১ সালে তিনি বেথুন কলেজে অধ্যাপিকা পদে উন্নীত হন। এর অল্প আগে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আলো ও ছায়া* (১৮৮৯) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। হেমচন্দ্রের ভূমিকাতেও কবির নামোল্লেখ বা কোনো ব্যক্তিপরিচয় নেই। পরবর্তীকালে যখন তিনি কবি হিসেবে সুপরিচিত, তখনও অনেকদিন তাঁর কাব্যগ্রন্থের আখ্যাপত্রে 'আলো ও ছায়া প্রণেতৃ-প্রণীত' লেখা থাকত (দ্র. *মাল্য ও নির্মাল্য* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১৮)। জনসমক্ষে নিজেকে প্রকাশে ও প্রচারে যেন কবির মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল।

তবে *আলো ও ছায়া* জনসমাদর লাভ করেছিল। স্ট্যাচুটারী সিভিলিয়ান সুপণ্ডিত কেদারনাথ রায় অজ্ঞাতপরিচয় কবির *আলো ও ছায়া* কাব্য নিয়ে *Calcutta Review* পত্রিকায় উচ্চ সুখ্যাতিপূর্ণ সমালোচনা করেছিলেন। পরে ১৮৯৪ সালে বিপত্নীক কেদারনাথের সঙ্গে কামিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের পরে বেথুন কলেজে অধ্যাপিকা পদ থেকে তিনি যেমন অবসর গ্রহণ করেন, কাব্যরচনাতেও তেমনি এই সময়ে সাময়িক বিরতি ঘটে। *ভারতী* পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭) সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী কবির সংক্ষিপ্ত

জীবনীতে লেখেন—"বিবাহের পর কামিনীর কেবল একখানি পুস্তক *গুঞ্জন* বাহির হইয়াছে। কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার কোন বন্ধু অনুযোগ করাতে, কামিনী তাঁহার সন্তানগুলিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এইগুলিই আমার জীবন্ত কবিতা।' স্বামিসেবা, গৃহকর্ম ও সন্তানপালনই তাঁহার নিকট পত্নী ও জননীর প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতেই তাঁহার সমুদয় অবসর ও শক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে।" কিন্তু খুব বেশি দিন তিনি 'স্বামিসেবা'র সুযোগ পাননি। ১৯০৯ সালে ঘোড়ার গাড়ি উলটে ভীষণ আঘাত পেয়ে কেদারনাথ মারা গেলেন। একাধিক সন্তানকেও অল্পদিনের মধ্যে হারাতে হয়েছে। বাংলা শোককবিতার ধারাকে পুষ্ট করেছে বড়ো ছেলে অশোকের অকালমৃত্যুতে রচিত *অশোক-সঙ্গীত* (১৯১৪)। জীবনসায়াহ্নে প্রকাশিত হয়েছে দুটি কাব্যগ্রন্থ—*দীপ ও ধূপ* (১৯২৯) ও *জীবনপথে* (১৯৩০)। সেখানে নতুন কিছু কবিতা স্থান পেলেও, অধিকাংশ কবিতা অনেকদিন আগে লেখা। দুটি বইতেই, বিশেষত *জীবনপথে* বইতে স্থান পেয়েছে অপ্রকাশিত অনেকগুলি সনেট। তবে ১৯২৯/৩০ সালে এ সব কবিতার বই যখন বেরোচ্ছে, তখন বাংলা কবিতার পালাবদল ঘটে গেছে। কামিনী রায় নিজেও সে কথা জানতেন, আর তাই বোধহয় নতুন কবিতা লেখায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। লক্ষ করা যাবে, তাঁর যে গদ্যরচনাগুলি সংগ্রহ করা গেছে, তা সবই বিশ শতকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে লেখা।

১৯৩৩ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর ৬৯ বছর বয়সে কামিনী রায়ের মৃত্যু হয়।

কামিনী রায় যে-সময়ে সাহিত্য রচনাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন, সে সময়ে মেয়েদের মধ্যে অল্প কয়েকজন লেখালিখি করতেন। সাহিত্যের জগৎ অধিকার করেছিলেন পুরুষেরা। মানকুমারী বসুর লেখা *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় প্রশংসিত হলে, তাঁর স্বামী তাঁকে বলেন, "লোকে প্রশংসা করিতেছে বলিয়া তুমি যেন গর্বিতা হইও না। দেখ দেখি, তোমার কাকা [মাইকেল মধুসূদন দত্ত] কত বড় ক্ষমতাপন্ন কবি ছিলেন ; তুমি তাঁহার উপযুক্তা ভ্রাতুষ্পুত্রী হইলে তবে আমার মুখোজ্জ্বল হইবে। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়াই সকলে এতটা প্রশংসা করে।" সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের *বন-প্রসূন* কাব্যের তথাকথিত সমালোচনা এই রকম—"মুখোপাধ্যায় মহাশয়ার কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে। স্ত্রীলোকের কবিতার বেশি প্রশংসা করিতে আমরা বড় ভয় পাই—পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল, গৃহকর্ম ছাড়িয়া সকলেই কাগজকলম লইয়া বসেন! তাহা হইলে গরীব পুরুষের দল এক মুঠা অন্ন পাইবে না। অতএব শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, আমাদের একটু মার্জনা করিবেন—আমরা একটু কম প্রশংসা করিব। পুরুষ গ্রন্থকার হইলে আমরা এ ভিক্ষা করিতাম না, পুরুষের এত ক্ষমাগুণ প্রকাশের ক্ষমতা নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা মিনিটে মিনিটে পাঁচদিক হইতে পঞ্চাশ রকম প্রশংসা পাইতেছেন—রূপের প্রশংসা—রান্নার প্রশংসা—শিল্পকার্যের প্রশংসা—আর ব্যক্তিবিশেষের কাছে বিনা দাবিদাওয়াতে হরিয়েক রকমের প্রশংসা দিনে ও রাত্রে পাইয়া থাকেন। তাঁহারা কাজে কাজে বাজে লোকের বাজে প্রশংসা একটু কম করিয়া লইতে পারেন।..." ইত্যাদি। এই ধরনের প্রশংসা পেতে চাননি

কামিনী রায়। *অম্বা* (১৯১৫) নাট্যকাব্যের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "প্রথম জীবনে, কেবল প্রতিকূল সমালোচনা বা উপেক্ষার ভয়ে নহে, এক দারুণ লজ্জাবশতঃই আপনার নিভৃত চিন্তাগুলি অবগুণ্ঠন-মুক্ত করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম না। সেই লজ্জা ও ভীরুতা দূর করিবার জন্য আমার নাম, ধাম ও নারীত্ব গোপন রাখিয়া, কোন পূজনীয় পিতৃবন্ধু কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আলো ও ছায়ার পাণ্ডুলিপি লইয়া যান।" নাম ধাম ও নারীত্ব গোপন করার মধ্যে শুধু লজ্জা ও ভীরুতা ছিল না। এই প্রসঙ্গে দুটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। হেমচন্দ্রের কাছে পাণ্ডুলিপি দেওয়ার সময়ে রচয়িত্রীর পরিচয় গোপন করা হলেও, পরে তিনি তা জানতে পারেন। *আলো ও ছায়া*-র ভূমিকায় প্রথমে হেমচন্দ্র কবির 'নারীত্বে'র উল্লেখ করেন। কিন্তু "উহাতে আমার আপত্তি ছিল। তিনি সেই জন্য দ্বিতীয়বার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন।" এই ঘটনার অনেকদিন আগে, ১৮৮০ সালে 'সুখ' নামে কবিতাটি সম্বন্ধে কামিনী রায় জানিয়েছেন, "বন্ধু অবলা (স্বর্গতা লেডি অবলা বসু—বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী) সুশীলকুমার গুপ্ত নাম দিয়া এই কবিতা আমার অজ্ঞাতসারে ঢাকায় *বান্ধবে* পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু সম্পাদক উহা প্রকাশ করেন নাই। আমি নিজে বিভূতি গুপ্ত নাম দিয়া *আর্য-দর্শনে* পাঠাইয়াছিলাম, ছাপা হয় নাই।" নিজের নামে পাঠালে হয়তো ছাপা হত, কারণ কবি দেখেছেন "আজকাল দেখি কতকগুলি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থেও এই 'সুখ' খানিকটা স্থল জুড়িয়া বসিয়া আছে।" তাহলে 'মহিলা কবি'র রচনা হলে তা সমাদৃত হয়, 'কবিতা'র সেখানে কোনো বিচার হয় না। সেকালে যখন মহিলারা নিজেদের নামের আগে 'শ্রীমতী' বিশেষণ ব্যবহার করতেন, তখন ১৯০৯ সালেও আমরা দেখি, স্বাক্ষর-কালে শুধুই 'কামিনী রায়' (পুরুষেরা তখনও নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহার করতেন)। পরে কামিনী রায় নামের আগে পুরুষদের মতো 'শ্রী' লিখতেন, কখনও 'শ্রীমতী' লিখতে দেখিনি। একটিমাত্র প্রবন্ধের তলায় 'শ্রীমতী কামিনী রায়' দেখা গেছে ('জ্ঞানবৃক্ষের ফল') সেটি *ভারত-মহিলা পত্রিকার* সম্পাদিকা সরযূবালা দত্তের সংযোজন হতে পারে।

এই সব ছোটোখাটো ব্যাপারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিচরিত্র পরিস্ফুট হয়। মা বামাসুন্দরী দেবী শ্বশুরের মৃত্যুর পর অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন, স্বামী ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করায় সমাজচ্যুত এবং বিদেশে অবস্থানরত। একমাত্র শিশুকন্যা কামিনীকে নিয়ে কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। আত্মীয়েরা পরামর্শ দিলেন মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘর-জামাই রাখলে সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু মা তাতে রাজি হলেন না—"ঘর-জামাই না ঘর-জ্বালা! আমি ঘর জ্বালাইব না।" মায়ের মৃত্যুর পর কামিনী রায় শ্রাদ্ধবাসরে পড়বার জন্য যে-প্রবন্ধটি লেখেন, তা থেকে অল্প কয়েক লাইন উদ্ধৃত করলে মা ও মেয়ে উভয়ের চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়—"আজ সেই সময়ের কথা চিন্তা করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে কিরূপে কৃতজ্ঞতা জানাইব জানি না। আমার শিক্ষাদীক্ষা সুখসৌভাগ্য যাহা কিছু পাইয়াছি, যাহা কিছু আমার মনুষ্যত্ব, যাহা কিছু এই ক্ষুদ্র জীবনের সফলতা, সে সমুদয়ের মূলে আমার মাতৃদেবী—তাঁহার সেইদিনের দৃঢ়তা। পিসীমারা আমার সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন, সেইদিন মাতার একটু হাঁ-কি-না'র উপর সাড়ে ছয় বৎসরের বালিকার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর

করিতেছিল।"

উনিশ শতকে বাংলা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে বিশ-শতকিয়া আধুনিকা নারীর সাক্ষাৎ মেলা সহজ ছিল না। বামাসুন্দরী দেবীর পক্ষেও সংস্কারের সব বন্ধন রাতারাতি ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না। তবু কন্যা তাঁর মধ্যে দেখেছেন "উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে/জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে/কণ্ঠ হতে/নির্বারিত স্রোতে।" আসলে এ ছিল কামিনী রায়ের নিজের জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। তাঁর গদ্যরচনায় কখনও স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে অল্পবয়সের অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে—"পূর্বে কলিকাতার সাধারণ পুরুষেরা নারীর অবরোধ মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন না ; কেবল তাহাই নহে, আমার মনে আছে রাস্তা-ঘাটে অবগুণ্ঠনহীনা নারীর দিকে লোকে কি চক্ষে তাকাইত! কেবল অশিক্ষিত লোক নহে, দোকানী-পশারী নহে, কলেজের ছাত্রেরাও খোলা গাড়ীতে যাইতে দেখিলে মহিলাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ এবং মুখভঙ্গী করিতে ছাড়িত না। অনেকেরই দৃষ্টি অভদ্রতা এবং জঘন্য চিন্তার পরিচয় দিত। নারীর পক্ষে অবরোধ-বর্জন এবং অবগুণ্ঠন-মোচন যতই অন্যায় বা অধর্ম হউক না, সেজন্য পুরুষের পক্ষে আত্মমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া দৃষ্টির মধ্যে অতি ইতর, কলুষিত ভাব ঘনীভূত করিয়া নারীদের প্রতি তাহা নির্লজ্জভাবে নিক্ষেপ করা, না ভদ্রতা-সঙ্গত, না ধর্ম-সঙ্গত, একথা কি কেহ জানিত না? এই রকম দৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রথম জীবনে আমাদিগকে অনেক চলা-ফেরা করিতে হইয়াছে। সে যে কি পরীক্ষা তাহা এখনকার বালিকারা বুঝিবে না।" (১৯২৭)। তারপর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষত স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে নারীর অবরোধ মোচন ঘটেছে। তবে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের মধ্যে প্রত্যাশিত 'সহচারিত্ব, সহকর্মিত্ব ও সহধর্মিত্ব' অনেকদিন পর্যন্ত সুলভ ছিল না। আসলে দীর্ঘদিন নারীকে 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। কামিনী রায় দেখেছেন, পুরুষ তার 'প্রভুত্বপ্রিয়তা' রক্ষার জন্য নারীকে জ্ঞানার্জনে বাধা দিয়েছে, শুধু তাই নয় "পুরুষেরা নারীর হীনতা প্রমাণ করিতে গিয়া, কতকগুলি দোষের উল্লেখ করেন। যদি জ্ঞান ও শিক্ষা প্রভাবে নারীগণ সে সকল দোষ হইতে মুক্তিলাভ করেন, ভীরুতা বিমূঢ়তা ঘুচাইয়া, নির্ভীকতা ও স্থির-বুদ্ধি প্রকাশ করেন, অস্থির-মতিত্ব দূর করিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হন; অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য করিয়া অদূরদর্শিতার অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান ; পক্ষপাতিত্ব পরিহার পূর্বক অকম্পিত হস্তে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধারণপূর্বক দণ্ড-পুরস্কার বিধান করিতে পারেন, তাহাতে সমাজের ইষ্ট কি অনিষ্ট? নারী যদি কল-চালিত পুত্তলিকার মত না হইয়া আপনার দায়িত্ব জ্ঞানে কর্তব্য করিতে শেখেন, পূজার মন্ত্র পাখীর মত উচ্চারণ না করিয়া, তাহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হন ; যদি কুসংস্কারের আবর্জনারাশি সরাইয়া ফেলিয়া, কৌলিক আচার ও ব্রত নিয়মাদির প্রকৃত মর্ম, কবিত্ব, সৌন্দর্য ও উপকারিতা অনুভব করেন, তাহা হইলে কি গৃহ কিম্বা পরিবারে কোন মহান্ অনর্থ ঘটে?" (১৯০৫)। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় উনিশ শতকের শেষ পাদে এই সব প্রশ্ন জেগেছে, তারপর আরও বিশ-পঁচিশ বছর লেগেছে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে। 'সুপ্তশক্তির জাগরণ' ঘূর্ণিবায়ুর মতো কখনও আকস্মিক মনে হলেও "জড় জগতে আকস্মিক তো কিছুই নাই। যাহা নির্দিষ্ট কারণের অপরিহার্য ফল তাহাকে আকস্মিক বলা সঙ্গত হয় না।" সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে

কামিনী রায় দেখিয়েছেন, প্রাকৃতিক নিয়মে ও আধ্যাত্মিক নিয়মে মানবসমাজে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটছে। এখানেও নারীর সামর্থ্য এবং অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর বিশ্বাস, "নারীর উচ্চশিক্ষা একদিকে তাহাকে কুমারী ব্রহ্মচারিণী থাকিবার, অপর দিকে আপন রুচি অনুসারে ভিন্নজাতীয় কিন্তু অন্যথা সুযোগ্য পাত্রকে বরমাল্য দিবার অধিকার দিবে।" (১৯১৭)।

কামিনী রায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত ছিলেন। 'নারীর শিক্ষা কতখানি হওয়া সম্ভব', সে সম্বন্ধে তাঁর অনেক কথা বলার ছিল। যেমন পুরুষেরা মেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে, অনেকদিন পর্যন্ত একটাই কথা বলতেন, মেয়েদের মধ্যে শেক্সপিয়র-গ্যয়টে, থ্যাকারে-ডিকেন্স, রাফেল-মিকালেঞ্জেলো, বাখ-বীঠোভেন একজনও নেই। বলাবাহুল্য এ ধরনের বিতর্ক নিষ্ফল। আপাতত "আমাদের প্রয়োজন সুস্থ সবল কর্মিষ্ঠ জাতীয়জীবন, অকপট উদার ধর্মজীবন। নারীকে বাদ দিয়া, নারীশিক্ষা অবহেলা করিয়া সে জীবন গড়িতে পারে না। যাহা কিছু আজকাল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাও শিক্ষার মঙ্গল প্রভাবে, এই কথাই প্রণিধানযোগ্য।"

তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয়ে বর্তমান কালের সঙ্গে তাঁর কিছুটা বিরোধ দেখা দিয়েছে। "হিন্দু ধর্মানুসারে বিবাহ একটা ধর্মাত্মক পবিত্র অনুষ্ঠান, একটী অবশ্য কর্তব্য সংস্কার ; ইহা চুক্তির ব্যাপার নহে। বিবাহের বন্ধন অচ্ছেদ্য।"—এমন বিশ্বাস তিনি সারাজীবন পোষণ করেছেন। 'বরপণ' তিনি আপত্তিকর বিবেচনা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, "এই বরপণ প্রথার সহিত বাল্য বিবাহ ও একান্নবর্তিতা এই দুইটি প্রথাও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে।" (১৯২৬)। বাল্যবিবাহ তখনই কমতে শুরু করেছে, একান্নবর্তিতাও আর আগের মতো রক্ষিত হচ্ছে না। কিন্তু কামিনী রায়ের মতে উত্তরাধিকার বিষয়ে নতুন আইন ও কন্যাশিক্ষার ব্যাপক প্রচলন না হলে 'বরপণ'-প্রথার বিলুপ্তি সম্ভব নয়। তবে সবচেয়ে জরুরি হল, মেয়েদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা। মেয়েরা নিজের পরিশ্রমে জীবিকার্জন করবে, একথা পিতা চণ্ডীচরণ একদা ভাবতে পারেননি। এখন কন্যার মুখে আমরা শুনি, "অবস্থা যাহাদের স্বচ্ছল নহে, আজকালকার জীবন সংগ্রামের কঠোরতার দিনে সেই সকল পরিবারের কয়জন নারী না খাটিয়া পারে? পিতার বা পতির গৃহে কি তাহারা খাটে না? শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে কন্যারূপে অর্থোপার্জন করিয়াই অনেকে দরিদ্র পিতার সাহায্য করেন, ভগিনীগণ ভাইদের শিক্ষার ব্যয় বহন করেন।"

বোঝা যায়, সমাজে নারীর স্থান, নারীশিক্ষা সম্বন্ধে নতুন ধ্যান-ধারণা, সবচেয়ে বড়ো কথা নরনারী সম্বন্ধ—এ সব বিষয়ে কামিনী রায়কেও কিছুটা নতুনভাবে ভাবতে হয়েছে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদা 'বাঙালির মেয়ে'র মতো রহস্য-কবিতা লেখার জন্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কাছ থেকে তিরস্কার লাভ করেছিলেন, যদিও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি মেয়ের উপাধি-প্রাপ্তি উপলক্ষে তিনি লেখেন—

যে ধিক্কারে লিখিয়াছি, 'বাঙ্গালির মেয়ে,'
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে।

কামিনী রায় তাঁর পিতা চণ্ডীচরণের মতো, "বি. এ. পাশ করা শিক্ষার চরম পরিচয়, এমন কথা কোন কালে মনে করেন নাই। বরং বি. এ. এবং এম. এ. উপাধিধারিগণের অধিকাংশেরই বিদ্যার অগভীরতা দেখিয়া আক্ষেপ করিতেন। জ্ঞানানুরাগের সহিত চিন্তা অধ্যয়ন ও আত্মোৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা মিলিত হইলে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি শোভিত না হইয়াও, বিদ্যালাভ করা যায়, নিজের জীবনেই তাহা দেখিয়া গিয়াছেন।" (১৯০৬)। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি চণ্ডীচরণ অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করলেও, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতকে 'অনুদার' মনে করতেন। কেশবচন্দ্র মেয়েদের গণিত শেখানো দরকার নেই, আর লজিক বা ন্যায়শাস্ত্র না শিখে বরং রেটরিক অর্থাৎ অলংকারশাস্ত্র শেখালে লাভ আছে—এমন কথা বলতেন। কিন্তু চণ্ডীচরণ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মনে হয়েছে গণিত ও ন্যায়শাস্ত্র না পড়লে বুদ্ধি পরিষ্কার হবে কিসে। কিন্তু পরিণত বয়সে কামিনী রায় যখন কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের পারিতোষিক-বিতরণ উৎসবে 'সভানেত্রীর অভিভাষণ' দিচ্ছেন, তখন তাঁর মুখে শুনি, "পত্নী, গৃহিণী ও মাতারূপে মাতাকে যেমন নিবিড় ও ঘনিষ্ঠরূপে গৃহের সহিত সংসৃষ্ট থাকিতে হয়, পুরুষকে সচরাচর সেরূপ হয় না। সন্তানের সঙ্গে মাতার যে সম্বন্ধ তাহা আর কোন সম্বন্ধের সঙ্গেই তুলনীয় নয়। এইজন্য ভবিষ্যৎ পত্নী ও মাতার শিক্ষা কেবল নীতি ও গৃহকর্মের দিক দিয়াই নহে, গৃহের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও আনন্দ বর্ধনের দিক দিয়াও পুরুষের শিক্ষা হইতে কিছু ভিন্নতর হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্য জগতে এই পার্থক্য ক্রমশঃ দূর হইতেছে দেখিয়া আমাদের অনেক সময় আশঙ্কা হয়। কিন্তু সেখানেও সাধারণের শিক্ষা ও ব্যবহার যুক্তিযুক্ত পথেই চলিয়াছে। শিক্ষার গুণে নারী সেখানে বিজ্ঞানচর্চায়, রাষ্ট্রীয় কর্মে, সামাজিক দুর্গতি ও দুর্নীতি নিবারণে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। এদেশেও কালে তাহা হইবে। শিক্ষার লক্ষ্য মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন—জ্ঞানের দ্বারা, সুরুচির দ্বারা, আত্মসংযম ও পুণ্যাচরণের দ্বারা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা ও পূজা। তাই পুরুষ ও নারীর শিক্ষার চরম লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।" (১৯৩০)। এখানে কোথাও একটা দ্বিধা যেন মনের মধ্যে কাজ করছে। আজন্মলালিত সংস্কার ও আদর্শ একদিকে কাজ করছে, অন্যদিকে পরিবর্তিত দেশকাল ও প্রয়োজনকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কেমন করে প্রাচীন ও নবীন মিলবে তা হয়তো তাঁর জানা নেই। বিশ শতকের দুয়ের দশক/তিনের দশক একদিক থেকে অশান্তি ও বিক্ষোভের কাল—"কেবল এদেশে নয়, সকল দেশেই এক অভূতপূর্ব চিত্তকম্প ও চিত্তান্দোলন চলিয়াছে। এমন করিয়া সমস্ত সভ্যজগৎ একই কালে কখনও বোধহয় নড়িয়া উঠে নাই। পাতালে বসিয়া পুরাণ-বর্ণিত সহস্রশীর্ষ বাসুকী-নাগ ধরণীর ভারে ক্লান্ত হইয়া যেন সবগুলি মাথা এক সঙ্গে নাড়া দিয়াছে। তাই সকল দেশ কম্পিত, ত্রস্ত, আত্মরক্ষার জন্য উন্নিদ্র।" এ সময়ে স্বাভাবিক ধৈর্য ও স্থৈর্য রক্ষা কঠিন। কামিনী রায় আমাদের সমাজের নানা সমস্যা, অনৈক্য ও বিরোধ নিয়ে ভেবেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষের উপর বিশ্বাস হারাননি—"আমরা কাহারও হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, খৃষ্টানত্ব ইত্যাদি বংশক্রমাগত, চিরপোষিত নাম চিহ্ন বলপূর্বক বর্জন করাইবার বিরোধী, কিন্তু সকল বিভিন্নতা মিলাইয়া লইয়া এক মহামানবত্ব ক্রমে আসিবে এই আশায় আশ্বস্ত। সেদিন কি আসিবে না?" (১৯৩১)।

'সন্তান ও শিষ্য' (১৯৩২) রচনাটি এই সংকট-মুহূর্তে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। নশ্বর মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—অমরতালাভ। "মানব-ইতিহাসে দেবদানবের নিরন্তর সংগ্রাম দেখিয়া যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি ও সংকল্প হৃদয়কে কোমল ও দৃঢ় করিতেছে, সেই সকল অন্য এক হৃদয়পাত্রে সঞ্চারিত করিয়া যাইতে চাহি। আমি যাইব, কিন্তু আমার একান্ত আপনার আর কেহ থাকুক এই প্রিয় পৃথিবীর সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব সম্ভোগ করিতে, আর আমার বিপুল আশা ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত রাখিতে।" তাই মানুষ সন্তান কামনা করে, সন্তানের জন্য তপস্যা করে। তবে আত্মজকে 'সন্তান' করতে হলে কঠিন সাধনা চাই। সন্তান অনেক সময়ে পিতার প্রদর্শিত পথে চলতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তখন "সে আপন ইচ্ছায় সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইতেছে। আমি তাহাকে যত দিতে পারি সে তত লইতে প্রস্তুত নহে।" সেইজন্য পরম্পরা রক্ষায় প্রয়োজন শিষ্যের, যে শিষ্য "আমার মধ্যে যেটুকু সুখ ক্ষণস্থায়ী, অমর, অবিনশ্বর তাহাই লইয়া সে আমার প্রকৃষ্টতর পুত্র হইবে।" এইভাবে মানবসভ্যতা কালে কালান্তরে বিস্তার লাভ করে,—"সে শিষ্য, সে গুরুদত্ত অগ্নি আজীবন ইন্ধন-সহযোগে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া উহা মৃত্যুর পূর্বে অপর কাহাকেও শিষ্যত্বে বরণ করিয়া, তাহার হস্তে ন্যস্ত ধনের মত অর্পণ করিয়া যাইবে। গুরুর এবং শিষ্যের পরস্পর আশ্রয় করিয়া জ্ঞানের প্রেমের ও কর্মের উত্তাপ ও আলোক-শক্তি জগতের হিতে নিযুক্ত হইবে।" এই প্রগাঢ় বিশ্বাস উনিশ শতকের উত্তরাধিকার। রচনাটির বাহ্য শিল্পরূপ, এমনকি ভাষাও যেন বঙ্কিমযুগের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন।

অথচ বাংলা সাহিত্যে ইতিমধ্যে বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে নিজেকে বলতেন 'মিড ভিক্টোরিয়ান'। শেষ জীবনে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে যখন নিজেকে ঠিক মেলাতে পারছেন না, তখন কখনও ক্ষুব্ধ হয়ে, কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেছেন, "মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান করে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত করে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় বলে মনে করে।" (আধুনিক কাব্য, ১৯৩২)। কামিনী রায় রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে তিন বছরের ছোটো। তাঁকেও মনোভাবের দিক থেকে 'মিড ভিক্টোরিয়ান' বললে অন্যায় হবে না। বিশ শতকে তিনের দশকে বাংলাসাহিত্যে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের রচনাও সেই পরিবর্তনের সম্পূর্ণ স্পর্শরহিত নয়, আর তাই মোহিতলাল মজুমদারের মতো কবি-সমালোচকও উত্তেজিত হয়ে এমন মন্তব্য করেন, "পঞ্চাশোর্ধে বনে যাইবার বিধি তিনি অন্যভাবে পালন করিতেছেন। বাংলা-সাহিত্যই অরণ্য হইয়া উঠিয়াছে, তিনি সেই অরণ্যে পরমসুখে বাস করিয়া তাহারই বৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। আমরা সেই অরণ্যে বৃথাই রোদন করিতেছি।" (১৯৩৬)। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' বা 'সাহিত্যে নবত্ব' (১৯২৭) প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায়, সেই 'অরণ্যে পরমসুখে' তিনি বাস করছিলেন না। "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে" তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিব্রত বোধ করেছেন। এমন কথাও তিনি বলেছেন "ভাষাকে মানিনে যদি বলতে পারি তাহলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে তাহলে সামান্য

খরচাতেই উপস্থিতমত কাজ চালানো যায়—কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।"

কামিনী রায়ের পক্ষে নতুন যুগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের থেকেও কঠিন ছিল। শৈশব-কৈশোরে পিতা চণ্ডীচরণের কঠোর অনুশাসন ও পরে ব্রাহ্মসমাজের নীতিবাদী মনোভঙ্গি তাঁর চরিত্রগঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। *আলো ও ছায়া* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'সে কি?' কবিতাটি ঠিক কবে লেখা জানা না থাকলেও, নিশ্চয় ১৮৮৮ সালের পরে নয়। নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে কবির ধারণা পরে বিশেষ পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয় না—

'প্রণয়?'
'ছি!'
'ভালবাসা—প্রেম?'
'তাও নয়।'
'সে কি তবে'
'দিও নাম দিই পবিচয়।
আসক্তিবিহীন, শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে, নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ ;...'

তবে প্রথম জীবনে নারীকে 'দেবী' বলে মনে হলেও ('নারী তব পারে না কি তবে/ দেবী হতে বিধাতার বরে?'—মুগ্ধ প্রণয়/ *আলো ও ছায়া*) পরিণত বয়সে নারীকে 'দেবী' নয়—'মানবী' রূপে দেখতে চেয়েছেন তিনি—"তোমরা মানব হও,—আমাদিগকে মানবী মানিয়া মানবীর অধিকার দাও। স্বামীর সহধর্মিণীরূপে, ভ্রাতার সহকর্মিণীরূপে কর্মক্ষেত্রে তোমাদের পার্শ্বেই আমাদের স্থান কর।" (১৯২৩)।

সাহিত্য-সমালোচনায় কামিনী রায়ের আগ্রহ ছিল না, তিনি একাধিকবার বলেছেন "সাহিত্যের সমালোচক হইতে আমি ভয় পাই।" তবে তাঁর সাহিত্যভাবনার পরিচয় বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে (হেমচন্দ্রের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষকে লেখা চিঠির কথা মনে পড়বে)। 'সাহিত্য ও সুনীতি' (১৯৩২) প্রবন্ধটি শেষজীবনে লেখা, যে বছর রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধ লিখছেন। গত শতকে তৃতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও মনে হয়েছিল "নির্বিচারে পাশ্চাত্য রীতিনীতির ও সাহিত্যের অনুকরণের আত্যন্তিক চেষ্টা" বাংলাসাহিত্যে নীতি-শৈথিল্যের কারণ। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'লালসার অসংযম' বলে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন, কামিনী রায় তাকে 'নারীপুরুষের অবৈধ সম্বন্ধের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা' বলেছেন। তাঁর কাছে "যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দদায়ক, যাহা মনকে উর্ধ্বমুখ করে তাহাই আর্ট। চিত্রকর নদী, পর্বত, বৃক্ষলতা, পুষ্পাদি অঙ্কিত করেন, কিন্তু নর্দমা ইত্যাদি অপবিত্র এবং কুদৃশ্য স্থান আঁকেন না। ঐ স্থানগুলিও সত্য এবং মানুষের পক্ষে আবশ্যক।" শিল্পতত্ত্বের এই আলোচনা অভিনব না হলেও উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কামিনী রায়ের ভাবগম্ভীর কবিতার সঙ্গে তাঁর গদ্যরচনা তুলনীয়। গদ্যরচনার সাহিত্যমূল্য অসামান্য না হলেও তার 'high seriousness' আমাদের অভিভূত করে। আর কবি কামিনী রায়কেও বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করে

এই বিচ্ছিন্ন গদ্যরচনাগুলি।

দীর্ঘদিন পরে কীটদষ্ট দুষ্প্রাপ্য মাসিকপত্রের পাতা থেকে এগুলি উদ্ধার করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রকে অভিনন্দন জানাই। শ্রীঅভিজিৎ সেন ও শ্রীঅনিন্দিতা ভাদুড়ী প্রচুর পরিশ্রম করে এগুলি সংগ্রহ করেছেন এবং সযত্নে টীকা সংযোজন করেছেন, সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

অলোক রায়

সূচি

কামিনী রায়ের অগ্রন্থিত গদ্যরচনা

জ্ঞানবৃক্ষের ফল

ইংরাজ কবি Gray বলিয়াছেন—"Where ignorance is bliss 'tis folly to be wise".[১] অর্থাৎ যেখানে অজ্ঞানেই সুখ, সেখানে জ্ঞানী হওয়াই মূর্খতা।

বাইবেলের আদিগ্রন্থে জগতের আদি পুরুষ ও আদি নারীর ইতিহাসেও সেই কথা। বাইবেলের মতে মানবের জ্ঞানার্জ্জনই তাহার প্রথম পাপ ও সকল দুঃখ দুর্গতির মূল কারণ। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াই মানব আধিব্যাধি, জরামৃত্যু, হিংসা ও শোকের অধীন হইয়াছে, নতুবা সে অজর, অমর, ও দুঃখ শোকের অতীত হইয়া স্বর্গতুল্য ইডেনে দেবতার মত বিহার করিত।

যে জ্ঞান অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করে, দুর্ব্বলকে বলী করে, দূরতরকে নিকটতর করে, চক্ষুর অগোচর শক্তিসমূহকে করতলস্থ করিয়া দেয়, তাহা আলোকের মত পবিত্র, উজ্জ্বল ও প্রাণপ্রদরূপে কল্পিত না হইয়া প্রাচীন ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে কিরূপে অন্ধকারের চিরসঙ্গী পাপরূপে কল্পিত হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা ভার।

অথচ, এই প্রাচীন আখ্যায়িকার মধ্যেও একটি গূঢ় সত্য নিহিত আছে। শুভাশুভ জ্ঞান না থাকিলে অনেক দুঃখকষ্ট সংসার হইতে চলিয়া যাইত। পশুগণের সদসৎ জ্ঞান নাই, হিতাহিত, সত্য মিথ্যা, পাপপুণ্য বিচার করিবার শক্তি নাই ; এই জন্য লজ্জার ধার তাহারা ধারে না, অন্তরের অনুতাপ ও বাহিরের দণ্ডভয় তাহাদিগকে ক্লেশ দেয় না। যেখানে জ্ঞানের অভাব, সেখানে পাপপুণ্যেরও অভাব।

কিন্তু যে জ্ঞান মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিয়া পশু পদবী হইতে উর্দ্ধে উন্নীত করিয়াছে, যাহা তাহাকে দেবত্বের উত্তরাধিকারী করিয়াছে, বিধাতার সেই দুর্লভ দান মানব জীবন কেবলই দুঃখময় কেন করিবে, এবং কিরূপে করিবে?

জ্ঞানের উষালোকে দাঁড়াইয়া, আদি নর আদম ও আদি নারী হবা যখন পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন, উভয়ের সুন্দর মুখমণ্ডলে যখন প্রথম লজ্জার রক্তিম আভা ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল, তখন সেই অননুভূতপূর্ব্ব ভাবরাশি তাঁহাদের কাছে দুঃখের মত লাগিয়াছিল কি সুখের মত লাগিয়াছিল জানি না। কিন্তু তাহাতে তীব্র বেদনার কিছু ছিল বলিয়া কল্পনা করা যায় কি? সেইদিন কি তাঁহারা অনুভব করেন নাই যে, তাঁহারা পরস্পরের নিতান্ত আপন ও একান্ত আত্মীয় হইলেও দুই দেহে বাস করিতেছেন, এবং তাঁহাদের পরেই সমস্ত জগৎ—অনাত্মীয়, এবং তাঁহাদের একীভূত জীবন হইতে স্বতন্ত্র? সেইদিন যখন তাঁহারা আপনাদের তরুণ দেহ পত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া আসিলেন, তখন হইতেই সংসারে সৌন্দর্য্য ও সংযমের মিলিত পূজা আরম্ভ হইল না কি?

তাঁহাদের এতকালের নিশ্চিন্ত ও নিষ্কর্ম্ম জীবনের আলস্য ও নিশ্চলতা দূর করিয়া পরস্পরের পোষণ ও তোষণের জন্য যে চেষ্টা ও চিন্তার নবীন স্রোতঃ প্রবাহিত হইল, তাহা কি সেই হৃদয় দুইটিকে আরও উর্ব্বরতর ও সুন্দরতর করিয়া লয় নাই?

দৈনিক পরিশ্রমের পর তাঁহাদিগের অপরাহ্ণের অবসর কাল কি পরস্পরের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য জ্ঞানে পূর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতর হয় নাই? দুঃখ বিপদ যত ঘনাইয়া আসিয়াছে, সমবেদনাবোধ তাঁহাদের দাম্পত্য প্রেম কি ততই ঘনীভূত করে নাই? দেখ, স্বেদ-সিক্তদেহ আদম পত্নীর মধুর সম্ভাষণ ও পরিচর্য্যায় কি আরাম অনুভব করিতেছে, ভূমি-কর্ষণ ক্লেশ তাহার মনে নাই। আবার দেখ, নবজননী হবা সদ্যোজাত সন্তানকে বক্ষে লইয়া সকল দৈহিক বেদনা বিস্মৃত হইয়াছে।

পুরুষের পক্ষে স্ত্রীপুত্রের জন্য খাটিয়া মরা, এবং নারীর পক্ষে পতিপুত্রের পরিচর্য্যায় জীবনপাত করা বিধাতার অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ? একলা নিজের জীবনটার জন্য জীবন দেওয়া অর্থহীন কথা। কাহারও জন্য মরিতেছি জানিলে মৃত্যুও মধুর লাগে। একটা 'জন্য' বোধ জীবনে বড়ই আবশ্যক।

মানুষ শৈশবে পশুবৎ ছিল, ক্রমে জ্ঞান প্রভাবে তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইল ; ক্রমে সে দেবতা হইতে চলিল। বাইবেল গ্রন্থের ঈশ্বর বলিতেছেন, "দেখ, ওই মানুষ আমাদের (দেবতাদের) মত হইয়াছে, ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে।"—"পাছে সে হাত বাড়াইয়া জীবনবৃক্ষের ফল আহরণ করে, ও উহা আস্বাদন করিয়া অমর হয় সেই ভয়ে ঈশ্বর তাহাকে ইডেন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।"—জ্ঞান-তরু ও অমৃত-তরু কাছাকাছি ছিল, এখনও আছে। তবু, এত যুগ যুগান্তর পরেও লোকে জ্ঞানকে বিষতরু বলিতে ছাড়ে না। বাইবেলের দেবতা মানুষের জ্ঞানার্জ্জনের প্রতিকূলে ছিলেন, নরসমাজে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর জ্ঞানের পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছে, জ্ঞান-পিপাসুকে দণ্ডিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে, এবং আজিও করিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ সেই আত্ম-প্রাধান্য লোপের অলীক আশঙ্কা—"পাছে আমাদের মত হয়।"

জগতের পুরোহিতকুল বহুকাল জ্ঞানাধার শাস্ত্র সকল আপনাদের একচেটিয়া করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা তাঁহাদের শাস্ত্র-জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তাঁহারা ইতরজাতি ও নারীজাতির উপরে আপনাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।

পুরুষের প্রভুত্বপ্রিয়তাই স্ত্রীলোকের জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র অন্তরায় না হইলেও মুখ্য অন্তরায়। আমরা দেখিতে পাই অনুশীলনের অভাবে শিক্ষা অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যায়। স্ত্রীজাতি জননী জাতি বলিয়া অধীত বিষয়ের অনুশীলনে তাহার অবসর পুরুষ হইতে অনেক কম। পত্নীত্ব ও জননীত্ব নারীর কর্ত্তব্য-ক্ষেত্র যেমন সীমাবদ্ধ করিয়াছে শিক্ষাকালও তদ্রূপ অল্প পরিসর করিয়াছে। নারী কি সে জন্য অসুখী? বর্ত্তমানে এক কথায় ইহার উত্তর সম্ভবে না। জগতের সংখ্যাতীত রমণী এবং বহুল পুরুষ জ্ঞানলাভে নিরুৎসুক, এমন কি একান্ত বিমুখ। কিন্তু পুরুষসাধারণের জন্য শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা, নারীসাধারণের জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা নাই। সংসারে প্রবেশ করিয়া সকল পুরুষ জ্ঞানার্জ্জনে ব্যস্ত থাকে না।

আপনাপন ব্যবসা ও চাকরী লইয়াই অধিকাংশ সময় কাটায়। নারী আপনার গৃহকর্ম্ম ও গৃহধর্ম্মে ব্যস্ত থাকিবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার শিক্ষার পথ রুদ্ধ। যে জন্মান্ধ সে আলোকের জন্য কাঁদে না। কিন্তু যে একবার আলোক দেখিয়া দর্শন সুখে বঞ্চিত আছে সে নিতান্তই দুঃখী। এরূপ দুঃখিনী নারীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে।

সমগ্র মানব জাতি জ্ঞানের আলোকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে জ্ঞান সমাজের জ্ঞানি-জ্যেষ্ঠগণ বহু কষ্টে অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানের মানুষেরা বাল্যকালেই সেই জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে ধনের মত, বিনা আয়াসে লাভ করিতেছে। নূতন জ্ঞান নূতন সুখ দুঃখ আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইতেছে, নব নব শক্তির উন্মেষ করিয়া দিতেছে। কিন্তু এই জ্ঞানালোকের মধ্যে বাস করিয়া এবং ভদ্রেতর সকল শ্রেণীর পুরুষের জন্য জ্ঞানের ও শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াও স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে এ দেশের লোক সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা অতিশয় ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দর্শন করেন। কেন? কেন? সেই এক বুলি—"পাছে ওরা আমাদের মত হয়।"

বলি, তাহাও কি সম্ভবপর? রমণি, জ্ঞানের আলোক তোমাকে কি এমনই অন্ধ করিবে যে, তুমি জননী ভগিনীর মধুর সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া, তোমার পিতার কাঠিন্যটুকুরই অনুকরণে একান্ত ব্যস্ত হইবে! জ্ঞান যদি শুভাশুভ, সুন্দর কুৎসিৎ, উপযোগিতা ও অনুপযোগিতার বিচার করিতেই না শিখাইল তবে তাহাকে জ্ঞান বলিবে কি? তুমি মাতার কোমল বাহু-বেষ্টিত হইয়া তাঁহার বক্ষ-নিঃসৃত শুভ্র ক্ষীরধারা পান করিয়াছ এবং কালে স্বয়ং স্নেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীরূপে শিশুকে বক্ষে পোষণ করিবে, তুমি কিরূপে নারীত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবে আমি তো বুঝিতে পারি না। তুমি পার কি? মনে করাই গেল যে নারী কোন কোন বিষয়ে 'আমাদের মত' হইল, তাহাতে 'আমাদের' ক্ষতি কি? পুরাণে দেখা যায় কোন মানব বা দানব দুশ্চর তপস্যায় রত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত হইয়া তাহার তপস্যায় বিঘ্ন জন্মাইতেন, পাছে সে ইন্দ্রত্বাদি কাড়িয়া লয়। 'আমাদের' সেরূপ কোন ভয় আছে কি?

পুরুষেরা নারীর হীনতা প্রমাণ করিতে গিয়া, কতকগুলি দোষের উল্লেখ করেন। যদি জ্ঞান ও শিক্ষা প্রভাবে নারীগণ যে সকল দোষ হইতে মুক্তিলাভ করেন, ভীরুতা বিমূঢ়তা ঘুচাইয়া, নির্ভীকতা ও স্থির-বুদ্ধি প্রকাশ করেন, অস্থিরমতিত্ব দূর করিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হন; অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করিয়া অদূরদর্শিতার অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান ; পক্ষপাতিত্ব পরিহারপূর্ব্বক অকম্পিত হস্তে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধারণপূর্ব্বক দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতে পারেন, তাহাতে সমাজের ইষ্ট কি অনিষ্ট? নারী যদি কল-চালিত পুত্তলিকার মত না হইয়া আপনার দায়িত্বজ্ঞানে কর্ত্তব্য করিতে শেখেন, পূজার মন্ত্র পাখীর মত উচ্চারণ না করিয়া, তাহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হন ; যদি কুসংস্কারের আবর্জ্জনারাশি সরাইয়া ফেলিয়া, কৌলিক আচার ও ব্রত নিয়মাদির প্রকৃত মর্ম্ম, কবিত্ব, সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা অনুভব করেন, তাহা হইলে কি গৃহ কিম্বা পরিবারে কোন মহান্ অনর্থ ঘটে?

জ্ঞানের যাহা দুঃখ তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ভালকে যদি ভাল বলিয়া জানা যায়, তবে যাহা মন্দ তাহা প্রাণে অশান্তি আনিবেই। জ্ঞানের সঙ্গে নূতন আকাঙ্ক্ষা জন্মে, নূতন

আদর্শ আসিয়া সম্মুখে আহ্বান করে। আদর্শের অনুরূপ হইবার চেষ্টাতেই পুণ্য, বিপরীত হওয়াই পাপ। প্রত্যেক জ্ঞানের সঙ্গে একটা দায়িত্ব আসিয়া আমাদের নৈতিক জীবন অধিকার করে। সে হিসাবে জ্ঞানই দুঃখের আকর। কিন্তু পশু ও মানবে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীতে প্রভেদ এই দুঃখের ভেদেই।

অপরদিকে জ্ঞান ও আনন্দ নিত্য সম্বন্ধ। যেখানে জ্ঞান, সেখানে আলোক ; ভ্রম, সংশয় ও ভয় তথায় তিষ্ঠিতে পারে না, অতএব সেখানে বিমল আনন্দ, সেখানে জীবন অর্থযুক্ত। নতুবা মানব জীবন কিছুই নহে। বৃথা ভারবহন মাত্র।

ভারত-মহিলা, আশ্বিন ১৩১২

বাংলায় নরনারী-সম্বন্ধ

সহচারিত্ব, সহকর্ম্মিত্ব ও সহধর্ম্মিত্ব পুরুষ এবং নারীর সম্বন্ধ সুন্দর, সংযত এবং পবিত্র করে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আনিয়া দেয়, সাধারণ ব্যবহারে অকপট ভদ্রতা শিক্ষা দেয়। পূর্ব্বে কলিকাতায় সাধারণ পুরুষেরা নারীর অবরোধ মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন না ; কেবল তাহাই নহে, আমার মনে আছে রাস্তা-ঘাটে অবগুণ্ঠনহীনা নারীর দিকে লোক কি চক্ষে তাকাইত! কেবল অশিক্ষিত লোক নহে, দোকানী পসারী নহে, কলেজের ছাত্রেরাও খোলা গাড়ীতে যাইতে দেখিলে মহিলাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ এবং মুখভঙ্গী করিতে ছাড়িত না। অনেকেরই দৃষ্টি অভদ্রতা এবং জঘন্য চিন্তার পরিচয় দিত। নারীর পক্ষে অবরোধ-বর্জ্জন এবং অবগুণ্ঠন-মোচন যতই অন্যায় বা অধর্ম্ম হউক না, সেজন্য পুরুষের পক্ষে আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া দৃষ্টির মধ্যে অতি ইতর, কলুষিত ভাব ঘনীভূত করিয়া নারীদের প্রতি তাহা নির্লজ্জভাবে নিক্ষেপ করা, না ভদ্রতা-সঙ্গত, না ধর্ম্ম-সঙ্গত, একথা কি কেহ জানিত না? এই রকম দৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রথম জীবনে আমাদিগকে অনেক চলা-ফেরা করিতে হইয়াছে। সে যে কি পরীক্ষা তাহা এখনকার বালিকারা বুঝিবে না।

এই অবস্থা একসময়ে পরিবর্ত্তিত হইল। খৃষ্টান, ব্রাহ্ম এবং বিলাত-ফেরৎ সমাজে অবরোধ ও গুণ্ঠনবর্জ্জন দেখিয়া দেখিয়া কলিকাতা সহরের লোক সহিয়া গেল বটে, কিন্তু অনেককাল উহা গ্রহণযোগ্য মনে করিল না। কিন্তু ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় দেশের শিক্ষিত যুবকদের হৃদয় হইতে বহুদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধুইয়া গেল। সেই যখন রাজপথ দিয়া স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে স্বদেশসেবী যুবকগণ চলিতেন এবং গৃহের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াইতেন, আর দ্বিতল প্রাসাদের বারান্দা হইতে নারীরা শঙ্খধ্বনির সহিত লাজ ও পুষ্প বর্ষণ করিতেন ; যখন স্বদেশীব্রত লইবার জন্য অন্তঃপুরে নারীরা সভা করিতে লাগিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশনায়কগণ যখন তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিলেন, তখন গৃহে গৃহে পুত্রের সহিত জননী, স্বামীর সহিত পত্নী, দেবরের সহিত ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতার সহিত ভগিনী দেশমাতার কল্যাণের ইচ্ছাতে এক অভূতপূর্ব্ব ঐক্য, সহানুভূতি ও আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। যখন সহাধ্যায়িগণ পরস্পরের গৃহে আসিয়া ভগিনীদের হাত হইতে 'রাখি' লইতে লাগিলেন, দেশে তখন এক পুণ্যের বাতাস বহিল। তখন নিজের ভগিনীর মুখে এবং বন্ধুর ভগিনীর মুখে স্বদেশী গান মিষ্ট লাগিতে আরম্ভ হইল। নারী গান গাহিতেছে বলিয়া আর লজ্জা রহিল না। নারী অবাধে পথ চলিতেছে, সে যে আমার পবিত্র দেশমাতৃকার কন্যা, আমার ভগিনী, এই বলিয়া পুরুষের দৃষ্টি সম্ভ্রমে নত হইয়া আসিল। উপর হইতে শঙ্খ বাজিতেছে, পুষ্পলাজাঞ্জলি মস্তকে পড়িতেছে,—একবার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া স্মিতমুখে দ্বিগুণতর উৎসাহে বালক ও যুবকদল গাহিয়া চলিয়াছে—

"বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা',
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান্!

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মান,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন্,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান্!"

কবির অন্তরের সেই কল্যাণময়ী প্রার্থনা পূর্ণ হইল। দেশের ছেলেদের দৃষ্টি সেই যে পুণ্যজলে সিক্ত ও ধৌত হইল আর সে দৃষ্টি মলিন হইতে দেখি নাই। সে-ই শুভযুগের আরম্ভ। সেই সময় হইতে পথে ঘাটে ভগিনীরা শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ভাইদের নিকট সাহচর্য্য এবং সমাদর পাইয়া আসিতেছেন। তখন সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এবং আনন্দজনক হইয়াছিল চাঁদনী এবং নয়াবাজারের বাঙ্গাল মুসলমানদের ব্যবহার। সে ভদ্র ব্যবহার তাহারা আজিও ভুলে নাই।

কংগ্রেস-মণ্ডপে যে নারীরা গান করিতেন তাহা অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার প্রভাবও এই পরিবর্ত্তনের একটা কারণ। কিন্তু ১৯০৫ সনের পূর্ব্বে উহা এরূপ স্পষ্ট অনুভূত হয় নাই। পর বৎসর ১৯০৬ সনে সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী নারীর বক্তৃতা শুনিয়া বাঙ্গালীরা কেবল মুগ্ধ হইলেন না, মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিলেন। অতঃপর বৎসর বৎসর নারীর সহকর্ম্মিতা, সহধর্ম্মিতা ও দেশসেবায় সাহচর্য্য বাড়িয়া চলিয়াছে। নারীর প্রতি ব্যবহার দেশের স্কুল-কলেজের 'জ্যেঠা ও বখা' ছেলেদের মধ্যেও সংযততর শিষ্টতর হইয়া আসিতেছে। পথে ঘাটে তীর্থে বিপন্ন নারীকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাও এখন বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ স্বামীর উপদেশ এবং তাঁহার দলের দৃষ্টান্ত সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। স্বামীজীর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা আপনার চরিত্র, জ্ঞান, লিপি-কুশলতা ও বাগ্মিতা, সর্ব্বোপরি সহৃদয়তা দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

পুরুষ মানব, আর নারীরা দেবী বলিয়া তাহাদিগকে গৃহকোণে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত রাখিয়া বাহিরের আলোক বাতাস হইতে আড়াল করিয়া নিভৃত অন্তঃপুরের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিতে আর বৃথা চেষ্টা করিও না। একদিন তাহাদের দেবী বলিয়া তাহাদের জীবন্ত তরুণ দেহ বৃদ্ধ পতির মৃতদেহের সহিত দগ্ধ করিয়াছ, সযত্নে তাহাদের শোকার্ত্ত চিত্তকে মৃত্যুর পথে স্থির রাখিয়াছ, সহমরণের অশেষ পুণ্য শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের নিকট পাঠ করিয়াছ, দহমান দেহের যন্ত্রণায় চিতা হইতে লাফাইয়া পড়িতে চাহিলে বাঁশ দিয়া তাহাকে চিতার উপর চাপিয়া রাখিয়াছ, বাদ্য বাজাইয়া তাহার চীৎকার ধ্বনি ডুবাইয়া দিয়াছ। আজ পর্য্যন্ত অশীতিপর বৃদ্ধের অঙ্কে ক্ষুদ্র বালিকাকে তুলিয়া দিতেছ, বিধবা বালিকাকে ব্রহ্মচর্য্য শিখাইতেছ, তাহাকে দিয়া নির্জ্জলা একাদশী করাইতেছ, আর মনে করিতেছ তোমরাই সনাতন ধর্ম্মের প্রহরী ও রক্ষক। আজিও আপনার কুলমর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য কন্যাকে দরিদ্র মূর্খ কুলীনের হস্তে অর্পণ করিতেছ। আপনারা অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দুর্নীতির আবর্জ্জনা সমাজদেহের উপর স্তূপাকার করিতেছ। নারীর পদস্খলনের কারণ হইয়া নিজেরা অবাধে স্পর্দ্ধা ও ঔদ্ধত্যের সহিত সমাজের বক্ষে বিচরণ করিতেছ এবং পতিতা নারীকে জন্মের মত সমাজ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিতেছ। একদিনের পদস্খলন-জনিত মলিনতা তাহার সমস্ত জীবনের তপস্যায় ক্ষালিত হইবার নয়। ভুলিয়া যাইতেছ যে পিতা দেব না

হইলে দেবী কন্যা লাভ হয় না। দানব প্রতিবেশীর অপবিত্র বাসনার খর্পর হইতে নিষ্কলঙ্ক দেবী-প্রতিমাকেও রক্ষা করা দুর্ঘট। বুঝিতেছ না যে তোমাদের মধ্যে যতদিন দানবত্ব প্রবল থাকিবে, ততদিন তোমাদের গৃহে গৃহে দেবীর অধিষ্ঠান সম্ভব নহে।

তোমরা মানব হও,—আমাদিগকে মানবী মানিয়া মানবীর অধিকার দাও। স্বামীর সহধর্ম্মিণী রূপে, ভ্রাতার সহকর্ম্মিণী রূপে কর্ম্মক্ষেত্রে তোমাদের পার্শ্বেই আমাদের স্থান কর। তোমরা বল, আমাদের পূজা করিতেছ। আমরা এমন পূজা তো চাহি না। দেবতার পূজাও অনেক মানুষ এই রকমই করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অন্তর্য্যামী দেবতা জানেন যে মন্দিরের স্বর্ণচূড়া গড়িতে কেবল পূজকের গর্ব্ব, প্রতিমার অঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে সাজাইয়া ঐশ্বর্য্যের ঘটামাত্র ; যাহাতে বাদ্য ও নৈবেদ্য সম্ভারের মহার্ঘ্যতা ও প্রাচুর্য্যের গর্ব্ব, তাহার ভিতরের ভক্তি নাই, সে কেবল আপনারই পূজা! তোমরা ত বহুকাল ধরিয়া এই রকম পূজা আমাদিগকে দিয়া আসিতেছ। আমাদিগকে নিষ্ক্রিয়, অলস ও অপদার্থ করিয়াছ, আমাদের দেহগুলিকে তোমাদের ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপনমাত্র করিয়াছ। কেবল তাহাই নহে, তোমাদের ক্রীড়ার পুত্তলী, বিলাসের সাধনমাত্র করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত মানবীত্বের ও সতীত্বের গৌরব হইতেও ভ্রষ্ট করিয়াছ। ভোগবিলাসীর সোহাগে শুচিতার অভাব। সে জন্য গৃহে বদ্ধ থাকিয়া এবং পত্নীনাম ধারণ করিয়াও সহস্র সহস্র নারী অশুচি জীবন যাপন করিতেছে। কেবল তাহার মাতৃত্বই তাহার একমাত্র শুদ্ধি। উহাই তাহার জীবন দেবত্বের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে, মাতৃত্ব তাহাকে ভোগে সংযত এবং ত্যাগে মহিয়সী করিয়া দেবত্বের পথে অগ্রসর করে।

তরুণ, মাঘ ১৩৩০

সুপ্তশক্তির জাগরণ

প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বে একটা ঘূর্ণীবায়ু (বা tornado) ঢাকা সহরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছিলাম তখন বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে একটি বিচিত্র জলস্তম্ভ উঠিয়াছিল, নদীর কিয়দংশ কিছুক্ষণ জলশূন্য ছিল, সেখানে নৌকা জ া না ভাসিয়া কর্দ্দমে বসিয়াছিল। পাগল বাতাস নদীর কাদা সহরের কোন কোন পাকা বাড়ীর গায়ে লেপিয়া, নদীতীরস্থ নবাবের সুন্দর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া, সিঁড়ীর লোহার রেইলিং মুচড়াইয়া, জীবন্ত, মানুষকে উড়াইয়া লইয়া এক স্থানে তাহার মাথা অন্যত্র তাহার দেহ ফেলিয়া কোথায় গিয়া অদৃশ্য হইল। এই আকস্মিক ব্যাপারের বর্ণনা খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম ও লোকের মুখে হয়তো কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত আকারে শুনিয়াছিলাম।

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে রংপুরে আর একবার ঘূর্ণীবায়ুর পরিচয় পাইয়াছিলাম। সে দিন কোথাও কিছু নাই, দ্বিপ্রহরে হঠাৎ দূরে একটা কলরব শুনিলাম। তাহার পর শুনিলাম চাকরেরা বলাবলি করিতেছে, বাজারের দিকে আকাশ লাল দেখা যাইতেছে। একজন আর্দ্দালী আসিয়া বলিল—"হুজুর! ঘূর্ণি আসিতেছে, সাবধান হউন।" জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিতে হইবে? সে বলিল, ফাঁকা জায়গায় যেখানে নীচু জমী বা গর্ত্তের মত আছে সেখানে উপুড় হইয়া শুইয়া থাকা নিরাপদ। দেখি হঠাৎ কাছারী ভাঙ্গিয়া উকীল, মোক্তার, হাকিম, আমলা ও মামলাকারীর দল নিজ নিজ বাটীর দিকে ছুটিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের জন্য সকলেরই মুখে ভয় ও ভাবনা। ঘূর্ণীবায়ু আমাদের দিকে না আসিয়া অন্যদিক দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার আকৃতি দেখিতে পাইলাম না কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইলাম। একঘণ্টা যাইতে না যাইতে দেখি বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আহত ও মৃতপ্রায় লোকদের লইয়া গোরুর গাড়ী সব হাসপাতালের দিকে চলিয়াছে। কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও মাথা ফাটিয়াছে, কাহারও নাক, কাহারও কান, কাহারও পা কাটা গিয়াছে। যে গ্রামের উপর দিয়া ঘূর্ণী গিয়াছে, তাহার ঘরগুলির বেড়া কত চাল খুঁটী ঢেউটিনের [corrugated iron sheets] ছাপ্পর, বাঁশ সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে, এবং যাইবার পথে যে মানুষ পড়িয়াছে ঐ সকল জিনিষের আঘাতে তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। রাজপথের যে দিক দিয়া শেষে অদৃশ্য হইয়া গেল, পরদিন গিয়া দেখিলাম পথের ধারের গাছগুলির কেবল সেইদিকের ডালগুলি ভাঙ্গা।

এই আকস্মিক উৎপাত কোথা হইতে আরম্ভ হইল, কেন হইল পরে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা বায়ু বিদ্যুৎ উত্তাপাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা জানেন তাঁহারা তাঁহাদের মত ও অনুমান ব্যাখ্যা করিলেন—কোন জলময় স্থানে তড়িৎমণ্ডলে কি বিক্ষোভ (disturbance) হইয়াছে—সাধারণ লোকে ইহাকে আকস্মিক ও দৈব ঘটনা বলিয়াই মানিয়া লইল।

ঘূর্ণীবায়ু সকল সময়েই এমন ভীষণভাবে দেখা দেয় না। কালবৈশাখী যাহাকে বলে আমরা প্রতিবৎসরই দেখি। ভয়ানক গ্রীষ্ম, বাতাস নাই, চারিদিকে তাপ যেন জমাট, সবাই বলিতেছে এবার একটা বৃষ্টি হবে। সত্যই কোথা হইতে হু হু শব্দে ধূলা বালু আর শুষ্ক পাতা

উড়াইয়া প্রবল বেগে বাতাস ছুটিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে কাল মেঘে আকাশ ছাইল,— প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তাহার পর মুষলধারে বৃষ্টি, বিদ্যুতের চমক, পরে বজ্রনাদ ও শিলাপাত। সকালবেলা চারিদিক শুষ্ক, গাছগুলি ধূলায় ধূসর, বিকালে বৃক্ষলতা স্নাত ও নির্ম্মল। ইহা সকলের কাছে পরিচিত। গরম ও গুমট হইলে অনেকেই বৃষ্টির আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করিতে পারেন। তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বঙ্গসমুদ্রে ঝড় উঠিয়াছে কি না এবং কতক্ষণে ভিতরে আসিয়া পৌঁছিবে Port Commissioners-এর আফিস হইতে তাহার খবর পূর্ব্বেই বাহির হয়।

আমাদের হিসাবে আগ্নেয়গিরি সহসা অগ্নি উদ্‌গীরণ করে, সহসা ভূমিকম্প হয়। ইহাদের আকস্মিকতা, জ্ঞানবৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উৎকর্ষের সহিত ক্রমে দূর হইবে। মানুষ হয়তো পূর্ব্ব হইতে ইহাদের অভিযানের সংবাদ পাইয়া আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারিবে। জাপানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় তাই সেখানে হালকা কাঠের বাড়ী। ভারী ইমারত ভূমিকম্পে পড়িয়া যাইবার ভয়। হালকা জিনিষ যথাস্থানে থাকে।

এই যে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি যাহাকে পূর্ব্বে নিতান্ত আকস্মিক দৈব ঘটনা বলা হইত সেগুলি দেবতার প্রেরিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার আকস্মিক ক্রোধের চিহ্ন নহে। জড় জগতে আকস্মিক তো কিছুই নাই। যাহা নির্দ্দিষ্ট কারণের অপরিহার্য্য ফল তাহাকে আকস্মিক বলা সঙ্গত হয় না। এই জড়জগতে নানা অদৃশ্য শক্তি আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই শক্তিগুলি কখন কি ভাবে কাজ করে আমরা হিসাব রাখি সে সাধ্য নাই। আমাদের চক্ষে ইহাদের রূপ ধরা পড়ে না ; আমাদের কর্ণের পক্ষে ইহারা নীরব, আপনার স্থিরতার মধ্যে ইহারা সুপ্ত অথবা লুপ্তভাবে অবস্থিত। হঠাৎ একদিন অকালে নিদ্রাভঙ্গে ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত ইহারা আপন ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ করে, তখন ভয়ে বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে আমরা তাহাদের পরিচয় পাইবার জন্য ব্যস্ত হই।

মানবজাতির শৈশবে প্রাকৃতিক শক্তিকে সে অমঙ্গলের দেবতা বলিয়া ভয়ে ভয়ে পূজা দিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে প্রকৃতির রুদ্র শক্তি সকলের মধ্যে সে মঙ্গলের আবিষ্কার করিতে লাগিল। মহাবনে দাবানলরূপে অগ্নি তাহাকে ভীত করিয়াছে, অসহ্য শীতে তাহাকে তাপ দিয়া তাহার আহার্য্য পশুপক্ষীর মাংস সুপক্ক ও সুস্বাদু করিয়া তাহাকে প্রীতও করিয়াছে। নদীর জলে পান ও স্নান করিয়া তৃপ্ত হইলেও উহা যতদিন তাহার উত্তরণীয় ছিল না ততদিন তাহাকে পথরোধকারী শত্রুই মনে হইত, যেদিন সে তাহার ভেলাখানি বুকে করিয়া তাহাকে সহজে অপর পারে লইয়া গেল, সেদিন হইতে সে পরম মিত্র। যত জড় রাজ্যের বিধিবিধান বুঝিয়া প্রচণ্ড শক্তিগুলিকে স্ববশে আনিতে পারিল, ততই সে কল্পিত দেবতাদিগকে আপনার হিতকারী বলিয়া বুঝিতে ও আনন্দের সহিত পূজা দিতে আরম্ভ করিল। দেবতাদের অমঙ্গ ল শক্তিকে সে একেবারে অস্বীকার করিল না, কিন্তু মনে করিতে লাগিল যে তাহার পূজায় প্রসন্ন হইয়া দেবতা আপনার রুদ্র মূর্ত্তি তাহার শত্রুপক্ষের দিকেই রাখিবেন।

মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া জড়শক্তিকে দেবতার পদ হইতে মিত্র ও ভৃত্যের পদে নামাইয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির কত শক্তি এখনও অনাবিষ্কৃত অচিন্তিত ও স্বপ্নেরও অগোচর। ভূগর্ভে বিশ্বকর্ম্মার তপ্ত কটাহে নিয়ত কত ধাতুদ্রব্য দ্রবীভূত হইতেছে। সমুদ্রজলের ভারে তলের

কর্দ্দম কঠিন প্রস্তরে পরিণত হইতেছে, জলমধ্যে অতি ক্ষুদ্র কীটানুকুলের মৃতদেহে দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হইতেছে ; এত ধীরে হইতেছে যে মানুষের আয়ু অযুত গুণে বৃদ্ধি হইলেও সে দেখিয়া কিছু বুঝিবে না। তাহার জন্মের যুগযুগান্তর পূর্ব্বে ভূমিকম্পে যে বনভূমি ভূতলে প্রোথিত হইয়াছিল আজ প্রস্তরীভূত সেই বনরাজ্য তাহাকে রন্ধনের ইন্ধন, প্রদীপের বাষ্পরূপী তৈল, আর কত কাজের সরঞ্জাম, রোগের ঔষধ ও ভোগের উপকরণ যোগাইতেছে। কয়লার মধ্যে যে তাপদায়িনী শক্তি, যে তৈলাদি সঞ্চিত আছে তাহার সমুদয়ই ভূমিকম্পে লুপ্ত ছিল অথবা *সুপ্ত* ছিল। *অগ্নিসংযোগে* কত গ্যাস, কত তৈল, কত সুগন্ধ দুর্গন্ধ দ্রব্য পৃথক হইয়া আসিতেছে। সেই সুপ্তশক্তি জাগিয়া কলকারখানা, রেলগাড়ী, ষ্টীমার চালাইয়া লইতেছে।

জড়জগৎ হইতে নরজগৎ অনেক আধুনিক—যেন এই সেদিনকার সৃষ্টি। কিন্তু এই আধুনিক জগতেও আমাদের জড় চক্ষুর সম্মুখে অনেক অদৃশ্য শক্তি নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। কোথাও নীরবে সঞ্চিত হইয়া আত্মপ্রকাশের সময়ের অপেক্ষা করিতেছে।

মানবের আদিম ইতিহাস কেহ জানে না, জানিবে না, কল্পনা অনুমানে কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইলেও তাহা ইতিহাস হইবে না। অনেক যুগান্তরে ও পরিবর্ত্তনের পর কতগুলি প্রাচীন দেশ ও জাতির উত্থান-পতনের বিবরণ আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পড়িয়া থাকি। অনেক আনুমানিক কথাও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসের মধ্যেও সুপ্ত বা সঞ্চিত শক্তির প্রবল প্রকাশ বারংবার মানুষ দেখিয়াছে।

অগ্ন্যুৎপাতের মত, ভূমিকম্পের মত, ঘূর্ণীবায়ুর মত প্রবল প্রচণ্ড শক্তি প্রতিহিংসা, বিজয়াভিলাষ, ধনলালসা, ভূমিলালসা, বিজাতিবৈরিতা, পরধর্ম্মবিদ্বেষ ইত্যাদি নানা আকারের এবং নানা প্রকারের মানবীশক্তি এক জাতির মধ্যে প্রকাশ পাইয়া অনেক সুখদুঃখ ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সভ্যতার সৃষ্টি অসভ্যতার মৃতদেহ কঙ্কালের উপর। যখন দুই শক্তিতে সংঘর্ষ, তখন একের দুর্ব্বলতা অপরের বিকাশের অনুকূল অবস্থা।

রোমের বিলাসিতা তাহাকে ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য করিয়াছিল বলিয়াই গথ অ্যাষ্ট্রোগথ ও ভ্যাণ্ডেল (Goths, Ostrogoths, and Vandals)-দের[২] হস্তে তাহার দুর্গতি সম্ভব হইয়াছিল। বিলাসিতা রোগ এক ঘোর অমঙ্গলশক্তি ; তাহাও কালে উপচিত হয় ও দুর্গতির পথ দিনে দিনে প্রশস্ত করে। দেশের অতিরিক্ত শান্তি ও সমৃদ্ধি যদি আলস্য ও নিশ্চিন্ততা আনিয়া দেয়, যদি স্বদেশরক্ষার জন্য অর্থের দ্বারা বিদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করায়, তবে দেশ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়, শত্রুরোধ করিবার শক্তি তাহার লোপ পায়।

রাজা ও রাজবল্লভগণ ব্যসনাসক্ত ও প্রজার হিতকামী না হইয়া যদি প্রজাপীড়ক হয় তবে নীরবে সঞ্চিত প্রজামণ্ডলীর বহুদিনের অসন্তোষ একদিন প্রলয়বন্যার মত প্রবাহিত হইয়া রাজসিংহাসন ভাসাইয়া লইয়া যায়। ফরাসী বিপ্লব তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

নীরবে অত্যাচার সহিতে সহিতে মানুষ শক্তি হারায় এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল। কিন্তু শক্তির সুপ্তি তাহার লুপ্তি নহে। অতিশয় আঘাতে সে দৈত্যের মত জাগিয়া উঠে। আপাতঃ দৃষ্টিতে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, কিন্তু আঘাতের অপরিহার্য্য প্রতিঘাতরূপী অবস্থাবিপর্য্যয় ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়াছে। সেই প্রতিঘাত এই প্রকারের

নিদ্রাভঙ্গ-জনিত। অনেক অত্যাচারী রাজার পুত্র বা পৌত্র স্বয়ং নিরপরাধ হইয়াও পূর্ব্বপুরুষের প্রাপ্য দণ্ড ভোগ করিয়াছে।

বিধাতাপুরুষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহার চলিবার নিয়মপ্রণালী স্থির করিয়া দিয়া, অনন্ত-শয্যায় গিয়া ঘুমাইয়া পড়েন নাই। তিনি জড়ে ও জীবে শক্তিস্বরূপ ও প্রাণস্বরূপ হইয়া আপনার বিধাতৃত্ব অহরহঃ প্রচার করিতেছেন। তিনি স্বয়ং সনাতন একথা সত্য এবং বিধি ও ধর্ম্মের সনাতনত্বও সত্য, কারণ প্রকৃতির বিধি আজও যাহা কালও তাই। কিন্তু অনন্ত কাল ধরিয়া যে অনন্ত পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিতেছে, যে ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে, তাহাও বিধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মূলে বিধি এক হইলেও অবস্থার সঙ্গে তাহার প্রকাশ ভিন্নতর হইবে। অবস্থার মত ব্যবস্থা তাহাও মূল বিধির অন্তর্গত।

প্রাকৃতিক নিয়মে ও আধ্যাত্মিক নিয়মে নরসমাজে নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যাঁহারা মনে করেন যে একদিন সকলে বসিয়া নিজেদের সুবিধামত ও সংস্কার সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় রীতি-নীতি আচার ও অনুষ্ঠান রচনা করিয়া তাহার উপরে সনাতন ছাপ দিয়া উহা চিরকালের জন্য স্থায়ী করিয়া যাইবেন, তাঁহারা ভুল করিতেছেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গতি আছে, বৃদ্ধি আছে, রূপান্তর আছে, জরা ও ক্ষয়ও আছে। কোন প্রাচীন ধর্ম্ম চিরদিন আপনার আদিম রূপ অক্ষয় ও অক্ষত রাখিতে পারে নাই, পারিবে না। জগতের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া এখন বৌদ্ধধর্ম্ম কলুষিত হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মের বিপুল প্রবাহ বহু মঙ্গল সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার আদর্শ এখন কি? উৎসস্থানে নদীর জল নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইলেও নিম্নতর প্রবাহ হইতে উহা সংকীর্ণতর। পর্ব্বত-নিঃসৃত নদীর গতিবৃদ্ধি ও প্রসার তাহার উৎসস্থানে বসিয়া নির্ণয় করা যায় না। সে সমতল ভূমিতে আসিয়া যখন বিপুল ধারায় কূল ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিতে থাকে তখন তীরভূমি রক্ষার জন্য উহা স্থানে স্থানে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু এমন স্থান আছে যেখানে বাঁধ কিছুতেই দাঁড়ায় না। পদ্মার তীরের অনেক লোকালয় সরাইয়া লইতে হইয়াছে, আগে যেখানে মহকুমা ও রেলওয়ে ষ্টেশন ছিল এখন সেখানে জলরাশি। কেন স্থল বিশেষে নদীর বেগ বাড়িতেছে সাধারণ লোকের তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই। কিন্তু যখন ভাঙ্গন ধরে, যখন ফাটার রেখা দেখা যায়, যে সুবুদ্ধি ও সাবধান সে ঘরদুয়ার ভাঙ্গিয়া নিরাপদ স্থানে গিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করে।

আমাদের এই আলস্য প্রধান দেশে অস্থাবর জিনিষকে স্থাবর এবং সাময়িককে চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা প্রবল। কারণ স্বয়ং চিন্তা করিয়া কোন বিশেষ লক্ষ্যের অনুসরণ, পুরাতনের শোধনবর্জ্জন লোকের অপ্রীতি উৎপাদন করে। পুরাতন বিধির ও ঋষিবাক্যের দোহাই দিয়া কোন প্রকারে জীবিকা অর্জ্জন ও নিরুদ্বেগে নিদ্রা দেওয়া এবং বৃদ্ধ বয়সে যখন নিদ্রা সহজে আসে না, তখন নিয়মপূর্ব্বক জপতপ নিয়মাদি রক্ষা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে দেশের লোক যেন জাগিয়া উঠিতেছে। সমস্ত দেশের নিদ্রিত অবশ অঙ্গে স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। পর্ব্বতপৃষ্ঠে সঞ্চিত তুষার গলিয়া নদীধারারূপে নামিয়া আসিতেছে।

যখন দেশপ্রীতি ও স্বাদেশিকতার রব প্রথমে এদেশের আকাশে উঠিল, তখন উহার সহিত 'তথাকথিত' সনাতন ধর্ম্মের বিরোধ কেহ অনুভব করেন নাই। [আমাকে কেহ ভুল

বুঝিবেন না, আমি সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী নই কিন্তু বর্ত্তমান সনাতন শব্দের ব্যাখ্যার বিরোধী]। স্বাদেশিকতা বিদেশের আমদানী হইলেও উহা আমাদের লজ্জার আবরণ বস্ত্রের মত, আমাদের দৈনিক অন্নের সঙ্গে বিলাতী লবণের মত নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য,—না হইলে চলে না।

স্বদেশপ্রীতি কি পূর্ব্বে দেশে ছিল না—ছিল বই কি। লবণও তো ছিল এবং আছে। কিন্তু আমাদের তাঁতির দল প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে, আমরা কাপাসের চাষ করিতে ও সূতা কাটিতে ভুলিয়া গিয়াছি ; সমুদ্রজল হইতে এবং অন্যান্য উপায়ে লবণ সংগ্রহ করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা আজ বিদেশীর হাত হইতে আমাদের স্বদেশপ্রীতির শিক্ষাও গ্রহণ করিতেছি। আমরা অনেক কাল দেশকে চিনি নাই, আপনার বলিতে শিখি নাই। সম্প্রতি চিনিতে ও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি।

স্বাদেশিকতা কেন সনাতন সামাজিক বিধির উচ্ছেদ বা রূপান্তর ঘটাইবে তাহা বলি। পুরাতন সনাতন ধর্ম্মের এক প্রধান দুর্গ জাতিভেদ—জাতিবিশেষের প্রাধান্য ও অকারণে সম্মান এবং নিম্নজাতির মনুষ্যত্বের অকারণ অবমাননা। পাশ্চাত্য শিক্ষার কামানে এই দুর্গ স্থানে স্থানে ভগ্ন ও জীর্ণ হইয়াছিল ; স্বাদেশিকতার প্রবাহ যদি সত্য সত্যই বহে, ইহার মূল নিশ্চয়ই শিথিল হইবে, Homerule বা স্বরাজের ভূমিকম্পে উহা ধূলিসাৎ হইবে। জনসাধারণের সুপ্তশক্তির জাগরণে ধর্ম্মের রূপ, সমাজের রূপ, সামাজিক আচার ব্যবহারের রূপ পরিবর্ত্তিত না হইয়া যায় না। এই পরিবর্ত্তনের বীজ বহুদিন হইল উপ্ত হইয়াছে।

আমি আবার বলি, আজ যাহাকে সনাতন বলা হইতেছে তাহা সনাতন বলিয়া ভবিষ্যতে গৃহীত হইবে না। *সনাতনের ভিত্তি* আরও *গভীরতর,* আরও *প্রশস্ততর হওয়া চাই*। বন্ধুর পর্ব্বতপৃষ্ঠের বিধিনিষেধ সমতলপ্রবাহিনী ভাগীরথী মানিয়া চলিবে না।

পৃথিবীপৃষ্ঠের যুগব্যাপী পরিবর্ত্তনের মত মানব সমাজেও যুগান্তর আছে। সমস্ত মানবসমাজের উপর দিয়া অল্পাধিক পরিমাণে তাহার প্রভাব ও চিহ্ন সে রাখিয়া যায়। পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনেক পুরাতন জীব ও উদ্ভিদের ক্রমপরিবর্ত্তন ঘটে, অনেকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হয়। পৃথিবী তথাপি জীব ও উদ্ভিদে পরিপূর্ণা থাকে। সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরও সমাজ থাকিবে, নীতিধর্ম্ম থাকিবে, ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের বিচার থাকিবে, কারণ নীতি ও ধর্ম্ম ছাড়া সামাজিক জীবন হয় না এবং সমাজবদ্ধ না হইয়া মানুষ থাকিতে পারে না।

স্বাদেশিকতা দৃঢ় করিতে হইলে হিন্দু-ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যা দূর করিতে হইবে। স্বর্গীয় ভূদেববাবু তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে[৩] লিখিয়াছেন যে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বিরোধ নাই, কোন জাতির সঙ্গেই আর কোন জাতির বিদ্বেষ বা দ্বন্দ্ব নাই। কেহ কাহারও নির্দ্দিষ্ট স্থান ও জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য জাতির কর্ম্ম ও অধিকার পাইবার জন্য ব্যগ্র নয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এ-কথা অপ্রমাণ করে। কোনো মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে অপর হইতে হীন মনে করিতে বা অপরের দ্বারা হীনরূপে আচরিত হইতে চাহে না। যেরূপ করিতে চাওয়া মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। বহুকালের অভ্যাসে হীনত্বের ধারণা এদেশের নিম্নশ্রেণীর মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল

সন্দেহ নাই। কিন্তু ভিন্নজাতীয় রাজার শাসনে এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এখন এই হীনতাবোধ তাহাদের লজ্জা ও ক্রোধের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। হীন যাহাদিগকে বলা হয় তাহারা আর হীন থাকিতে প্রস্তুত নহে। শুনিয়াছিলাম পূর্ব্ববঙ্গে নমঃশূদ্রেরা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষাল ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করিতে চাহিতেছে এবং কোন কোন স্থানে কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিতেছে।

স্বরাজ সম্ভব করিতে হইলে দেশের সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার এবং সেই সঙ্গে নারীদেরও শিক্ষার আবশ্যক। শিক্ষাই মানুষে মানুষে সমতাবিধান করিতে সমর্থ। মৈত্রী ও স্বাধীনতাও শিক্ষাবিহীন হইলে দলাদলি ও স্বেচ্ছাচারে পরিণত হইবে। শিক্ষার উপরেই ধনবৃদ্ধি, আত্মসম্ভ্রম ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।

কেহ কেহ বলেন এদেশে কর্ম্ম অনুসারে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। জেতা-বিজিত সম্বন্ধ হইতেই জাতিগত বৈষম্য এত কষ্টদায়ক হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, "জাতিভেদ ইউরোপ আমেরিকায় কি নাই?", আছে সত্য, কিন্তু জাতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া উন্নত জাতিতে যাইবার বাধা সেখানে নাই। সেখানে ছোট বড় হইতে পারে, এখানে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। কিন্তু কালে পারিবে। জাতির কঠিন বন্ধন শিথিল হইতেছে। যখন জন্মগত জাতিভেদ দূর হইবে তখন যদি কর্ম্মানুসারে ও গুণানুসারে জাতিভেদ আসে, আসুক। আজ উপরের দিকে গতিরোধ করিবার আমরা কে?

উপরের দিকে উঠিবার পথরোধ করিয়া আমরা দেশের শক্তি নিষ্ক্রিয় রাখিয়াছি, আপনাদের বলক্ষয় করিয়াছি। অনেকে এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না যে কায়স্থের উপবীতগ্রহণ এবং 'বর্ম্মণ' উপাধি গ্রহণ উপরের দিকে উঠিবারই অতি স্বাভাবিক চেষ্টা এবং সেই হিসাবে দূষণীয় নহে। বঙ্গের নমঃশূদ্রাদির এবং মান্দ্রাজে পঞ্চমদিগের চেষ্টায় কেন কেহ বাধা দিবে?

জাতিভেদ কথাটার আর একটা দিক্ আছে। সবর্ণবিবাহ জাতিভেদ প্রথার এক অভেদ্য প্রাচীর ছিল। হিন্দুনামধারী কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অসবর্ণ বিবাহকেও হিন্দুধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রসার এবং উদারতা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই তো পদ্মার এককূলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর ভিক্ষুব্রত গ্রহণে একান্ত আকাঙ্ক্ষা জানিয়া এবং বুদ্ধদেবের সে বিষয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতি ভিক্ষুত্ব ও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ কি না। সত্যের অনুরোধে মহাপুরুষ নারীর সে সামর্থ্য অথবা অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

নারীর উচ্চশিক্ষা একদিকে তাহাকে কুমারী ব্রহ্মচারিণী থাকিবার, অপর দিকে আপন রুচি অনুসারে ভিন্নজাতীয় কিন্তু অন্যথা সুযোগ্য পাত্রকে বরমাল্য দিবার অধিকার দিবে।

নারীর শিক্ষা কতখানি হওয়া সম্ভব, নারীজাতির মধ্যে সেক্ষপীয়র ও গেটে (Shakespeare ও Goethe) সদৃশ বড় কবি, থ্যাকারে ও ডিকেন্স-এর (Thackeray ও Dickens) মত ঔপন্যাসিক, র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জেলোর (Raphael ও Michael

Angelo)-র মত বড় চিত্রকর, বাক ও বিথৌন এর (Bach ও Beethoven) মত বড় বাদক হইতে পারে কিনা সে তর্কের প্রয়োজন এখানে নাই। পুরুষের মস্তিষ্ক হইতে নারীর মস্তিষ্ক কত কম, দেহের ওজনের অনুপাতে পুরুষ নারীর মস্তিষ্কের সমানুপাত কিনা, গুণ ও মাত্রায় উভয় মস্তিষ্কের কত তারতম্য, এ সকল বিচার করিবারও সময় এখনও আসে নাই। আমাদের প্রয়োজন সুস্থসবল কর্ম্মিষ্ঠ জাতীয় জীবন, অকপট উদার ধর্ম্মজীবন। নারীকে বাদ দিয়া, নারীশিক্ষা অবহেলা করিয়া সে জীবন গড়িতে পারে না। যাহা কিছু আজকাল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাও শিক্ষার মঙ্গল প্রভাবে, এই কথাই প্রণিধানযোগ্য। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবারকার কংগ্রেসে নারীপুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠে বৈদিক গান :

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
সমানঃ মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী ইত্যাদি।

তথাকথিত সনাতন ধর্ম্ম কি নারীকে বেদোচ্চারণে অনধিকারিণী করে নাই? আমাদের দেশে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে শাস্ত্রের বহুলচর্চ্চা এই যুগেই তো আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধারের পথ দেখাইল কে?

দেশের লোক সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে না। যাহা কেবল সময়ে আসে, তাহা বিদেশের ঝড়বাতাসে আসে। প্রকৃতির অন্ধ শক্তির মতই দিগ্‌বিদিক না দেখিয়া আসে, কিছু ছাড়ে না, কিছু রাখে না, কাহাকেও নির্দ্দোষ বলিয়া বাঁচায় না, সম্মুখের সমুদয় ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, ভাসাইয়া, ডুবাইয়া, চলিয়া যায়। প্রকৃতি দেবতার অজ্ঞান বলিষ্ঠ ভৃত্য, মানুষ দেবতার সহকর্ম্মী—হৃদয়বান্ ও চক্ষুষ্মান্। প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায়, সে আপনার বিনাশের মুখে দাঁড়ায়। বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া যে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করে, সে ভাঙ্গন-ধরা কূল ছাড়িয়া দৃঢ় ভূমিতে বাসা বাঁধে।*

নব্যভারত, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

* এই প্রবন্ধটী ১৩২৪ বঙ্গাব্দে রচিত ও কোন সভায় পঠিত হয়। বর্ত্তমান সময়েও ইহার সার্থকতা আছে বলিয়া অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়া ও সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া ইহা মুদ্রিত হইল।—সম্পাদক [নব্যভারত]।

অশ্বিনীকুমার দত্তের বিশিষ্টতা*

আগেই একটু ভূমিকা ক'রতে হ'ল। কারণ বড় কোন সভায় উঠে কিছু বলা আমার পক্ষে বড় কঠিন কাজ। এসেছি নিজের শ্রদ্ধার প্রেরণায়, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে হচ্চে নিতান্তই অনুরোধে পড়ে'। ব'লবার কথা আমার মাত্র দুইটি। সংক্ষেপে তাই বলে কর্ত্তব্য শেষ ক'রব।

প্রথম কথা, আজ যাঁর মৃত্যুদিনের স্মৃতি রক্ষা ক'রতে সকলে এখানে সম্মিলিত হয়েছি, তিনি আমার স্বদেশী সাধু, দেশভক্ত পুরুষ। কেবল বঙ্গের বা ভারতের বলে' নয়, আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে, নিকটতর ভাবে, তিনি আমার স্বদেশী ছিলেন। কারণ তাঁহার মত আমিও বাখরগঞ্জের লোক। তিনি যে জেলায় জন্মেছিলেন আমিও সেইখানেই জন্মেছিলাম, সেই সেখানকার মাটী জল হাওয়ায় যদি আত্মীয়তা-সাধক কোন গুণ থাকে, তবে তাদের ভিতর দিয়ে আমরা নিকট আত্মীয়। আমার পিতৃদেবের[৪] সঙ্গে তাঁর[৫] সম্প্রীত ছিল। আমি আমার কিশোর বয়সে আমার পিতার বৈঠকখানাতেই দূর হ'তে তাঁকে দেখ্‌তাম ; কথাবার্ত্তা ব'লবার উপলক্ষ্য তখন ঘটেনি। আমার পিতৃদেবের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক তাঁর হ'ত। তাঁর দুই এক বিষয়ে একটু বিশিষ্টতা ছিল, তখন সেটা একটু অদ্ভুতত্ব বলেই মনে হ'ত। সে কথা আর একটু পরে বল্‌ব।

তিনি যখন ওকালতী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন, বরিশালের ছেলেদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'য়ে তাদের অনেকের জীবনে আপনার প্রীতি পবিত্রতা ও শুভ ইচ্ছার ধারা যেন ঢেলে দিতে লাগলেন, তাঁর তখনকার সেই আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা অনেক শুনেছি, তাঁর প্রতি কোন কোন ছাত্রের ভক্তির মধ্যে তার নিঃসন্দেহ প্রমাণও পেয়েছি। কিন্তু বরিশালে থেকে তা দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি। তিনি যখন বৃদ্ধ এবং আমি প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত, তখন একবার তাঁর একখানি আশীর্ব্বাদ পত্র পেয়েছিলাম। এটা একটা সৌভাগ্যের কথা মনে করি।

আজ এখানে এসেছি তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা দিতে, তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে, আর তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে কল্যাণ ফুলে ফলে শোভা পেয়েছিল, তারই বীজ সংগ্রহ ক'রতে। স্মৃতির ভিতর দিয়ে বর্ষে বর্ষে নূতন বক্তা শ্রোতা ও সম্মিলিত নবীন প্রবীণ সকলের চিত্তভূমিতে এই বীজ উপ্ত হয়ে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করুক। আমাদের শ্রদ্ধা যেন কেবল বাগ্‌বহুলা ও নিষ্ফলা না হয়। চরিত্রে এবং কর্ম্মেই যেন আমরা তাঁর প্রতি এবং দেশের অপর সাধু পুরুষদের প্রতি সম্মান দেখাতে পারি।

দুই বৎসর হ'ল তাঁর জীবনের কথা ব'লতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয়' বলেছেন[৬]—"অশ্বিনীকুমার বাল্য হইতেই সত্য প্রেম ও পবিত্রতা এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন"। ইতিপূর্ব্বে যে বিশিষ্টতার কথা একটু উল্লেখ করেছি, সেই এই সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে। তিনি শিক্ষিত ও কুসংস্কার বর্জ্জিত হয়েও কতগুলি আচার

---

* গত ৭ই নবেম্বর রামমোহন লাইব্রেরী অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিসভায় বিবৃত।

মানতেন। কোন কোন জিনিষ খেতেন না, এবং সকলের বাড়ীতে খেতেন না ; এই জন্য আমার পিতৃদেব তাঁকে অনেক সময় ঠাট্টা করতেন। তিনি তখন ব'লতেন—"খেয়ে যে বাড়ী গিয়ে বল্‌তে হবে খাইনি, সেই জন্যই খাই না।" সত্যবাদিতা সম্বন্ধে আজকালকার নীতি যেন একটু শিথিল—কেউ কেউ ব'লবেন—উদার। মুখ দিয়ে একটা কথা বা'র হলেই যে সেটা অলঙ্ঘনীয়, সম্যক্ বিচার না করে যা কিছু বলে ফেলেছি তা রক্ষা করতেই হবে, একথা সকলে মানেন না। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে গেলেন, নিজের সত্য পালন করতে গিয়ে সীতাকে নির্ব্বাসন দিলেন ; পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই মায়ের কথাটা অব্যর্থ ও পালনীয় বলে এক পত্নী বিবাহ করলেন—এসব যেমন একদিকে অতিশয্য, তেমনি না ভেবে সহস্র কথা বলা, অঙ্গীকার ভাঙবো ব'লে অঙ্গীকার করা, কথা থাকবে না জেনেও সে কথা বলা, আর একদিকের আতিশয্য। সে যুগের বিচার এ যুগে না করলেও চলে, কিন্তু সকল যুগেই দেখ্‌তে হয় যে, সত্য কথা বলতে গিয়ে, সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা স্বীকার করতে গিয়ে, যাহা ন্যায়সঙ্গত বলে জানি তা কাজে করতে গিয়ে, নিজের লাভ ক্ষতিই হিসাব কচ্ছি, না সত্যের মর্য্যাদা রাখবার জন্য আর সব গণনা দূরে রাখ্‌ছি। এইখানেই সাধুতার ও মহত্ত্বের পরীক্ষা। ক্ষতি স্বীকার করে সত্য পালন ক'রতে যে পারবে সে-ই সত্যপরায়ণ।

তরুণদের কাছে তাই এই দ্বিতীয় কথাটা বলতে চাই, যে, এই দেশভক্ত ধার্ম্মিকের প্রতি যদি সত্য শ্রদ্ধা থাকে, তাঁর মত সত্যপরায়ণতা ও সত্যবাদিতা, চরিত্রের পবিত্রতা ও প্রেম যদি আয়ত্ত হয়, নিজেদেরও বড় করতে পারবে, দেশকেও বড় ক'রবে।

অনেকের বিশ্বাস রাজনীতির চর্চ্চা ক'রতে গেলে মিথ্যাবাদিতা প্রতারণা একটু না একটু আসবেই। মহাত্মাজী কিন্তু একথা বলেন না, অশ্বিনীবাবুও এমন কথা মনে স্থান দেন নাই। বর্ত্তমান কালের দেশ-সেবকেরা যদি সত্যবাদী না হ'ন, বিপক্ষকে নিগৃহীত ও পরাস্ত করবার জন্য যদি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরা জানবেন লোকে তাঁদের শ্রদ্ধা করবে না, দেশের শুভকামী হয়েও তাঁরা দেশের অমঙ্গল করবেন। তারপর চরিত্র। শুদ্ধচরিত্র না হলে তাঁরা দেশের প্রকৃত নেতা, উপযুক্ত চালকও হ'তে পারবেন না। যে নিজের কুপ্রবৃত্তির দাস তার মুখে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বার্ত্তা কেমন শোনাবে? আর প্রেমের কথা বেশী কি ব'লব? যার প্রেম নাই, সে কি ক'রে দেশের কাজ ক'রবে? তার দেশচর্য্যা ফাঁকি, কেবল স্বার্থ সাধনের একটা কৌশল। তাই তরুণদের, প্রৌঢ়দের, আমাদের সকলেরই ব্রাহ্মণের গায়ত্রী জপের মত প্রত্যহ জপের মন্ত্র হোক্ সত্য পবিত্রতা ও প্রেম, তবেই দেশের প্রকৃত সেবা হবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাই যেন হয়।

নব্যভারত, মাঘ ১৩৩২

বরপণ

বরপণ কি ?—এই বাংলা দেশে কোন বালিকার পিতা বা অভিভাবক যে মূল্য দিয়া উহার জন্য বর ক্রয় করেন তাহারই নাম বরপণ। হিন্দু ধর্ম্মানুসারে বিবাহ একটা ধর্ম্মাত্মক পবিত্র অনুষ্ঠান, একটী অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কার ; ইহা চুক্তির ব্যাপার নহে। বিবাহের বন্ধন অচ্ছেদ্য। পত্নী কেবল সহকর্ম্মিণী নহে, যে সহধর্ম্মিণী, পতির আধ্যাত্মিক জীবনের অংশভাগিনী। কিন্তু আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রই এই অংশীদারীর আরম্ভে টাকা কড়ি সংক্রান্ত একটা চুক্তি দেখা যায়। এ যেন একটা ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপার। এই ব্যাপারের মধ্যে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বাজারে দাসদাসী বিক্রয় হয় সেখানে মূল্যটী দিতে হয় দাস কিম্বা দাসীর জন্য ; কিন্তু বিবাহের বাজারে মূল্য দিয়া কিনিতে হয় মনিব। যে সকল লোকের অর্থ সম্পত্তি যথেষ্ট নাই কিন্তু কন্যা অনেকগুলি আছে, এই পণপ্রথা তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করে। কন্যাদের বিবাহ দিতে গিয়া তাহারা ঋণগ্রস্ত হয় এবং তাহাদের বাটী ভিটা সব উত্তমর্ণের কাছে বাঁধা পড়ে। যাহারা প্রথমাবধিই দরিদ্র, আপনার উপার্জ্জন দিয়া বরপণ জোগাইতে পারে না, মহাজনের কাছেও যাহাদের ঋণ পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের কন্যার বিবাহকালে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, অথবা কন্যাদের আজীবন অবিবাহিত রাখিতে হইবে ; তাহাও আবার সমাজের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা। দেখা গিয়াছে পিতা বা অভিভাবককে এই নিদারুণ লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোমলপ্রাণা, অভিমানকাতরা কোন কোন বালিকা আত্মহত্যাও করিয়াছে। তথাপি যে গর্হিত প্রথা পণদাতা ও পণগ্রহীতা উভয়কেই অধোগত করিতেছে, তাহা দূরীকৃত হইতেছে না। এদিকে আমরা স্বরাজের কথা বলি, আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইবার দাবী করি ; আমাদের এই ভারতবর্ষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনায় জগতের সকল দেশের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গর্ব্ব করি। একটা নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথার যে দাসত্ব করা হইতেছে আত্মসম্মান ভুলিয়া, স্বদেশীয়া নারীর প্রতি সম্মান ভুলিয়া যে লোভের দাসত্ব স্বীকার করা হইতেছে, সে জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বোধ নাই।

কেহ কেহ এই বলিয়া বরপণ সমর্থন করেন যে, এ দেশের আইনে পিতার মৃত্যুর পর কন্যা তাঁহার সম্পত্তির অল্পাংশেরও উত্তরাধিকারিণী হয় না। সুতরাং পিতা যখন জীবিত এবং কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত, ঠিক সেই সময় কন্যার জন্য কিছু সংস্থান করিয়া লইবার একমাত্র পথ এই বরপণ। তাঁহারা বলেন যে, বরকে যখন আজীবন বধূর অন্নবস্ত্র জোগাইতে হইবে, তখন সেই ব্যয়ের কিয়দংশ বধূর পিতার নিকট আদায় করিবার চেষ্টা কিছু দোষের নহে। বরপণের উদ্দেশ্য যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে অর্থের দাবীর পরিমাণ ও কন্যার পিতার দানের শক্তি-মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। দাবীটা অতিরিক্ত হওয়া উচিত নহে এবং প্রদত্ত অর্থ রক্তশোষক শ্বশুর বা লোভপরায়ণ স্বামীর হস্তে ন্যস্ত না হইয়া যাহাতে কন্যার জন্যই গচ্ছিত থাকে, সেই রূপ ব্যবস্থা করাই বিধেয়।

লোভ বা প্রয়োজন যাহা হইতেই এই কু-প্রথা উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকুক না কেন, এখন উহার উচ্ছেদ সাধনের সময় আসিয়াছে। এই সঙ্গে উত্তরাধিকার ঘটিত আইনেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। পুত্রের মত কন্যাও পিতামাতার সন্তান ও পুত্রের মতই

তাহাদের রক্তমাংসে গঠিত। পুত্রের লালন পালন, শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের জন্য জনক জননীর যে দায়িত্ব, কন্যার জন্যও ঠিক সেই দায়িত্ব, গৃহস্থের কর্ত্তব্যের তালিকায় শাস্ত্রে দেখা যায় :–

গৃহস্থ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামত্যাসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধুন্ এষো ধর্ম্ম সনাতনঃ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা॥

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে পালন করিবেন ; পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন ; স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেন। কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেন, অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেন এবং ধনরত্ন সহিত বিদ্বান পাত্রে সম্প্রদান করিবেন।

ধনরত্ন দিবার কথা অবশ্যই এখানে আছে কিন্তু তাহার পরিমাণের তো নির্দ্দেশ নাই। যতদূর বুঝা যায়, পিতার অবস্থার অতীত দান হইবে, শাস্ত্রে এমন কথা বলে না। পিতার দান বা বিবাহদত্ত যৌতুক (dowry) তাঁহার স্নেহের স্বাভাবিক প্রেরণায় স্বেচ্ছাকৃত, অপরের ইচ্ছাধীন নহে।

এই বরপণ প্রথার সহিত বাল্যবিবাহ ও একান্নবর্ত্তিতা এই দুইটি প্রথাও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। একান্নবর্ত্তিতার দোষগুণ যাহাই থাকুক, উহা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতেছে। বাল্যবিবাহের কুফলেরও ক্রমশঃ উপলব্ধি হইতেছে, এবং দেশে একটা সুস্থ সবল জাতির অভ্যুত্থান কল্পে নারীশিক্ষার আবশ্যকতাও স্বীকৃত হইতেছে। যে বয়সে পত্নী ও মাতার কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, সেই বয়স পর্য্যন্ত যদি বালিকারা শিক্ষাধীন থাকে, তাহা হইলে তাহারা অর্থ দ্বারা ক্রীত স্বামীকে বরণ করিতে অপমান বোধ করিবে। ইদানীং ম্যাট্রিকুলেশন পাশকে যত, ইন্টারমিডিয়েট পাশকে তদপেক্ষা অধিক, বি, এ-পাশকে আরও অনেক বেশী, এক দুই তিন করিয়া পরীক্ষার সংখ্যার সহিত বরপণও সেই অনুপাতে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা তাহাদের অসহ্য হইবে। ভাষাহীন অচেতন পদার্থের মত হস্ত হইতে হস্তান্তরে অর্পিত হইতে তাহাদের লজ্জা বোধ হইবে, আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে। কিন্তু নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করিতে তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবে না। অবস্থা যাহাদের স্বচ্ছল নহে, আজকালকার জীবন সংগ্রামের কঠোরতার দিনে সেই সকল পরিবারের কয়জন নারী না খাটিয়া পারে? পিতার বা পতির গৃহে কি তাহারা খাটে না? শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে কন্যারূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়াই অনেকে দরিদ্র পিতার সাহায্য করেন, ভগিনীগণ ভাইদের শিক্ষার ব্যয় বহন করেন। যদি আত্মসম্মান ও স্বাবলম্বন শিক্ষার ফল হয়, তবে আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা নিশ্চয়ই অর্থের লোভে পড়িয়া বা উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে কখনই বিবাহ করিবে না। দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা যতদূর জানি তাহাতে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এদেশে শত শত উন্নতমনা যুবক আছেন, যাঁহারা অর্থের জন্য বিবাহ করা ঘৃণাকর কার্য্য বলিয়া অনুভব করেন ; যাঁহারা সমাজ হইতে এই দূষিত রীতির উচ্ছেদ সাধনে উৎসুক। তাঁহাদের অনুরোধ করি, তাঁহারা একান্ত মনে

এই শোধনকার্য্যে ব্রতী হউন। আমরা ভারতবাসীরা বিশেষ বাংলা দেশের লোকেরা অতিশয় ভাবপ্রবণ। আমরা মনে যাহা অনুভব করি, মুখে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে ভালবাসি ; কিন্তু এতটা ভাবের স্থিরতা ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা নাই যাহাতে কর্ম্মের সাফল্য হয়। কেবল বক্তৃতায়, কেবল কোন স্নেহলতার শোচনীয় মৃত্যুতে[৭] গোটা কতক কবিতা লেখায় বা দুই চারি ফোঁটা অশ্রু ফেলায় অথবা এই সবগুলির সমবায়েও কোনও ফল নাই। সভা করিয়া বরপণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগ্রহণেও কোন লাভ নাই, কার্য্যতঃ বরপণ গ্রহণ যদি না অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারি। প্রতিজ্ঞা করিবে, বরপণ লইবে না ; বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বরপণ লইতে দেওয়া হইবে না। যাহারা কথা না শুনিবে তাহাদের একঘরে করিতে হইবে। এ দেশে অতি সামান্য কারণে প্রতিবেশী বা কুটুম্বকে লোকে একঘরে করিয়া থাকে। কাহারও সামাজিক আচারাদি বা আদব কায়দায় একটু ত্রুটি হইলে অমনি সে একঘরে ; বাড়ীর অন্য কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সে নিজে নির্দ্দোষ, তবু কর ওকে একঘরে। এইরকম তো কতই হয়। পণপ্রথা উঠাইবার জন্য যাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ, আশা করি তাঁহারা পণগ্রাহী বরদিগকে এবং যাহারা তাহাদের পণ লইতে প্রলুব্ধ ও প্রবৃত্ত করায় তাহাদিগকে সমাজচ্যুত, একঘরের মত ব্যবহার করিবেন। ইহার ফলে এই দূষিত প্রথা অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। উত্তরাধিকার বিষয়ে নূতন আইন প্রবর্ত্তন, বাল্যবিবাহ দূরীকরণ ও কন্যাশিক্ষার প্রচলন, এই বরপণ প্রথার উচ্ছেদে প্রধান সহায়।

বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৩৩

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির

শেঠ মহাশয়[৮], সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ ওই পারিতোষিক-বিতরণ উৎসবে আপনারা যে আমাকে সভানেত্রী পদে বরণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিজকে সম্মানিত বোধ করিতেছি। আজ এখানে উপস্থিত হইয়া এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাইয়া এবং বালিকাদের আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদি শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। আমার বাল্যকালে বালিকাশিক্ষার ব্যবস্থা অল্পই ছিল, শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই হয়। এখন চারিদিকে যাহা দেখিতেছি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। সভা বসিবার পূর্ব্বে এখানকার ছাত্রীনিবাস পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ হইল। আজ কলিকাতার বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলাম, ঠিক তাহা দেখিব কল্পনা করিয়া আসি নাই। আজ তাই আমার আনন্দ ও শুভকামনা জ্ঞাপন করিয়াই সভাভঙ্গ করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু 'প্রোগ্রামে' সভানেত্রীর অভিভাষণরূপ একটি কর্ত্তব্যের উল্লেখ আছে। এই অভিভাষণ রীতিটি রক্ষা করিতে গিয়া বালিকাদের তরুণকণ্ঠের মিষ্ট সঙ্গীতের পর আমার বার্দ্ধক্যনীরস কণ্ঠে আরও দুই একটি কথা বলিতে হইল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি এখানে আসিবার জন্য প্রথম অনুরুদ্ধ হই। সেই সময়ে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম আমার কাছে একটু বিশিষ্টতাসূচক মনে হইয়াছিল, সত্যই 'নারী-শিক্ষা-মন্দির' নামটির মধ্যে চিন্তা উদ্রেক করিবার জিনিষ আছে। শিক্ষা কি? বিদ্যা বলিলে চলিত না? নারী-শিক্ষা-মন্দির কি কেবল নারীজাতীয় শিক্ষার্থীর জন্য বলিয়া, অথবা যে শিক্ষা কেবল নারীরই প্রয়োজনীয়, পুরুষের নহে, সেই শিক্ষা এখানে দেওয়া হয় বলিয়া? সাধারণ শিক্ষা হইতে নারীশিক্ষার পার্থক্য কি?

শিক্ষা বলিলেই কোন কর্ম্মের জন্য নিপুণভাবে প্রস্তুত হওয়া, একটা প্রয়োজন সিদ্ধির আয়োজন, একটা লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সাধন বুঝায়। মন্দির শব্দটির প্রাথমিক অর্থ সাধারণ গৃহ হইলেও আমরা সর্ব্বদাই উহার সহিত দেবপূজার কথা স্মরণ করি। ভক্তি নিষ্ঠা ও পূতাচারের সহিত ইহার association বা স্মৃতিগত যোগ রহিয়াছে। যেখানে কেনা-বেচা সেখানে নিষ্ঠাভক্তি দাঁড়ায় না। যেখানে শিক্ষাদান আর দশটা ব্যবসার মত একটা ব্যবসা মাত্র, অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জনের একটা উপায়স্বরূপ, সেখানে বিদ্যালয়কে মন্দির বলা সঙ্গত হয় না। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির নামের পূর্ব্বভাগে একটি বঙ্গ-মহিলার নাম সংযুক্ত আছে। মাতৃভক্ত পুত্র মাতার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার এই মাতৃপূজার ভিতর দিয়া নারী-সাধারণকে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদিগকে ভবিষ্যতে যোগ্যা জননী করিয়া তুলিবেন, ইহাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য।

প্রকৃত শিক্ষা কেবল লিখিতে ও পড়িতে সমর্থ হওয়া নহে, কেবল স্মরণশক্তির চর্চ্চা নহে, কেবল বিষয়-বিশেষের জ্ঞানলাভও নহে। প্রকৃত শিক্ষা (culture) গঠনমূলক, উহার প্রভাব অতিশয় ব্যাপক। মননশক্তিসম্পন্ন জীবরূপে মানুষের স্বাভাবিক শক্তিসমূহের অনুশীলন, যথাযথ পরিচালন ও উৎকর্ষসাধন—এক কথায় চিত্ত ও চরিত্রগঠনই শিক্ষা। আশা করি এই শিক্ষা-মন্দিরে এই সত্যটি স্বীকৃত ও অনুশীলিত হইতেছে।

এই দুর্ভাগ্য দেশে নারী বহুকাল নানারূপে নিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। দেশাচার তাহাকে অবরোধে বদ্ধ রাখিয়া, অকালে পত্নীত্ব ও মাতৃত্বে দীক্ষিত করিয়া তাহার জ্ঞানচর্চ্চার পথে ঘোর প্রতিবন্ধক স্থাপন করিয়াছে। দেহের ও মনের সর্ব্বথা পরিপুষ্টি সাধন তাহার ঘটে নাই, জীবনের অনেক আনন্দ হইতে সে বহুকাল বঞ্চিত। ইহাতে দেশেরই ক্ষতি হইয়াছে। অন্যের জন্মগত অধিকার হইতে যে তাহাকে বঞ্চিত করে, সে নিজেই বঞ্চিত হয়। অজ্ঞ পত্নীর স্বামী, অজ্ঞ জননীর সন্তান নারীর অজ্ঞতার ফলে হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সকল নারী যে নিজে পঙ্গু হইয়াও পঙ্গু সন্তানের জননী হয় নাই, আজিও যে বহু সুপত্নী ও সুমাতা আছেন, ইহা দেবতার বিশেষ কৃপা। প্রকৃতি সহজে পরাজয় স্বীকার করে না। নদীপ্রবাহ বাধা পাইলে হয় সেই বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া বর্দ্ধিত বেগে চলে, নতুবা বাঁকিয়া অন্য পথ খুঁজিয়া লয় ; প্রস্তরের আবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া বৃক্ষের অঙ্কুর একটু হেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় ; ছায়াজাত লতাটি আলোকের দিকে মুখ বাড়াইয়া চলে। অনেক প্রতিকূলতা জয় করিয়া বহু নারী কালে কালে আপনার জ্ঞানস্পৃহা ও ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে সুশিক্ষার উপায় বিধান করিয়া যাঁহারা নারীদের উন্নত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন তাঁহারা দেশের নারীসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র, এবং এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাদের অন্যতম।

নারীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত এ বিষয়ে প্রশ্ন ও আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, এখনও হইতেছে। এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন কেন উঠে না—পুরুষের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত? নারী যেমন কন্যা ও ভগিনী ও ভবিষ্যতে পত্নী ও জননী, সেইরূপ পুরুষও পুত্র ও ভ্রাতা এবং ভবিষ্যতে পতি ও পিতা হইবেন। শিক্ষার প্রথম সোপান বা প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষার শেষ লক্ষ্য—মনুষ্যত্বের বিকাশ, উভয়েরই এক। মধ্য সোপানগুলি পথের ভিন্নতা অনুসারে কিছু ভিন্ন হইবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থানও এখানে আজ নহে। কেবল এইটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, যে, পত্নী, গৃহিণী ও মাতারূপে মাতাকে যেমন নিবিড় ও ঘনিষ্ঠরূপে গৃহের সহিত সংসৃষ্ট থাকিতে হয়, পুরুষকে সচরাচর সেরূপ হয় না। সন্তানের সঙ্গে মাতার যে সম্বন্ধ তাহা আর কোন সম্বন্ধের সঙ্গেই তুলনীয় নয়। এইজন্য ভবিষ্যৎ পত্নী ও মাতার শিক্ষা কেবল নীতি ও গৃহকর্ম্মের দিক দিয়াই নহে ; গৃহের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও আনন্দবর্দ্ধনের দিক দিয়াও পুরুষের শিক্ষা হইতে কিছু ভিন্নতর হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্য জগতে এই পার্থক্য ক্রমশঃ দূর হইতেছে দেখিয়া আমাদের অনেক সময়ে আশঙ্কা হয়। কিন্তু সেখানেও সাধারণের শিক্ষা ও ব্যবহার যুক্তিযুক্ত পথেই চলিয়াছে। শিক্ষার গুণে নারী সেখানে বিজ্ঞানচর্চ্চায়, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে, সামাজিক দুর্গতি ও দুর্নীতি নিবারণে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। এদেশেও কালে তাহা হইবে। শিক্ষার লক্ষ্য মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন—জ্ঞানের দ্বারা, সুরুচির দ্বারা, আত্ম-সংযম ও পুণ্যাচরণের দ্বারা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা ও পূজা। তাই পুরুষ ও নারীর শিক্ষার চরম লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

কল্যাণীয়া বালিকারা সম্মুখে এই আদর্শ রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হও। জীবন ঋণে ভরা। সেই ঋণ জীবন ভরিয়া শোধ কর। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ স্নেহ, চিন্তা ও পরিশ্রমের

সঙ্গে যে শিক্ষা দিতেছেন, সেই শিক্ষার ভিতর দিয়া যতটা জ্ঞান আনন্দ ও কল্যাণ লাভ করিতেছ ততটা ত দিবেই, তাহার সুদ এবং সুদের সুদ দিয়া যাইবে। একগুণ সৌভাগ্য লাভ করিয়া, আশেপাশে ও দূরে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দশগুণ সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাও। একটি বীজ তরুরূপে বিকাশ পাইয়া শতসহস্র বীজ রাখিয়া যায় তাহা দেখিতেছ। তোমরাও তাহাই করিবে। পাঠের দ্বারা এখন ঋষিঋণ অর্থাৎ শিক্ষকঋণ শোধ কর। তোমাদের গৃহ ও পরিবার সদাচারে পবিত্র কর, গীতবাদ্য ও অন্যান্য ললিতকলায় আনন্দময় ও সৌন্দর্য্যময় করিয়া তোল। স্বাস্থ্যের নিয়ম শিক্ষা করিয়া নিজের ও প্রতিবেশীর গৃহ নীরোগ রাখ। সৎকার্য্যে দান করিতে শিখিয়া সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও কার্পণ্য হইতে হৃদয় মুক্ত রাখ। যেখানে তোমরা গিয়া দাঁড়াইবে লোকে যেন বলিতে পারে—এরা শিক্ষিত কি না, তাই এমন সুন্দর ব্যবহার, সাজসজ্জায় এমন স্বাধীনতা, চরিত্রে এমন বিনয় ও মাধুর্য্য, এমন সহানুভূতি, এমন সেবাপরায়ণতা। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম, প্রেমের সঙ্গে কর্ম্ম, কর্ম্মের সঙ্গে উদারতা ও নিরহঙ্কারতা আসুক। এই কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের নাম ও প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। আমি সেই প্রার্থনাই করি।*

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭

---

* ২রা মার্চ্চ চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরে চতুর্থ বাৎসরিক উৎসব-সভায় সভানেত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের অভিভাষণ।

স্বর্গীয়া বামাসুন্দরী দেবী[৮]

সূচনা

বাঙ্গালা সাহিত্যের উপন্যাস, নাটক, কাব্য প্রভৃতি বিভাগে আধুনিক যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু জীবনচরিত বিভাগে তাদৃশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। আজিকালি দুই-চারিজন কর্ম্মবীরের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। বিশেষতঃ এদেশের পুণ্যচরিতা নারীগণের জীবন-কথা প্রকাশিত হইতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে স্বামী বা পুত্র সমাজে বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত সেবাপরায়ণতার কাহিনী লোকসমাজে অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের জীবন-কথার উপাদান দূরের কথা, তাঁহাদের একখানি প্রতিকৃতি পাওয়াও অনেকস্থলে অসম্ভব হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও সাহিত্যসেবকগণের জননীর ও সহধর্ম্মিণীর প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অধুনাবিলুপ্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক মাসিকপত্রে কতকগুলি চিত্র প্রকাশিত হয়।

"নন্দকুমারের ফাঁসী", "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ", "অযোধ্যার বেগম" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া[৯] একদিন যিনি দেশে যুগান্তর আনিয়াছিলেন, সাহিত্যের সেই অকৃত্রিম অনুরাগী সেবক চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বাধ্বী বামাসুন্দরী দেবীর একখানি প্রতিকৃতি সংগ্রহের মানসে যখন তাঁহার কন্যা 'আলো ও ছায়া'র[১০] বঙ্গবিশ্রুত কবি মাননীয়া শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি, তখন কথোপকথন প্রসঙ্গে অবগত হই যে তিনি আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে তাঁহার জননীর শ্রাদ্ধবাসরে পড়িবার জন্য তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় নাই। তাহার কারণ এই, মাতৃবিয়োগের পরে সপ্তাহমধ্যে যখন উহা রচিত হয় তখন রচয়িত্রীর মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না,—তিনি তখন কেবল মাতৃবিয়োগে কাতর ছিলেন না, তাঁহার প্রাণাধিকা এক দুহিতা তখন সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্তা। সুতরাং তাঁহার মানসিক উদ্বেগের সীমা ছিল না। আচার্য্য শিবনাথের আদেশ কোনও মতে পালন করিবার জন্যই তিনি যথাসম্ভব দ্রুতভাবে এই রচনাটি শেষ করিয়াছিলেন। আমি প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া 'বিচিত্রা'য় উহা প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করি, কারণ উহাতে গতযুগের সমাজের রীতি-নীতির ও নারীজীবনের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়—যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না। আমার মনে হয়, দ্রুত রচনারও একটি গুণ আছে ; বোধ হয় উহাতে ভাব ও ভাষার কৃত্রিমতা আসিতে পারে না, লেখকের আন্তরিকতা যেন বেশী ফুটিয়া উঠে। আমার এই ধারণা কতদূর সত্য পাঠকগণ শ্রদ্ধেয়া লেখিকার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া স্বয়ং তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

আমি মনে করিতেছিলাম মাতৃদেবীর জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য নাই, অতি সংক্ষেপে তাঁহার আড়ম্বরহীন নীরব জীবনেব কথা বিবৃত করিব। শ্রাদ্ধবাসরে স্বর্গগত আত্মার গুণ স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হয়, সে শ্রদ্ধা নীরবেও অর্পণ করা যায়। কিন্তু ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন, যেন আমার মাতৃদেবীর জীবনের কথা একটু

বিস্তারিত করিয়া লেখা হয়। বুঝিলাম এই জীবনখানা তাঁহার নিকট একটু বিচিত্র বোধ হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। পুরাতন হইতে নূতনে, কুসংস্কারের অন্ধকার হইতে নূতন জ্ঞানালোকে যাহাদিকে পথ খুঁজিয়া উঠিয়া পড়িয়া ব্যথা সহিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহাদের জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলির মধ্যেও একটু বিচিত্রতা থাকে। সময়াভাবে রোগশোকের মধ্যে সব কথা বলা হইবে না ; তবু শৈশব হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা স্মরণ হইল লিখিয়া জানাইলাম।

রবিবার—পূর্ব্বাহ্ন
২২শে আগষ্ট, ১৯১৫

বঙ্গাব্দ ১২৫৪ সনের চৈত্রমাসে, বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে মাতৃদেবীর জন্ম হয়। আমাদের মাতামহ স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন মুশ্রীব মহাশয় গ্রামের একজন মাতব্বর লোক ছিলেন। ধনী-দরিদ্র সকলে বিপদে-আপদে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিত। তিনি অতি স্নেহশীল ও সৌখীনপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পত্নী শিবসুন্দরী দেবী অতিমাত্রায় আচারপরায়ণা এবং মৃতবৎসা ছিলেন। কয়েকটি সন্তান হারাইবার পর আমার মাতা বামাসুন্দরীর এবং পরে শ্যামা ও উমার জন্ম হয়। সে জন্য এই কন্যারা পিতামাতার অতিশয় যত্ন ও আদরে লালিত হইয়াছিলেন। (বাসণ্ডা গ্রামেই শৈশবে কন্যার অনাদরের কারণসূচক একটি ছড়া আমি শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলাম ; সেটি এই—মেয়ের নাম 'ফেলি'; পরে নিলেও গেলি যমে নিলেও গেলি।) বিশেষ, জ্যেষ্ঠা বামা। ইনি অতি সুদর্শনা ছিলেন; সেই জন্য অনেকেই ইঁহাকে পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। আমার পিতামহদেব তাঁহার অশান্ত দুর্নমিত পুত্রটির জন্য এই কন্যাটি পাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেকালে সে গ্রামে অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দিবার রীতি বোধ হয় ছিল না, কিন্তু কন্যাবিক্রয়ের প্রথা একটু ছিল। আবার অষ্টমবর্ষে কন্যাদান করিয়া পৃথিবীদানের পুণ্যফল লাভ হয়, নবমবর্ষে গৌরীদান হয়, এ সংস্কারও ছিল। অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে মাতামহদেব কন্যাদান করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। আধুনিক হিসাবে আমার মাতার যখন সাত এবং পিতার দশ বৎসর বয়স, তখন তাঁহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

বালক স্বামী বালিকা বধূকে জননীর স্নেহভাগিনী মনে করিয়া যথেষ্ট ঈর্ষা করিতেন এবং সুযোগ পাইলে প্রহার করিতেও ছাড়িতেন না। পিত্রালয় শ্বশুরালয় একগ্রামে হইলেও শ্বশুরালয়েই বালিকার অধিকাংশ কাল কাটিয়াছে। কেবল পূজা-পর্ব্বাদি উপলক্ষে মাঝে মাঝে পিতৃগৃহে গিয়া থাকিতে পাইতেন। শাশুড়ী তাঁহাকে সন্তাননির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। কিন্তু এই স্নেহলাভ বেশীদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার সার্দ্ধ দশবৎসর বয়সে আমাদের পিতামহী দেবী সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিলেন। সাড়ে-দশ বৎসরের বালিকার পক্ষে এক গৃহের গৃহিণী হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া পিতামহদেব তাঁহার খুড়তাত ভ্রাতার সহিত একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিতে লাগিলেন। উঁহার পরিবারে উঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যা ব্যতীত আরও এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি উঁহার অগ্রজের

বিধবা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলে পিতামহদেব তাঁহার পূর্ব্বোক্ত খুড়তাত ভাই ও তাঁহার অগ্রজকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই ইঁহাদের অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও ইঁহার পুত্রকন্যাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। স্বাধীনচিত্তা, সত্যবাদিনী ও তেজস্বিনী পিতামহীদেবী নানাকারণে ইঁহাদিগের সহিত একত্র থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না ; মৃত্যুকালেও ইঙ্গিতে স্বামীকে ও পুত্রবধূকে তাহা জানাইয়া গিয়াছিলেন। পিতামহদেব যদি পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পৃথক সংসারে থাকিতেন তাহা হইলে উত্তরকালে আমাদের জননীকে যে দুঃখদারিদ্র্য ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা হইতে তিনি রক্ষা পাইতেন।

বালিকা বধূ গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ছিলেন। একবার শাশুড়ী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া আসন পাতিয়া তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। শাশুড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া প্রতিবেশী সকলকে ডাকিয়া বধূর গুণপণা দেখাইতে লাগিলেন।

সাধারণ ঘরকন্না ছাড়া সেকালের যাহা শিল্পবিদ্যা তাহাও বালিকা বধূ শিখিয়াছিলেন। যেমন আলপনা দেওয়া, বিবাহের পীঁড়ি চিত্র-করা, শিকা তৈয়ার করা, ঝাঁপি বোনা, মাটির উনান সরা হাঁড়ী তৈয়ার করা, ক্ষীরের ও আমস্বত্বের ছাঁচ খোদাই করা, পিঠা পরমান্নাদি রন্ধন করা।

শৈশবে বা বাল্যে কেহ তাঁহাকে লিখিতে-পড়িতে শিখায় নাই। সাধারণ গৃহস্থদের পরিবারে স্ত্রীলোকের লিখন-পঠন শিক্ষা নিষিদ্ধই ছিল। কৈশোরে অথবা আরও পরে মাতৃদেবী নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় একটু লিখিতে-পড়িতে আরম্ভ করেন। বাড়ীর প্রাচীনাদের ভয়ে ইহা তাঁহাকে লুকাইয়া করিতে হইয়াছিল। রন্ধনগৃহের যে স্থানটি হেঁসেল বা হাঁড়ীশাল বলিয়া পরিচিত তাহা কাঁচা মাটির দেয়ালে ঘেরা ছিল। তাহারি গায়ে কাষ্ঠশলাকা দিয়া তিনি অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেন, ও প্রত্যহ রন্ধন-শেষে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিতেন। তখন গ্রামের লোকদের ধারণা ছিল যে স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শিখাইলে দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত হইবে ; স্ত্রীলোকেরা সকলের সহিত গোপনে পত্রালাপ করিবে। ঐ জন্যই মধ্যবিত্ত পরিবারে লেখাপড়ার চর্চ্চা কেহ প্রশ্রয় দিত না। ধনাঢ্য পরিবারে কন্যার আত্মীয়গণের নিকট কেহ কেহ বা সহোদরদিগের সহিত গুরুমশায়ের নিকট লেখা অভ্যাস করিতেন।

আমার জন্মের কিছুদিন পূর্ব্বে পিতামহাশয় আমার মাতাঠাকুরাণীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য, মাতৃত্বের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উপদেশ ছিল। পত্রখানি ডাকঘর হইতে আমাদের বাড়ীতে না আসিয়া গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে গেল ; সে বাড়ীর লোকেরা উহা খুলিয়া পড়িয়া আমার পিতামহদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র বধূকে পত্র লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মান হইলেন এবং পত্রখানি লইয়া তাঁহার বৈবাহিক, আমার মাতামহদেবের নিকট গেলেন। তিনিও জামাতার এই নির্লজ্জতার পরিচয় পাইয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন। চিঠিখানা পাইয়া বাড়ীতে একটা হুলুস্থূল ব্যাপার। যাঁহার নিকট আসিয়াছিল তাঁহাকে সেখানি দিবার আবশ্যকতা কেহ

দেখিলেন না। বহুদিন পরে তিনি গোপনে চিঠিখানি খুঁজিয়া লইয়া পড়িয়া আবার পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের শৈশবে মাতৃদেবীর নিকটেই প্রত্যেকের অক্ষরপরিচয় হইয়াছে। ছেলেবেলা তাঁহাকে ও অন্য দুই-একটি আত্মীয়াকে বাঙ্গলা রামায়ণ মহাভারত ও কালীবিষয়ক একখানি বই পড়িতে শুনিতাম।

মাতৃদেবীর শ্রমশীলতা, সেবাপরায়ণতা, সদ্বিবেচনা ও অল্পভাষিতা তাঁহাকে গ্রামে ও শ্বশুরালয়ে অনেকেরই প্রিয় করিয়াছিল, কিন্তু অপরের প্রশংসা পাইয়াছিলেন বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক তাঁহার খুড়-শাশুড়ী তাঁহার প্রতি ক্রমেই বিমুখ হইতে লাগিলেন। সার্দ্ধ ষোড়শবর্ষ বয়সে তাঁহার প্রথম-সন্তানের জন্মের পর এই বিমুখতা অত্যাচারে পরিণত হইল। তিনি দাসীর ন্যায় সকলের পরিচর্য্যায় রত থাকিতেন, কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। দিবাভাগে সন্তানকে ক্রোড়ে করিবার অবসরও তাঁহার সকল দিন ঘটিত না। সন্তানের সৌভাগ্যবশতঃ পিতামহ যখন গৃহে থাকিতেন শিশু তাঁহার বুকে স্থান পাইত। শুনিয়াছি একদিন শীতকালে সকালবেলা মাতামহ আসিয়া দেখিলেন আমাকে ঠাণ্ডা মাটিতে বসাইয়া রাখিয়া মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেছেন ; দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া আমাকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। অতঃপর বহুদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রভাতে আসিয়া তিনি আমাকে লইয়া যাইতেন, সন্ধ্যাবেলা ঘুম পাড়াইয়া ফিরাইয়া আনিতেন। মাতা সারাদিন সন্তানকে দুগ্ধপান করাইতে পারেন নাই বলিয়া রাত্রে শয্যায় গিয়া অশ্রুপাত করিতেন।

পিতামহদেবের স্বাস্থ্য যত ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল আমার মাতার প্রতি কর্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহারের মাত্রা তত বাড়িয়া চলিল।

জীবনের প্রথম প্রায় সাত বৎসর আমি গ্রামের বাটীতে বাস করিয়াছি। তখন মাতার কাজকর্ম্ম যাহা দেখিয়াছি এখনও মনে আছে। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি ঘরগুলি ঝাঁট দিতেন, তারপর গোবর ও মাটি গুলিয়া ঘর নিকাইতেন, ইহার পর রাত্রের ব্যবহৃত স্তূপীকৃত কাঁসার ও পাথরের থালা-বাটী সব বহিয়া লইয়া অন্দরের পুকুরের ঘাটে মাজিতে বসিতেন। বাসন মাজা শেষ হইলে স্নান ও পূজা সারিয়া রাঁধিতে যাইতেন। যখন শাশুড়ীরা সদয় থাকিতেন দুইমুঠা পান্তাভাত খাইতেন। পিতামহদেবের পীড়ার সময় কখন দেখিয়াছি দুইটি ভিজা চাউল মুখে দিয়া খাইতেন।

আমার বয়স যখন ৪ কি ৫ বৎসর তখন মাতামহদেবের হঠাৎ মৃত্যু হয়। ইহার কিছুকাল পরেই পিতামহদেব পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। শ্বশুর পীড়িত, স্বামী বিদেশে, বধূর তখন বড়ই দুরবস্থা। শ্বশুরের সেবায় অনেক সময় ব্যয় হইত, তথাপি গৃহের অন্যান্য কর্ম্ম হইতে তাঁহার ছুটি ছিল না। সারাদিন খাটিয়াও কটুভাষিণী গৃহকর্ত্রী বিধবা খুড়-শাশুড়ীর নিকট অনেক গঞ্জনা সহিতে হইত। সেই হৃদয়হীনা কখন কখন বলিতেন, "যা, বুড়াকে লইয়া আলাদা হইয়া যা।"—"আমার শ্বশুরেরও এই বাড়ীতে তালুকদারীতে সমান ভাগ আছে, এ বাড়ী আপনারও যেমন আমারও তেমন"—এইরকম দুই-চার কথা বলিয়া বধূ বেশ ঝগড়া বাধাইতে পারিতেন। জ্ঞাতি প্রতিবেশিনীরা সেইরূপ

কথা শিখাইয়া দিতেন কিন্তু বধূ মুখ খুলিতেন না, খুড়শাশুড়ী ঝগড়া জমাইতে না পারিয়া নীরব হইতেন।

প্রতিদিন শ্বশুরের ময়লা বিছানা কাচিয়া ধুইয়া, বাড়ীর সকলের জন্য রন্ধন করিয়া দিয়া তিনি তাঁহার শ্বশুরমহাশয়কে খাওয়াইতে যাইতেন। প্রত্যেকটি ভাতের গ্রাস তাঁহার মুখে তুলিয়া দিতে হইত। তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাকে পাশ ফিরাইতে হইলে সম্পর্কিত দেবর ভাগিনেয় প্রভৃতিকে ডাকিয়া আনিতে হইত। তাঁহার নিজের দিবসের আহার বেলা ২টা ৩টার পূর্ব্বে কোন দিন হইত না। রাত্রেও আমার জন্য তত্ত্বাবধান তাঁহাকেই করিতে হইত।

এইরূপে দেড়বৎসর অনিয়মিত পরিশ্রম, অল্পাহার, অনিদ্রায় মাতৃদেবীর স্বাস্থ্য চিরকালের মত নষ্ট হইল। তিনি সেই সময় হইতে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ায় দারুণ কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন।

আমার তিন পিসীমা ছিলেন। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার বাসণ্ডা গ্রামেই বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠার শ্বশুরালয় গ্রামান্তরে হইলেও বেশী দূর ছিল না। ইঁহাদের দ্বারা পিতামহদেবের কোন সেবা হয় নাই। উত্তরকালে আমার পিতৃদেব আমাকে বলিয়াছেন—"তোমার মাতা আমার রুগ্ন পিতার সেবা করিয়া আমাকে নরকভোগ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

ইতিপূর্ব্বে পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয়াগণের বিরাগভাজন ও ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেন, বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র বিধর্ম্মী, শ্রাদ্ধ করিবে কে? পিতামহদেব স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় বলিতেন, "শ্রাদ্ধ করিবেন আমার বউমা।" সকলেই জানিত তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত!

পিতামহদেবের ব্যাধি দুরারোগ্য এবং মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া পিতামহাশয় ১৮৭১ সনের পূজার ছুটিতে বাটী আসিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে নিকটে উপস্থিত থাকিলে পাছে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে হয় এই ভয়ে শীঘ্রই বরিশাল ফিরিয়া গেলেন। ১৮৭২ সনের ১৫ই জানুয়ারী পিতামহদেবের মৃত্যু হয়। মাঘমাসের দারুণ শীতে নদীতে স্নান করিয়া আর্দ্রকেশে আর্দ্রবস্ত্রে কম্পিতদেহেই আশু-সন্তানবতী আমাদের মাতা তাঁহার মুখাগ্নি করিলেন। তৎপরে একমাস কাল একবেলা হবিষ্যান্ন খাইয়া তিনিই পুত্রস্থানীয় হইয়া শ্বশুরের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলেন। পিতৃদেব বরিশালে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে পরলোকগত পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

পিতামহদেবের মৃত্যুর পর ক্রমাগত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও পরামর্শ চলিতে লাগিল। সহস্রবার মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করা হইত, "তুমি এখন কি করিবে? তোমার স্বামীর তো জাতি গিয়াছে, তুমি কোথায় থাকিবে—কোথায় যাইবে? তুমিও কি জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবে? তোমার স্বামীর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে ; তুমি তাহার কাছে যাইও না, সে হয়তো তোমাকে কিছুদিন পরে বেচিয়া ফেলিবে। বরং এখানে থাক, সে তোমার জন্য ফিরিয়া আসিতে পারে।" সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "তুমি দেশের বাড়ীতে থাক।"

সকলেই আশা করিয়াছিলেন, এবার তাঁহার একটি পুত্র হইবে। যখন সে আশা চূর্ণ

করিয়া বাঙ্গলা ১২৭৮ সনের ৬ই আষাঢ় যামিনী* ভূমিষ্ঠ হইলেন সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। মেজো পিসীমা অনেক আশা করিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; কন্যা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অবিলম্বে স্নান করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। কন্যার জন্ম সেকালে এতই দুঃখের ব্যাপার ছিল।

সেইদিন হইতে মাতাঠাকুরাণীর জীবন সকলে অসহনীয় করিয়া তুলেন। ছোট ঠাকুরদাদা মহাশয় বলিলেন, "বউমা যদি বলেন তাঁকে পৃথক আটচালা তুলে দিব, আমার কনিষ্ঠপুত্রকে তাঁর পোষ্যপুত্ররূপে দান করব, তিনি পুত্রকন্যা নিয়ে সকল অভাব ভুলে থাকুন।" পিসিমারা বলিলেন—"তোমার মেয়েটিকে বিবাহ দিয়া ঘর-জামাই রাখ।" এবার মাতাঠাকুরাণী উত্তর দিলেন, বলিলেন,—"ঘর-জামাই না ঘর-জ্বালা! আমি ঘর জ্বালাইব না।" আজ সেই সময়ের কথা চিন্তা করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে কিরূপে কৃতজ্ঞতা জানাইব জানি না। আমার শিক্ষাদীক্ষা সুখসৌভাগ্য যাহা কিছু পাইয়াছি, যাহা কিছু আমার মনুষ্যত্ব, যাহা কিছু এই ক্ষুদ্র জীবনের সফলতা, সে সমুদয়ের মূলে আমার মাতৃদেবী—তাঁহার সেইদিনের দৃঢ়তা। পিসীমারা আমার সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন, সেইদিন মাতার একটু হাঁ-কি-না'র উপর সাড়ে ছয় বৎসরের বালিকার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল।

মাঘমাসে পিতামহদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। পরবর্ত্তী আষাঢ় মাসে ভগিনী যামিনীর জন্ম হইল ও ভাদ্র মাসের মধ্যভাগে পিতামহাশয় আমাদিগকে নিজের কাছে আনিবার জন্য বাসণ্ডা গেলেন। গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া বলিলেন—"আমরা বিধর্ম্মীর নৌকা ঘাটে লাগাইতে দিব না। স্ত্রীর সহিত একবার দেখা না করিয়া ফিরিয়া যান ভাল, নচেৎ নৌকা ডুবাইয়া দিব।" পিতৃদেব বলিলেন, "আমার স্ত্রীর সহিত একবার দেখা না করিয়া যাইতে পারি না। তিনি এখানে আসিয়া নিজের মুখে আমাকে ফিরিয়া যাইতে বলুন, আমি চলিয়া যাইতেছি।"

ঘাটে লোকারণ্য, আমাদের বাড়ীতে লোকের ক্রমাগত যাতায়াত, আত্মীয়রা আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতেছেন—যেন কি আকস্মিক বিপদ উপস্থিত। দূর-সম্পর্কিত এক ভাগিনেয় ও একটি দেবরকে সঙ্গে লইয়া অবগুণ্ঠাবৃতা মাতাঠাকুরাণী নৌকার কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পতিপত্নীতে কথা হইল। তখন উপদেশ বা যুক্তিতর্কের সময় নয়। পতি বলিলেন—"আমি একলা বড়ই কষ্টে আছি, তুমি এস।" পত্নীর হৃদয় গলিয়া গেল। তবু বলিলেন—"যদি আমার ধর্ম্মের উপর হাত না দেও আমি যাইতে পারি।" উত্তর পাইলেন, "তোমার ধর্ম্মের উপর হাত দিব না, তুমি তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস মত চলিবে।" এই বলিয়া পিতৃদেব মাতৃদেবীকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন, সমবেত লোকদিগকে বলিলেন, "আমার স্ত্রী আমার সহিত আসিতে প্রস্তুত ; কন্যাদুটিকে পাঠাইয়া দিন।" একটা ক্রোধ ও নিরাশার ভাব লইয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া রহিল, বাড়ীর লোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের দুই বোনকে নৌকায় তুলিয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "আমি একবার আমার মা'র সঙ্গে

[* যামিনী সেনের বিশদ জীবনালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য এই সংকলনভুক্ত ধারাবাহিক রচনা 'ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন'।]

দেখা করিয়া যাইব।" পিতামহাশয় মাঝিদিগকে আমার মামা-বাড়ীর ঘাটে নৌকা লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। গ্রামের লোকেরা বলিলেন, "না, সেখানে না, তোমার স্ত্রীকে তাহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে দিব না।"

মাতাঠাকুরাণী বরিশালে আসিলেন। সেখানে নিয়মিত সন্ধ্যাআহ্নিক করিতেন, মাটির শিব গড়াইয়া পূজা করিতেন, ব্রতনিয়মাদিও পূর্ব্বের মত রক্ষা করিতেন। পিতামহাশয় বাধা দিতেন না, কিন্তু হাসিতেন। মাতাঠাকুরাণী সদ্‌ব্রাহ্মণ ও সদ্‌বৈদ্য ছাড়া কাহারও ছোঁয়া খাইতেন না। যাহার জল-চল, এমন চাকর না পাইলে পানাহার বন্ধ থাকিত। জল আনিবার লোক না থাকিলে কখন কখনও কেবল ডাবের জল খাইয়া থাকিতেন।

পিতামহাশয় দুইবেলা আমাদিগকে কাছে বসাইয়া উপাসনা করিতেন। তিনি আমাদের জন্য একটি শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়িনী সভা[১১] হইতে যে পরীক্ষা গৃহীত হইত, তাহার সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য আমি পড়িতাম। মা আমার ঠিক উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন—তাঁহার পাঠ্য ছিল বোধোদয়, সরল ব্যাকরণ, ভূগোলসূত্র এবং অঙ্কের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ। আমার পাঠ্য ছিল—বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং ১৯০ পর্য্যন্ত গণনা। পরীক্ষা দিয়া উভয়ে প্রায় একমূল্যের একপ্রকার পুরস্কারই পাইলাম। মা শিরঃপীড়া বশতঃ আর বেশীদিন পড়া-শুনা করিতে পারেন নাই। গৃহকর্ম্ম ও সন্তান-পালনে তাঁহার এত সময় যাইত যে পড়িবার অবকাশও পাইতেন না।

পিতামহাশয় তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে সপরিবারে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। ইঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া মাতাঠাকুরাণীর ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হইল। কিন্তু জাতিভেদ ত্যাগ করিতে তাঁহার অনেকদিন লাগিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি অস্পৃশ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমানের ছোঁয়া আহার বা পানীয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না। বলিতেন—"রুচি হয় না, কি করি?"

এদিকে কিন্তু সকল-জাতীয় অতিথি-অভ্যাগতকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে প্রীতি বোধ করিতেন। এই সময় একটি কায়স্থবংশীয়া বালবিধবা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া আমাদের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মা তাঁহার ছোঁয়া খাইতেন না, কিন্তু অন্যথা তাঁহাকে আপনার মত করিয়া রাখিতেন।

বাবা পিরোজপুরের মুন্সেফ হইয়া আসিলে পর তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতি রবিবার ব্রাহ্মসমাজ বসিত। স্থানীয় ভদ্রলোকদের লইয়া রবিবার দুই-বেলা উপাসনা হইত। আমি ও মা ভিতরের দিক হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি দিতাম ও সঙ্গীত প্রার্থনাদি শুনিতাম। মাতাঠাকুরাণী সংকীর্ত্তনের কথা ও সুরগুলি শিখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। "প্রভু দয়াল, ঐ সাধুমুখে আমি শুনেছি" এই গানটি সম্পূর্ণ আকারে পাইবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া একখানি শ্লেট ও একটি পেন্সিল লইয়া উপর্য্যুপরি কয়েক রবিবার আমি বেড়ার পিছে বসিয়া গানটি লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—বোধ হয় কৃতকার্য্যও হইয়াছিলাম। কেন যে মাতাঠাকুরাণী আমার পিতামহাশয়ের নিকট ব্রহ্মসঙ্গীতখানি চাহিয়া লয়েন নাই জানি না। হয়তো জানিতেন না গানটি পুস্তকে আছে কি না, নয়তো লজ্জাবশতঃ সঙ্গীতের অনুরাগ গোপন করিয়াছেন। আমার মনেও চাহিবার কথা উদয় হয় নাই। আমি পিতামহাশয়কে

অত্যন্ত ভয় করিতাম। এ সময় আমার বয়স আট উত্তীর্ণ হইয়া নয় চলিতেছে। বোধ হয় এই সময়েই মাতৃদেবীর ব্রহ্মোপাসনার প্রতি অনুরাগ জন্মে। মুন্সেফের স্ত্রী হইয়াও তাঁহাকে স্বহস্তে সকলের জন্য রাঁধিতে হইত, তবু উপাসনার সময় সব কাজ ফেলিয়া সেই মেটেঘরের পিছনে ভিজা-মাটির উপরে আসিয়া বসিতেন।

পিরোজপুরে আমার তৃতীয় সহোদর প্রেমকুসুমের জন্ম হয়। এখান হইতে অবসর পাইয়া পিতামহাশয় আবার কিছুদিন আমাদের লইয়া বরিশালে আসিলেন এবং মাস-দুই পরেই সকলে কলিকাতা রওনা হইলাম।

কলিকাতা আসিয়া মাতাঠাকুরাণী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রথম সামাজিক উপাসনা দেখিলেন। বরিশালে থাকিতে আত্মীয়স্বজনের মনঃপীড়ার ভয়ে সেখানকার সমাজে যান নাই। কিছুদিন কলিকাতা থাকিবার পর পিতামহাশয় অস্থায়ীরূপে ঠাকুরগাঁয়ের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন এবং আমাদিগকে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে[১২] রাখিয়া গেলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়[১৩] তথায় সপরিবারে ছিলেন। তাঁহার পরিবারের সহিত মাতৃদেবীকে পরিচিত করিয়া দিবার পর অপরিচিত স্থানে অনেক অপরিচিতের মধ্যে বাস করিতে তাঁহার আপত্তি রহিল না।

এখানে দুইবেলা নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিতে হইত, সকলের সহিত একপংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে হইত এবং দিনে একঘণ্টা করিয়া ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের[১৪] নিকট পড়িতে হইত। দ্বিপ্রহরে শিশু-কন্যাদ্বয়কে ঘুম পাড়াইয়া একখানি 'সীতার বনবাস' ও বাঙ্গলা ব্যাকরণ হাতে লইয়া পড়িতে যাইতেন দেখিতাম।

শৈশবে আমার পিতামহদেব আমাকে অথবা তাঁহার জ্ঞাতিপুত্রগণকে যে সকল ছড়া মুখস্থ করাইতেন, আমার মাতাঠাকুরাণী রন্ধনশালায় বসিয়া তাহা শুনিয়া শুনিয়া শিখিয়া লইতেন। প্রথম বয়সে শ্রুত এই সকল ছড়া এবং পঠিত রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশ তাঁহার বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত স্মরণ ছিল, প্রসঙ্গক্রমে সে-সকল আবৃত্তি করিতেন। কথায় কথায় এমন পদ্য-প্রবচন আবৃত্তি করিতে আজকাল কাহাকেও শুনি না। শিরঃপীড়াদিবশতঃ পরবর্ত্তীকালে তাঁহার স্মৃতিশক্তি তেমন প্রখর ছিল না। পঠিত বিষয় ভুলিয়া যাইতেন। পিতামহাশয় তাঁহাকে যেরূপ শিক্ষিতা দেখিতে চাহিতেন, সেরূপ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এজন্য পিতামহাশয়ের কথাবার্ত্তায় মাতৃদেবী সম্বন্ধে নৈরাশ্য ও কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইত। আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমি বুঝিতেছিলাম যে, ইহাতে মাতৃদেবীর মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত লাগিত, কিন্তু মুখে কোনদিন বিশেষ কিছু বলেন নাই এবং স্বামীর বন্ধুবর্গের নিকট, এমন কি নিজের সন্তানগণের নিকটও সম্মান বা শ্রদ্ধার কোন দাবী রাখেন না এমন ভাব দেখাইয়াছেন।

তিনি কৈশোরে ও যৌবনে সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সুশীলতা, নম্রতা, সেবাপরায়ণতা ও সৌজন্যাদির জন্যও সকলে তাঁহাকে সুখ্যাতি না করিয়া পারিত না। অথচ তিনি আপনাকে মূর্খ মনে করিয়া নিজকে সর্ব্বদা সকলের পশ্চাতে রাখিতেন। নিজের মূর্খতা তাঁহাকে স্বামীর সর্ব্বথা যোগ্যা ও আদরণীয়া করে নাই ; সকল ভাব, চিন্তা ও কার্য্যে স্বামীর সহানুভূতি দিতে হয়তো পারেন না, এই কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা এই

হইল যে কন্যাদিগকে এমন সুশিক্ষা দিবেন যেন তাহাদিগকে কেহ অজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা বা উপহাস করিতে না পারে। চরিত্রের মহত্ত্ব, স্বাভাবিক সুবুদ্ধি যে পুঁথিগত বিদ্যা হইতে কত অধিক মূল্যবান একথা জীবনের আরম্ভে ও মধ্যভাগে না হউক, প্রবীণবয়সে পিতৃদেব ভূয়োভূয়ঃ স্বীকার করিয়াছেন এবং আমাদের জননীদেবীকে যে একসময়ে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহা মনে করিয়া দুঃখিত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন। তিনি বুঝিয়া গিয়াছিলেন যে, মাতৃদেবীর সেবাপরায়ণতা বিবিধ ভাষা শিক্ষা করিয়া বা হাজারখানা পুস্তক পাঠ করিয়া শেখা যায় না। অনেক পড়িয়া, অনেক দিকে অনেক চিন্তা লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া আমরা একরকম মানসিক বিলাসিতা ও দৈহিক অলসতার মধ্যেই ডুবিয়া যাইতেছি। উচ্চ চিন্তা উচ্চ মতই যে উচ্চ জীবন নহে আমরাও তাহা দেখিতেছি এবং একান্তচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন মাতৃদেবীর সরল নীতিজ্ঞান, সহজ ধর্ম্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য ও ত্যাগশীলতা জীবনে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

পিতৃদেব ভাগ্যবান ছিলেন যে, তাঁহার কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বা কোন সৎকার্য্যের পথে তাঁহার পত্নী প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন নাই ; প্রত্যুত তাঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। এখন স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্থা কন্যার বিবাহ হিন্দুসমাজের মধ্যেও প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু তখন হিন্দুসমাজে কেন, ব্রাহ্ম-সমাজ-ভুক্তা অনেক নারীও কন্যাদের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতিনী ছিলেন না, এবং বাল্যদশা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তাহাদের বিবাহের জন্য নিজ নিজ স্বামীকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। সেই সময়ে আমাদের জননী স্বয়ং শিক্ষিতা না হইয়াও আর কোন কথা না ভাবিয়া কেবল আমাদের কথাই ভাবিতেন। একটি দিনের জন্যও তাঁহার মুখে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব কেহ শোনে নাই। আমি যে দশবৎসর বয়সে মিস এক্রয়েড-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহিলা-বিদ্যালয়ের[১৫] বোর্ডাররূপে প্রেরিত হইয়াছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির জন্য পড়িতে পারিয়াছিলাম তাহার জন্য কেবল পিতৃদেব নহেন, মাতৃদেবীও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। যামিনীকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে দিতে পিতৃদেবের আপত্তি ছিল, মাতৃদেবীর তাহাও ছিল না। তিনি ব্যবহারেও পুত্রকন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। সাধারণ নারীদের মত বস্ত্রালঙ্কারে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ থাকিলে তিনি আমাদের শিক্ষার জন্য এত অর্থব্যয় স্বীকার করিতেন না, পিতৃদেবকেও স্থানে-অস্থানে দান ও পুস্তকক্রয় দ্বারা নিঃস্ব হইতে দিতেন না।

সকল মাতাই স্নেহময়ী, কিন্তু আমাদের মাতার স্নেহ একটু যেন এদেশের মাতৃসাধারণের স্নেহ হইতে বেশী গভীর বেশী উচ্চ এবং বাহিরের দিকে বেশী সংযত ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। তিনি সন্তানগতপ্রাণা হইয়াও শৈশবে আমাদিগকে যথেষ্ট শাসন করিয়াছেন। আমি যখন তাঁহার অঞ্চলের একমাত্র নিধি সেই সময়েও আমি তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতাম, তেমনি ভয় করিতাম। অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তাঁহার চক্ষের একটু দৃষ্টি আমাকে খেলা হইতে ফিরাইয়া আনিত। রোগেশোকে, বিশেষ পরীক্ষার মধ্যে মাতৃদেবীর স্নেহের গভীরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। তিনি কখনও অস্থির হইতেন না। একবার তাঁহার একটি সন্তানের যখন ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছে, তাহার হস্তপদের বিক্ষেপ-দর্শন নিকটবর্ত্তী সকলের যখন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন সন্তানের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও নিজে

কেবল অশ্রু মুছিয়াছেন, মুখ ফুটিয়া কাঁদেন নাই, আমাকে বলিয়াছেন—"কাঁদিও না, কাঁদিবার অনেক সময় আছে, চিকিৎসার সময় চলিয়া যায়।"

একটি সন্তান অল্পদিনের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হইবে, শরীরের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আর একটি টাইফয়েড রোগগ্রস্ত সন্তান শ্রীমান প্রভাতকে কোলে লইয়া দিনরাত্রি একাসনে কাটাইয়াছেন। ঈশ্বরকৃপায় প্রভাত ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল।

কেবল নিজের সন্তান নহে, পরের সন্তানের জন্যও এইরূপ করিতে পারিতেন। একবার আমি বেথুন স্কুলের একটি ক্ষুদ্র বালিকার অভিভাবকত্ব প্রাপ্ত হই। তাহার টাইফয়েড জ্বর হইলে তাহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। চিন্ময়ীর জন্মের পর মাতৃদেবী তখন সূতিকাগার হইতে সবে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার ক্রোড়ের সন্তানটি দশ-বার দিনের অধিক হইবে না। সেই অবস্থায় রুগ্না বালিকার কাপড়-চোপড় স্বহস্তে কাচিয়া দিতেন এবং অন্যপ্রকারে তাহার শুশ্রূষার সাহায্য করিতেন। তখন আমার বি-এ পরীক্ষা অতি নিকট বলিয়াই বোধহয় আমাকে খুব বেশী খাটিতে দিতেন না।

পিতামহাশয়ের পীড়ার সময় মাতৃদেবী রোগে-শোকে একান্ত ভগ্ন। তখনও দিবারাত্রি তাঁহার সেবা করিয়াছেন ; দেখিয়া পিতৃদেব অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

আমার কনিষ্ঠ সন্তানের জন্মের কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার তৃতীয় ভগিনী প্রেমকুসুম স্বর্গগত হন। সে সময় মাতৃদেবী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ওয়াল্টেয়ারে যান। একটু আরোগ্য হইবার পরই, আমার কাছে কেহ নাই বলিয়া আমাকে ও আমার শিশুগুলিকে দেখাশুনা আবশ্যক মনে করিয়া আমার নিকট আসিলেন। শোকের মধ্যে একরকম আলস্য ও বিলাসের অবসর থাকে, সে অবসর মাতৃদেবী গ্রহণ করেন নাই।

আমার ভাই যতীন্দ্র যখন মায়ের হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল তখন তিনি বধূকে লইয়া নেপালে যামিনীর নিকট ছিলেন। সেই শোকের অবস্থায়ও বন্ধুগণ তাঁহাকে পানাহার করাইতে গেলে কাঁদাকাটি ও ওজরআপত্তি না করিয়া কিছু খাইতে চেষ্টা করিতেন। বলিতেন, "যামিনীর এত কষ্ট, আবার আমাকে লইয়া যেন তাহার কষ্ট না হয়।" তিনি না খাইলে যামিনীও কিছু খাইবে না সেজন্যও চেষ্টাপূর্ব্বক কিছু গলাধঃকরণ আবশ্যক মনে করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই হার মানিতেন। নিজের মত প্রচার করা বা অন্যকে বলপূর্ব্বক নিজের মতানুবর্ত্তী করিবার কোন চেষ্টা তাঁহার ছিল না। তিনি নিরভিমানিনী ছিলেন এমন কথা বলিতে পারি না। অনাদরের ব্যথা নীরবে এবং গোপনে বহন করা যদি অভিমানের চিহ্ন হয় তবে তাহা তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই অভিমানের সহিত আত্মবিলোপী ভাবের (Self-effacement) আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিয়াছি।

পুত্রকন্যাকে সকলে ভালবাসে, পুত্রবধূকে সকলে ভালবাসিতে পারে না। মাতৃদেবী পুত্র হারাইয়া বধূকে বুকে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, "তুমি আমার বড় আদরের, তুমি যে তার একমাত্র চিহ্ন।"

দাসদাসীদের প্রতি তাঁহার স্নেহ যত্ন সর্ব্বদাই দেখিয়াছি। অতিথিঅভ্যাগতদিগের জন্য

অনেক ত্যাগস্বীকার করিতেন। এই শিক্ষা অতি অল্পবয়সেই আরম্ভ হইয়াছিল। দেশে থাকিতে কতবার এমন হইয়াছে যে পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একদল কুটুম্ব ভৃত্যাদি লইয়া গ্রামান্তর হইতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং এক-ক্রমে মাসাধিক কাল থাকিয়া যাইতেন। ইঁহারা তাঁহার পূর্ব্বকথিত খুড়শ্বশুর মহাশয়ের বৈবাহিক-পরিবার। প্রথম রাতে নিজেরা অভুক্ত থাকিয়া বালিকা বধূ ও খুড়শাশুড়ী আপনাদের আহার্য্য ইঁহাদিগকে বাঁটিয়া দিতেন। তাহার পর যতদিন ইঁহারা থাকিতেন ইঁহাদের জন্য রন্ধনাদিতে ব্যস্ত থাকাতে কি দিবসে কি রাত্রে বধূ ও গৃহিণীর সময়ে আহার হইত না। একালে এরূপ আতিথ্য কেহ চাহেও না, পায়ও না।

আলস্য কাহাকে বলে মাতা জানিতেন না। বালিকা-বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি চিরদিন কুটনা কুটিয়াছেন, বহুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছেন। ইদানীং সে শক্তি ছিল না। তথাপি যেদিন তিনি শেষশয্যা গ্রহণ করিলেন সেদিন বধূরা কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিল বলিয়া নিজে গিয়া সকলের জন্য পান সাজিতেছিলেন।

১৮৭২/৭৩ সনে তিনি একেবারে পৌত্তলিকতার সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। ভারতাশ্রমে ব্রাহ্মপদ্ধতি-অনুসারে তাঁহার তৃতীয়া কন্যার নামকরণ হয়। তদবধি জীবনে প্রতিদিন উপাসনা করিয়াছেন। পিরোজপুরে তাঁহার জন্য গান শিখিতে চেষ্টা করিয়াছি, চিরকাল যেমন করিয়া পারি তাঁহাকে গান শুনাইতে হইয়াছে। ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকখানি তাঁহার প্রিয় সঙ্গী ছিল। চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল তবু চসমা চোখে দিয়া সঙ্গীতগুলি পড়িতে চেষ্টা করিতেন। মৃত্যুকালেও সঙ্গীতখানি শিয়রে ছিল দেখিলাম। কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে জানিবার জন্য তাঁহার চিরদিন কৌতূহল ছিল। খবরের কাগজে কি আছে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিতাম সন্ধ্যার সময় অথবা রাত্রে পুত্রবধূর হাতে একখানি সংবাদপত্র দিয়া উহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন ; অনেক ঘটনা যাহা আমরা ভুলিয়া যাইতাম তিনি মনে রাখিতেন।

সাতবৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, দশবৎসরে তিনি স্নেহময়ী শাশুড়ীকে হারাইয়া খুড়-শাশুড়ীদের অধীনে থাকিয়া আত্মশাসনে অভ্যস্ত হইতে থাকেন, সাড়ে-একুশ হইতে তেইশ বৎসর প্রাণপণে শ্বশুরের সেবা করেন, সাড়ে-তেইশ হইতে ৫৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুখে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর অনুবর্ত্তন করেন। তাঁহার পাঁচ কন্যা ও পাঁচ পুত্রের মধ্যে একটি কন্যার শৈশবেই মৃত্যু হয়। তৃতীয়া কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার শেষবয়সে তাঁহাকে বড়ই ব্যথা দিয়া যায়। পুত্রের মৃত্যুর চারিমাস পরেই তাঁহার বৈধব্য-প্রাপ্তি ঘটে। তাহার পর নীরবে ক্রমে আরও দুইটি শোকের কঠিন আঘাত সহিতে হইয়াছে। আমাদিগের নিকট বসিয়া মৃত্যুকামনা করিলে আমি বলিয়াছি, "মা, তুমি এখন গেলে চলিবে না, এ পরিবারের কেন্দ্র তুমি, তোমাকে ঘিরিয়া, তোমার টানে, সকলে যে-যাহার স্থানে আছে, তুমি সরিয়া গেলে কে কোথায় গিয়া পড়িবে।" তিনিও সেই আশঙ্কা একটু করিতেন এবং সকলকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা কিয়দংশে পূর্ণও হইয়াছে।

তিনি কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহিতেন না। দেহে বল না থাকিলেও পুত্রগণের ও

পুত্রবধূদের বিনা-সাহায্যে চলিতে চাহিতেন। ১৩ই আগষ্ট দ্বিপ্রহর-রাত্রে স্নানের ঘরে গিয়া পড়িয়া যান, বধূ ও পুত্রেরা গিয়া ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। তখন তাহারা বা ডাক্তার আঘাতের গুরুত্ব কেহ অনুভব করে নাই। পরদিন সকালে তাঁহার চৈতন্য লোপ হইল। বেলা ৯টার সময় নীরবে পুরাতন গৃহ ত্যাগ করিয়া নবগৃহে স্বামী পুত্র কন্যা জামাতা ও দৌহিত্রের সহিত মিলিত হইতে গেলেন।

বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৭

শ্রীহট্টে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের অভিভাষণ

[শারদীয়া পূজার ছুটিতে প্রতি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বৎসর উহার একচত্বারিংশ অধিবেশন শ্রীহট্টে হইয়াছিল। কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণের কোন-কোন অংশ নীচে মুদ্রিত হইল]

শ্রীহট্ট মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্মভূমি, অদ্বৈতপ্রভুর পৈতৃক নিবাসও এই অঞ্চলেই ছিল। ইহা শ্রীহট্টের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আমি বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, এখানকার অধিবাসীরা স্বভাবতঃই সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের অনুরাগী, তাই মনে হয় এটি স্বভাবতই ভক্তি-সাধনার অনুকূল স্থান। পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণিও[১৫ক] এইখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব জ্ঞানচর্চ্চার অভাবও এখানে ছিল না। এই সকল ভক্ত ও জ্ঞানী মহাপুরুষের স্মৃতির আলোক অনুরঞ্জিত এই সরস শ্যামল ভূমিতে আসিয়া আমরা তীর্থদর্শনের ফল লাভ করিলাম।

আজ দেশের সকল দিকের সকল কাজে, সকল বিপদ ও দুর্গতি দূর করিবার জন্য মিলিত আগ্রহ, চিন্তা, প্রার্থনা ও প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। যে যাহার আপন প্রাণ, আপন পরিজন, আপন সুখ-সুবিধা ও ধর্ম্ম বাঁচাইয়া চলুক তবেই জাতি সমাজ ও দেশ বাঁচিবে, জগতে শান্তি হইবে একথা যে মিথ্যা তাহা আমরা বুঝিয়াছি। কি ব্যক্তিগত ভাবে, কি জাতিগত ভাবে, স্বতন্ত্র স্বার্থ লইয়া আমরা বেশীদিন বাঁচিতে পারি না। আমার কৈশোরে, সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া, যে সত্যটি পদ্যে বিবৃত করিয়াছিলাম—

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে,
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

ইহার যাথার্থ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। সকলের তরে সকলে আমরা এ-কথা কেবল নিজ পরিবারে নিজ সমাজের সম্বন্ধেই নয়, আরও ব্যাপকভাবে দেশ ও জাতিসমূহের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। আপন সুখ-সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের সকল মানুষের সুখ-সুবিধা হইলেই প্রকৃত মঙ্গল ও শান্তির সম্ভাবনা, অন্যথা নহে। দেশের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। বহুকাল হইতে দেশের অনুন্নত শ্রেণীকে অনুন্নত থাকিতে দিয়া দেশকেই হীনবল করা হইয়াছিল ; শ্রেণীবিশেষের হাতে শাস্ত্রচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মের রাজকোষ ও কোষাধ্যক্ষ করিয়া বিদ্যা ও গুণ নির্ব্বিচারে আচার্য্য ও পুরোহিত হইবার জন্মগত অধিকার দিয়া তাহাদিগকে অলস, অর্থলোলুপ, স্বার্থপর ও অত্যাচারী হইবার পথ প্রশস্ত করা হইয়াছিল, শাস্ত্রচর্চ্চা লোপ পাইয়া

কুসংস্কারের আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। নারীকে অবরোধে আবদ্ধ এবং জ্ঞানানুশীলনে বঞ্চিত রাখিয়া মূর্খ দুর্ব্বল ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ করা হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ যথেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শতাব্দী-কালের মধ্যেই আমরা ধনী ও মধ্যবিত্তেরা বিদেশী পণ্যে সস্তায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গিয়া দেশের বহু শিল্প নষ্ট হইতে দিয়াছি এবং কেবল শিল্পীদের নহে, নিজেদের দুরবস্থার কারণ হইয়াছি। এই বাংলা দেশে হিন্দুরা মুসলমান ভাইদের হীন চক্ষে দেখিয়া কালে তাহাদের হৃদয়ে উৎকট বিদ্বেষ-বিষ সঞ্চিত হইতে দিয়াছি, সে বিষের জ্বালায় আজ আমরা সকলে জর্জ্জরিত। সমাজ-দেহের বা দেশের এক অংশের ক্ষতিতে সমগ্র দেশের ক্ষতি। এক জাতির ক্ষতিতে সকল জাতির ক্ষতি।

এ-যুগে রাজর্ষি রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ, তাঁহার সময়ে না হউক, পরবর্ত্তীকালে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য অস্বীকার, নারীর অবরোধমোচন, নারীর উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তন ইত্যাদি সামাজিক কল্যাণকর্ম্মে সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হন। ক্রমে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পূর্ণ একমত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ এক পথে না গিয়াও দেশের কল্যাণকল্পে এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। খৃষ্টান মিশনারীদের এবং বর্ত্তমানে থিওসফিষ্টগণের চেষ্টাও এ সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতাসহকারে উল্লেখনীয়। উজ্জ্বলতর জ্ঞানালোকে, ও পাশ্চাত্য জাতিসকলের নিকটতর ও বিস্তৃততর সংস্পর্শে, অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও নৈতিক সাধনায় আমরা যথেষ্ট লাভবান হইয়াছি। মানুষে মানুষে অবাধ মিলনে জ্ঞান বর্দ্ধিত এবং হৃদয় প্রশস্ত হয়, আত্মগরিমা সঙ্কুচিত হইয়া আসে। সকলের ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে মনোযোগ ও সম্ভ্রমের সহিত পাঠ করিলে মূলে আশ্চর্য্য ঐক্য অনুভূত হয়। সকল সাধু মহাপুরুষের সাধনা ও লক্ষ্যের মধ্যে আশ্চর্য্য মিলন। ব্রাহ্মসমাজের মতের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর খুব অমিল আছে কি? আজ এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ রাজনীতির মঞ্চ হইতে অবিদ্বেষ, ক্ষতি-সহিষ্ণুতা, অহিংস অসহযোগ, নিরস্ত্র সংগ্রাম, বিশ্বপ্রীতি সংযুক্ত স্বদেশ-প্রেম, ভারতে হিন্দুমুসলমান মিলিত একজাতীয়তা প্রচার করিতেছেন, অগণ্য দেশবাসীর তিনি নেতা ও পুরোহিত, সর্ব্বদেশের সাধুজনের নমস্য। তাঁহার প্রচার মুখ্যতঃ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের উন্নতিকল্পে বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাই অসংখ্য দেশবাসী ও বহু বিদেশীর চিত্তের উপর তাঁহার যে আশ্চর্য্য প্রভাব তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা। নিরস্ত্র, নিরীহ, শীর্ণকায় এই মানুষটির ভিতরে আত্মার প্রভাব ছাড়া আর কোন প্রভাব আছে? কিন্তু এমন অসীম সাহসে দুর্জ্জয় রাজশক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইবার বল তাঁহার কোথা হইতে আসিল? ধর্ম্মবিশ্বাস হইতেই। আজ হউক, কাল হউক, ধর্ম্মের জয় হইবেই এই বিশ্বাস হইতে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধনবল, জনবল দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারে, কিন্তু পূতচরিত্র মহাপুরুষের অদম্য অনম্য ন্যায়-নিষ্ঠা বা সত্যাগ্রহরূপ শক্তিতে অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপার সকল সংঘটিত হয়। তবু প্রকৃত সত্যাগ্রহ আজিও দেশমধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচার হইতে পারিতেছে না। তাহার জন্য প্রয়োজন অমানুষিক ধৈর্য্য ও ত্যাগ।

বর্ত্তমানে চারিদিকে কি অশান্তি, কি বিক্ষোভ! কেবল এদেশে নয়, সকল দেশেই এক অভূতপূর্ব্ব চিত্তকম্প ও চিন্তান্দোলন চলিয়াছে। এমন করিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ একই কালে কখনও বোধ হয় নড়িয়া উঠে নাই। পাতালে বসিয়া পুরাণ-বর্ণিত সহস্রশীর্ষ বাসুকী নাগ ধরণীর ভারে ক্লান্ত হইয়া যেন সবগুলি মাথা একসঙ্গে নাড়া দিয়াছে। তাই সকল দেশ কম্পিত, ত্রস্ত, আত্মরক্ষার জন্য উন্নিদ্র। সব দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি নিজেদের দেশ, এই নানা সম্প্রদায়ের জননী বিপুল ভারতভূমির দিকে দৃষ্টি করি, দেখি বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্বার্থহানির ভয়ে কত অস্থির, পদ প্রভুত্ব লাভের জন্য কত ব্যগ্র। অতি নিকটে, অতি প্রিয় বঙ্গভূমির দিকে চাহিয়া দেখি কত উপদ্রব! এক দিকে মানুষের উপর জড়শক্তির নিষ্ঠুর আক্রমণ—বন্যা, জলপ্লাবন, আর একদিকে মানুষের উপর মানুষের বিদ্বেষের অগ্নিবর্ষণ; অবিচার ও অত্যাচারের ফলে নৃশংস প্রতিহিংসা। কত বিচ্ছেদ দুঃখ ও মৃত্যুশোক, দারিদ্র্য ও অপমান, ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দেশবাসীদের পেষণ করিতেছে, কত দুষ্কৃতি ও অকল্যাণ পৌনঃপুনিক দশমিকের কতকগুলি সংখ্যার মত বার-বার ফিরিয়া আসিতেছে।

এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ কি উদাসীন দ্রষ্টা হইয়া থাকিবেন, কিংবা দুর্নীতি দুরীতি দূর হউক, কেবল মনে মনে এই প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন, এখন কি গভীর ভাবে চিন্তা করিবার, উদ্যমসহকারে শান্তির চেষ্টা ও কল্যাণ কর্ম্মে বাহির হইবার আবশ্যক নাই? বেদনা ও মৃত্যুর ভয় যাহাদের ভাঙিয়া গিয়াছে, আইনের ভয় তাহাদের বিচলিত করিবে না। কোন ভয় নহে, কিন্তু প্রবল কোন আকর্ষণে তাহাদের চালাইতে হইবে। সে কি আকর্ষণ যাহা দৃঢ় অথচ মধুর, অনিন্দ্য ও কল্যাণপ্রদ, যাহা ইহাদের উৎসাহ-চঞ্চল অক্লান্ত উদীপ্ত মনকে সংযমের পথে টানিয়া রাখিয়া দেশের নানা দুর্গতি দুর্নীতির বিনাশে ও প্রকৃত স্বরাজ ও স্বাধীনতা অর্জ্জনে নিযুক্ত করিতে পারে? সে আকর্ষণ হইবে উন্নত আদর্শের। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ, ধর্ম্মজগতের আদর্শ। কিন্তু তাহার জন্য শিক্ষা চাই। সে কঠিন শিক্ষা কে কাহাকে দিতেছে? যখন কিছুকালের জন্য অহিংস অসহযোগ, আইনলঙ্ঘন বা নিরস্ত্র বিদ্রোহ চলে, তখন অত্যাচারের ফলে প্রতিহিংসার অনলেও ঘন ঘন আহুতি পড়ে। সে অনল এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। কেহ কেহ স্পষ্টই বলেন পলিটিকস্ ধর্ম্মনীতির অন্তর্গত নহে। কিন্তু এ কথা কি সত্য? জীবনের সকল কাজই ত ধর্ম্মসঙ্গত হওয়া চাই, সমাজের প্রত্যেক বিধি ব্যবস্থা ধর্ম্মেরই অনুশাসনে হওয়া চাই, নহিলে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, সামাজিক জীবনের ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল বিভাগেই ধর্ম্মের শাসন ও অনুমোদন আবশ্যক। ধর্ম্মকে কেবল নির্জ্জন ও সামাজিক উপাসনার ব্যাপার করিয়া রাখিলে এবং অন্য সময়ে তাহার অনুশাসন লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্মের ধারণ-শক্তি রহিল কোথায়? ধর্ম্ম-নামই ব্যর্থ হইল। সমাজনীতির ন্যায় রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেও ব্রাহ্ম কর্ম্মীর আবশ্যক। ব্রাহ্ম পিতা মাতা ব্রাহ্ম শিক্ষকদের একান্ত কর্ত্তব্য তরুণদের চিন্তা ও চেষ্টা উচ্চস্তরের রাজনীতির দিকে আকর্ষণ করা। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীকে বিলাতে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি রাজনীতিক্ষেত্রে কেন নামিলেন? তিনি উত্তর করিলেন—রাজনীতিকে পঙ্কিলতা মুক্ত করিবার জন্য। ব্রাহ্ম কর্ম্মীরও লক্ষ্য হইবে জীবনের সকল দিক ধর্ম্মানুগত ও পঙ্কিলতামুক্ত

করিবার. চেষ্টা।

কেবল সন্তানদের জন্য ধনোপার্জ্জন করিলে চলিবে না। কেবল তাহাদের আরামের কথা ভাবিলে চলিবে না। সময়-বিশেষে তাহারা যাহাতে ঐশ্বর্য্য ও আরাম ছাড়াও চলিতে পারে, যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করে তাহা কথায় এবং কর্ম্মে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে এবং তজ্জন্য দুঃখ গ্রহণ ও সুখ বিসর্জ্জন করিতে ভীত না হয়, সে শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে। অতি স্নেহবশতঃ আমরা অনেক সময়ে দুঃখ ও কঠোর সংগ্রাম হইতে তাহাদের আড়ালে রাখি। তাহাদের কাছে সাধুতা বিষয়ে যে উপদেশ দিই, জীবনের ছোটবড় কাজে তাহাদের নিকট হইতে সে সাধুতার নিদর্শন পাইতে চেষ্টা করি না। নিজেরাও নিজ নিজ আচরণে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি না। বাচনিক নৈতিক শিক্ষা হইতে জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়াই প্রশস্ত। ধনীর সন্তান পিতার অর্থে কাহাকেও সাহায্য করিয়া অনেক সময় ধনগর্ব্বে স্ফীত হয়, তাহাকে দরিদ্র প্রতিবেশীর রোগের সেবায় নিয়োজিত করিলে, কোন অভাবগ্রস্ত বালককে নিজের হাত-খরচের টাকা হইতে দান করিয়া কষ্টস্বীকার করিতে শিখাইলে অধিকতর সুফল ফলিবে।

যাঁহারা অনুন্নত বলিয়া আজকাল ব্যাখ্যাত এবং এতকাল হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অস্পৃশ্য ছিল এবং যাহারা সম্পূর্ণ অহিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ যবনাদি নামে অভিহিত এবং যাহাদের অন্নজল হিন্দুর অখাদ্য ও অপেয়, ব্রাহ্মসমাজ তাহাদের ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেন নাই ; অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইল তাহাদের অন্নজল গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল অনুন্নতদের উন্নয়নের জন্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে একটি 'মিশন'ও গঠিত হইয়াছে। খাসিয়াদের জন্যও হইয়াছিল। তথাপি অর্থাভাবে এবং লোকাভাবে ইহাদের প্রতি সমুচিত কর্ত্তব্য সাধিত হইতেছে না একথা বার-বার শুনা যাইতেছে। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রবল সেখানে ধনবল ও লোকবল না আসিয়া যায় না। তাই অনুন্নত শ্রেণীর জন্য ব্রাহ্মসমাজের যুবকদের মধ্য হইতে যাঁহারা হৃদয়বান কর্ম্মকুশল ও ত্যাগস্বীকারে সমর্থ তাঁহারা সাহস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। কেবল দল বাড়াইবেন বলিয়া নহে, কিন্তু যাহা সত্যধর্ম্ম বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন তাহারই প্রচারের জন্য, অবজ্ঞাতকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য, অশিক্ষিতকে শিক্ষা দিবার জন্য, অবিচার ও অত্যাচার দূরীকরণের জন্য।

আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ যে যে-নাম লইয়া সুখী হই না কেন, সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ যে উদার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম তাহা হইতেছে ঈশ্বরপ্রীতি ও মানবপ্রীতির সাধনা, মানব চরিত্রের আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রয়াস। সাধনার আরম্ভে জীবন গঠন ও সমাজ গঠনের জন্য নামের একান্ত আবশ্যক, কিন্তু কালে সাধক এমন অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন যেখানে তাঁহার সাম্প্রদায়িক নামের আসক্তি ও বন্ধন কাটিয়া যায়, যখন তিনি জানেন, আমার পিতাও একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর আর আমার ভাইও সেবার অধিকারী বিশ্বমানব।

আমরা কাহারও হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, খৃষ্টানত্ব ইত্যাদি বংশক্রমাগত চিরপোষিত নাম

চিহ্ন বলপূর্ব্বক বর্জ্জন করাইবার বিরোধী। কিন্তু সকল বিভিন্নতা মিলাইয়া লইয়া এক মহামানবত্ব ক্রমে আসিবে এই আশায় আশ্বস্ত। সেদিন কি আসিবে না?

পরস্পরের ধর্ম্মের অবান্তর (non-essential) সাময়িক ও আপেক্ষিক বিষয়ে বিবাদ বর্জ্জন করিয়া গুরুতর (essential) মূলগত চিরন্তন সত্য বিষয়ে ঐক্য স্বীকার পূর্ব্বক সকলে সকলের দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিলে, মনের সঙ্গে মন মিলাইয়া দেখিলে, কত নূতন বল সঞ্চিত হইবে, কত নূতন আনন্দের অধিকারী হইব।

প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৮

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

[সংক্ষেপ জীবন-চরিত]

বাঙ্গালা ১২৭৮ সনের ৬ই আষাঢ়, ইংরাজী ১৮৭১ সনের জুন মাসে বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে ভগিনী যামিনীর জন্ম হয়। এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে পিতামহদেব লোকান্তরিত এবং তাহারও বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যামিনী পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান, আমি প্রথম। আমি তখন সপ্তম বর্ষে চলিয়াছি, তাই তাহার জন্মদিনের কথা মনে আছে।

শুনিতাম পিতা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছেন, শাস্ত্রমত তিনি ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধ না করাতে তাঁহার জাতও গিয়াছে! অতএব তিনি থাকিয়াও নাই। এইজন্য পিসীমারা, বিশেষ মেজো পিসীমা আশা করিতেছিলেন একটি ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মিলে পিতৃকুল রক্ষা পাইবে। তাই তিনি সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া ব্যাকুলভাবে নব শিশুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তখন, "আবারও মেয়ে!"—এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অবিলম্বে স্নান করিয়া নিজ ভবনে ফিরিয়া গেলেন। প্রসূতির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিয়াও গেলেন না। এমনি অনাদরে এই কন্যার জীবনের আরম্ভ। ইহাকে জন্ম দিয়া মাতাও অপরাধিনীর মত অনাদৃতা। ভবিষ্যতে এই অনাদৃতা কন্যার দ্বারাই পিতৃকুল পবিত্র এবং জননী কৃতার্থ হইয়াছেন।

সে কালের সূতিকাগৃহ কি রকম ছিল, এখন তাহা অনেকে কল্পনাও করিতে পারেন না। উঠানের মাঝখানে হোগলা কিংবা চাঁচ দিয়া ঘেরা ও ছাওয়া একটু স্থান, তাহার মধ্যে স্যাঁতসেঁতে জমীর উপর একটা ছেঁড়া পাটী কিম্বা অব্যবহার্য্য ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া প্রসূত ও প্রসূতির শয্যা ; পাশে একটা অগ্নিকুণ্ড। পাঁচ দিন এইভাবে কাটিবার কথা। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল, উঠান জলে ভরিয়া গেল, শিশু লইয়া প্রসূতি বিপন্ন। রাত্রি প্রভাত হইলে, বাসভবনের কিছু দূরে ও উহা হইতে সম্পূর্ণ অসংলগ্ন একখানি কুটীরে এই অস্পৃশ্যদের জন্য স্থান করিয়া দেওয়া হইল।

একটি মাস শেষ হইবামাত্র মাতাকে পূর্ব্বের ন্যায় গৃহমার্জ্জন ও রন্ধনাদি যাবতীয় কর্ম্মভার স্বহস্তে লইতে হইল। কেবল শিশুকে স্তন্য দিতে যেটুকু সময় লাগে তদ্ব্যতীত দিবাভাগে তাহার পরিচর্য্যার জন্য বড় বেশী অবসর পাইতেন না। আমার উপর পড়িল শিশুকে দেখিবার ও রাখিবার ভার। আমি তাহাকে ভাল করিয়া কোলে করিতে পারিতাম না। দুই বাহু দিয়া বুকের উপর চাপিয়া লইয়া বেড়াইতাম। মাঝে মাঝে শিশু যখন কাঁদিয়া উঠিত, থামাইতে না পারিলে সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতাম। কিন্তু বেশি দিন এ ভাবে যায় নাই। শিশুর আড়াই কি তিন মাস বয়সে পিতৃদেব আমাদের বরিশাল লইয়া আসিলেন। এখন হইতে আমাদের কন্যাজীবন নূতন গৌরব লাভ করিল। এই সময়ে পরিচারিকাদি নিযুক্ত হইলেও আমি বোনটির কাছে কাছেই থাকিতাম এবং কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে কোলে পাইলে পরম সুখী হইতাম। অতি শৈশব হইতেই যামিনীর হৃদয়ে মাতার পরেই আমার স্থান হইয়াছিল। অল্পক্ষণ আমাকে না দেখিলে সে কাঁদিয়া অস্থির হইত। তাহার বয়স যখন

দুই বৎসর দুই মাস, তখন আমার তৃতীয়া সহোদরা প্রেমকুসুমের জন্ম হয়, কাজেই মাতার আদর ও পরিচর্য্যা যামিনীর যথেষ্ট লাভ হইত না। হয়তো সেই জন্যই আমার উপর তাহার অনুরাগ এতটা সম্ভব হইয়াছিল। আমার নয় বৎসর বয়সে আমাদের তিনটিকে লইয়া মাতৃদেবীকে কিছুকাল মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে থাকিতে হয়। সেখানে যখন স্কুলে পড়িতেছি, এক একদিন দিদির জন্য রোরুদ্যমান শিশুকে শান্ত করিবার জন্য পরিচারিকা তাহাকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া, আমি বড় লজ্জা পাইতাম। সমবয়স্কাদের সঙ্গে খেলা করিতেছি, বোনটি সঙ্গে থাকিতে চাহিত, সঙ্গিনীরা পছন্দ করিত না, বড় বিপদে পড়িতাম ; কখনো বা তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতাম। মনে যে একটু ব্যথা পাইতাম না তাহা নহে, তবে সঙ্গিনীদের কাছেও তো মান রাখা চাই। ইহার আরও দেড় বৎসর পরে যখন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে ছয় মাস কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলাম, সে যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইল। তাহার সকল ত্রুটি ও অপরাধের শাস্তি ও সংশোধনের উপায় ছিল এই কথাটি বলা—"আমি তোর দিদি হব না।" দিদির প্রতি এই অপূর্ব্ব অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, চিরদিন তাঁহার গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি, আদর ও যত্ন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। অন্য ভাই-বোনের প্রতিও তাঁহার স্নেহের অভাব ছিল না, সকলের জন্য খাটিয়াছেন, আমরণ সকলের জন্য ভাবিয়াছেন। পিতা-মাতার প্রতি ভক্তির সঙ্গে ভাই-বোনের প্রতি মমতা তাঁহার প্রকৃতিগত গুণ ছিল।

এই প্রকৃতিগত গুণ দিনে দিনে বৰ্দ্ধিত হইয়া পরিবারের গণ্ডী ছাড়াইয়া কত অনাথ আতুরকে আপনার করিয়া লইয়াছে। শৈশব হইতেই এই স্নেহশীলতার সহিত তেজস্বিতাও যথেষ্ট লক্ষিত হইত। শৈশবে অল্পেই রুষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্বল্পভাষী রোষ নীরব-অভিমানে পরিণত হইয়াছিল। এই অভিমান একটু কম হইলে, তাঁহার স্নেহপিপাসু জীবনে বেদনার পরিমাণও কম হইত। এখন অসময়ে জানিতেছি যে, সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদের অজ্ঞানকৃত ত্রুটিকে স্নেহের অভাব, অবহেলা ও দারুণ উপেক্ষা মনে করিয়া বড়ই ব্যথা পাইয়াছেন ; মুখ ফুটিয়া না বলায়, আমরা ইহার প্রতিকার করিতে পারি নাই।

তাঁহার মধ্যে জ্ঞানানুরাগ ও স্মরণশক্তির প্রাখর্য্যও অতি অল্প বয়স হইতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার প্রথম জীবনের অধিকাংশই আমার সহিত বেথুন স্কুল ও কলেজে কাটিয়াছে। এইস্থানে স্বভাবগুণে যামিনী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার বাল্যের সহপাঠিনীদের মধ্যে হেমলতা দেবী (সরকার), প্রিয়ম্বদা দেবী[১৬] ও জীবনবালা ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য ; স্বর্গীয়া চারুপ্রভা বসু (স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠা ভগিনী), কুমারী স্বর্ণলতা বড়ুয়া (পরে স্বর্ণলতা রায়) এবং কুমারী সরলা রক্ষিত তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। শেষোক্তা যামিনীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া গিরিডি হইতে আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে ছিলেন। ১৮৯০ সনে বেথুন কলেজ হইতে এফ্-এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। স্বর্গীয়া কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি চারিটি বঙ্গমহিলা কলিকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়নে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনী ছিলেন। সে সময়ে এখনকার মত অন্যান্য কলেজে নারী-

পুরুষের একত্র অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল না। মেডিকেল কলেজেই এই সহশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন। আমাদের দেশের পুরুষদের এ সম্বন্ধে মত ও দৃষ্টি তখন মোটেই উদার ছিল না। ছাত্রগণ ছাত্রীদের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, কি না, সে বিষয়ে অনেকে অনেক আশঙ্কা করিতেন। এই আশঙ্কা হইতেই বোধ হয় আমাদের পিতা মহাশয় ইচ্ছা করেন নাই, যে, তাঁহার কোন কন্যা চিকিৎসা ব্যবসা গ্রহণ করেন। আমি যখন ডাক্তারী শিখিবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আমার কন্যারা দেহের চিকিৎসক না হইয়া আত্মার চিকিৎসক হইবে, তাহারা ঘরে বসিয়া সদ্‌গ্রন্থ রচনা করিবে।" আমাকে ডাক্তার হইতে দিতে তাঁহার অমত জানিয়া আমি আর দ্বিধা করি নাই। এইখানেই আমার ও যামিনীর মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট। আমি জীবনে অনেক বিষয়ে অনেক সংকল্প করিয়াছি কিন্তু পিতা-মাতার সায় ও সহানুভূতি না পাইলে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ মনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি। আমার সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল না বলিয়াই এরূপ পারিয়াছি। যামিনীর সে দৃঢ়তা ছিল, তাই বাহিরে নীরব থাকিলেও ভিতরে ভিতরে সংকল্প ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে পিতা মহাশয়কে অনেক বুঝাইয়া যামিনীর ইচ্ছার অনুকূলে তাঁহার মত করাইলাম।

মেডিকেল কলেজে যাঁহারা যামিনীর সহপাঠী ছিলেন তাঁহারা তাঁহার স্বল্পভাষিতা, সর্ব্ববিষয়ে সংযম ও শুচিতা এবং জ্ঞানার্জ্জনে একনিষ্ঠতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার তেজস্বিতা এমন ছিল যে, পুরুষ সহপাঠীরা তাঁহার সহিত কোনপ্রকার বাচালতা করা দূরে থাকুক, আবশ্যকীয় কোন বিষয় জানিবার জন্যও তাঁহার সম্মুখে আসিতে ভয় পাইতেন। তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা শেষ পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছে। তাঁহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, তাঁহার নীরব সতেজ ভঙ্গী, তাঁহার ক্ষিপ্র গতি অযথা কৌতূহলীকে তিরস্কৃত ও স্তম্ভিত করিয়া দিত। এদিকে তাঁহার স্নেহশীলতা মিষ্টভাষিতা ও মিষ্ট ব্যবহারে তিনি ইংরাজ বাঙ্গালী হিন্দু ও খৃষ্টান সহপাঠিনী ও স্বর্ণময়ী হষ্টেলের সহ-বাসিনীদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে, বিশেষতঃ শেষ কয় দিনে, বিশেষ ভাবে পাইয়াছি। একটি হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবা স্বর্ণময়ী হষ্টেলে থাকিয়া যখন ক্যাম্বেল স্কুলে পড়িতেন, তখন যামিনীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। নেপালে গিয়া যামিনী সেখানে তাঁহার জন্য একটি চাকরী জোগাড় করিয়া ডাকিয়া পাঠান। সাংসারিক ঘটনাচক্রে সে সময়ে তিনি যাইতে পারেন নাই, চিঠিরও উত্তর দিতে পারেন নাই। বহু বৎসর কাটিয়া যাইবার পর তাঁহার এক সময়ে মনে হইল যে, পত্রের উত্তর না দিয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন, একবার সাক্ষাৎ করিয়া ইহার কারণ খুলিয়া বলিতে হইবে। অনেক সন্ধানের পর শুনিলেন, যামিনী পুরীতে আছেন। গত পূজার ছুটীর পূর্ব্বে পুরী গিয়া ট্রেণ হইতে নামিয়াই ডাক্তার যামিনী সেনের বাড়ীর খোঁজ করিতে লাগিলেন। যামিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিয়াছেন তো?" বৃদ্ধা যামিনীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এই আমার ঠাকুর দর্শন, এই দর্শনের জন্যই এবার আমার পুরী আসা।" ইনি বাড়ী ফিরিবার মাস দুই তিন পর যখন যামিনীর পীড়ার সংবাদ পাইলেন, অমনি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আমাদের ভগিনীর সেবার জন্য লোকের অভাব ছিল না, দুইটি নার্সও

নিযুক্ত ছিল। তথাপি আচারপরায়ণা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যা চৌদ্দ, পনর দিন অনাহারে ও অল্পাহারে থাকিয়া রোগীর বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কখনও পার্শ্বের ঘরে চুপটি করিয়া বসিয়া করজোড়ে তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিতেন। যখন মৃত্যু আসন্ন দেখিলেন তখন "আমার ভাই! আমার ভাই!" বলিয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্বর্ণময়ী হষ্টেলে থাকিতে যামিনীর সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ একটি ইংরাজ বন্ধুও ব্যাকুল হইয়া বার বার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। যামিনীর অধীনে যাঁহারা হাসপাতালে কাজ করিয়াছেন, যাঁহাদের তিনি নিজে শিক্ষা দিয়া নিপুণ নার্স করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাও উৎকণ্ঠিত চিত্তে কতবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৭ সনে এল্-এম্-এস্ পরীক্ষা পাশ করিয়া, যামিনী কিছুকাল কলিকাতা আসিয়া স্বাধীন ভাবে ডাক্তারি করিতেছিলেন ; কিন্তু দেখিলেন সহজে নারী ডাক্তার লোকে ডাকে না, যেখানে বাড়ীর বাঁধা পুরুষ ডাক্তার নিজে পারিবেন না বলিয়া, নারী ডাক্তারকে দেখাইতে পরামর্শ দেন, সেইখানে সেই পুরুষ ডাক্তারের মনোনীত নারীকে ডাকা হয় ; ফী দিবার সময়ও অনেক অবিচার করা হয়। ফী সম্বন্ধীয় ফাঁকি এবং অবিচার একপ্রকার অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইত, কিন্তু যামিনীর পক্ষে 'কেস' পাইবার জন্য পুরুষ ডাক্তারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। তাই অল্পকাল পরেই ১৮৯৮ সনের শেষ ভাগে চাকরী লইয়া সোলাপুর যাত্রা করিলেন। এই কাজ ছাড়িয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের সুপারিসীতে ১৮৯৯ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি নেপাল রাজ্যের নবপ্রতিষ্ঠিত নারী হাসপাতালের ভার লইয়া ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন ও শ্রীযুক্তা কুন্দকুমারী গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া খাটমণ্ডু যান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধীরকুমারও সঙ্গে গিয়াছিলেন। যতীন্দ্র সেখানে স্কুলের অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সুধীর ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইয়া সেখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেখানে হাসপাতালের অধ্যক্ষতার সহিত অধিরাজ, মন্ত্রীমহারাজ ও অন্যান্য অমাত্য পরিবারের মহিলাদের চিকিৎসার ভার যামিনীর উপর অর্পিত হয়। তিনি চিকিৎসানৈপুণ্যে কেবল অর্থ ও সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, নিজের চরিত্রগুণে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগও আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। নেপালের অধিরাজের মাতা 'মুয়া-বড়-মহারাণী' বা শ্রীপাঁচ, অধিরাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী 'জ্যেঠা-বড়-মহারাণী' এবং মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্র সামসের জঙ্গ বাহাদুরের পত্নী 'বড় মহারাণা' তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। যামিনী নেপাল ত্যাগ করিতে চাহিলে ইঁহারা অধীর হইয়া উঠিতেন।

দেশীয় রাজাদের রাজ্যে তোষামোদকারীরাই সাধারণতঃ রাজার ও রাজপরিবারের প্রিয় হইয়া থাকে। যাঁহারা সর্ব্বত্র আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া, সত্য ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাহেন, তাঁহাদের যে কেবল অপ্রিয় হইতে হয় তাহা নহে, সময়ে সময়ে বিপন্নও হইতে হয়। কুমারী সেন পিতার উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। তাঁহার তেজস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ছোট বড় কাহারও কাছে তাঁহাকে নত হইতে দিত না। এই সকল দেখিতে অনভ্যস্ত হইলেও মহারাজ চন্দ্র সামসের এই তরুণবয়স্কা বাঙ্গালী মেয়ের এই গুণগুলির সমাদর করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে গিয়া নানা কথা, নানা আলোচনা শুনিয়াও কোন

একস্থানের কথা স্থানান্তরে প্রকাশ করেন নাই। এই আশ্চর্য্য বাক্‌সংযম মহারাজকে অতীব প্রীত ও বিস্মিত করিয়াছে। কিন্তু রাণীরা এই বলিয়া অনুযোগ দিতেন যে, ডাক্তারিন মিস সাহেব এত কথা শোনেন হাঁ-কি-না, ভাল-কি-মন্দ কিছুই বলেন না, ইঁহার সহিত গল্প জমে না। তাঁহারা ইঁহাকে আদর-যত্ন ও আতিথ্য দ্বারা আপ্যায়িত করিতে চাহিতেন কিন্তু যামিনী কোথাও জলটুকু পর্য্যন্ত পান করিতেন না। কারণ, জানিতেন ওঁরা ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন।

সকাল ৭টার সময় তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া কাজে বাহির হইতেন, অপরাহ্নে গৃহে ফিরিতেন। হাসপাতালের কাজ এবং রাজাধিরাজ ও মহারাজ পরিবারের ও অন্যান্য স্থানে রোগী দেখিয়া বিশ্রামের জন্য তাঁহার একটুও অবসর মিলিত না। প্রায় দশ বৎসরের এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তখন সেখানকার চাকরী ছাড়িয়া আসিলেন। মহারাজ তাঁহাকে ছুটী লইয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে স্বাস্থ্যলাভের পর আবার ফিরিয়া আসিতে পারেন ; কিন্তু আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে থাকিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। বিশেষ মহারাজ চন্দ্র সামসের জঙ্গের পত্নীর মৃত্যুতে তিনি এত শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন যে আর নেপালে থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিত না। ইতিপূর্ব্বে ১৯০৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নেপালে তাঁহার ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহনের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি কি গভীর স্নেহ ও অসামান্য ধৈর্য্যের সহিত প্রাণপণে ভ্রাতার সেবা ও চিকিৎসা করিয়াছেন তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা এখনও শ্রদ্ধাভরে বর্ণনা করেন।

১৯০৯ সনের মার্চ্চ মাসে তিনি নেপাল ত্যাগ করিলেন। স্বদেশে আসিয়া চিকিৎসিত হইবার কিছুকাল পরে, ইচ্ছা হইল কলিকাতায় ডাফরিন হাসপাতালে (Dufferin Hospital)[১৭] কাজ করেন। ইয়ুরোপীয় উপাধি না থাকিলে তথায় প্রধান ডাক্তারের পদ সম্ভাবনা নাই তাহা তাঁহার জানা ছিল। এতদ্ভিন্ন নূতন জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষাও বিশেষ প্রবল হইল। এই সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আজকাল অনেক রমণীই বিলাত যাইতেছেন, আমার কিন্তু বিলাত রওনা হইবার ছয়মাস পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কখনও বিলাত যাইবার ইচ্ছা হয় নাই। স্বদেশেই অপরিচিত লোকের সহিত বাক্যালাপ করা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন, বিদেশে বিজাতির মধ্যে একাকী বাস করা আমার পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। পঠদ্দশা সমাপ্তির পর হইতেই আমি কাজে প্রবৃত্ত হই। নিজের কাজ লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে, ঐ কাজের ও নিজ পরিবারের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা ভাবিবার আমার অবকাশ ছিল না বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। তিন বৎসর পূর্ব্বে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। রোগের প্রকোপ উপশম হইবার পর অন্যান্য বিষয় চিন্তা করিবার অবসর জুটিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যে, আমি নিতান্ত antiquated (সেকেলে) হইয়া পড়িয়াছি। বিজ্ঞানশাস্ত্র ক্রমশঃ উন্নতিশীল কিন্তু আমি সময়ের সঙ্গে চলিতে পারি নাই, অনেক পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি। এই নষ্ট সময়ের উদ্ধার কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে রমণী চিকিৎসকের অভাব একটা বিশেষ অভাব। স্ত্রীরোগের জন্য ভাল স্ত্রী চিকিৎসকের দরকার। আমার ছাত্রী-জীবনে Operative Surgery and Gynaecologyর যেরূপ অবস্থা ছিল, এখন তাহা হইতে এই দুই বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, সুতরাং আমি যদি আমার স্বদেশীয় ভগিনীদের যথার্থ উপকার

করিতে চাহি, তাহা হইলে আধুনিক উপায়সকল আমার জানা দরকার এবং এজন্য যে সকল বিশেষ হাসপাতাল বিলাতে আছে, তাহাতে অধ্যয়ন ও তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে ইহার জন্য বিলাত যাইতে আদেশ করিতেছিল কিন্তু আমার নিজের স্বভাব আমাকে এই কার্য্য হইতে বিরত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। আমি ইহাদের বিরোধের মীমাংসার এক উপায় করিলাম। Dufferin Fund সচরাচর ভারতবর্ষীয়দের বিলাত যাইবার জন্য scholarship দেয় না, ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিরাই অধিকাংশ স্থলে এই scholarship গুলি পায়। আমি মনে করিলাম যে স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত করা যাউক। আমাকে যদি দেয় তবে আমার পক্ষে বিলাত যাওয়া কর্ত্তব্য ইহাই বুঝিব।

"আমি বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র পাঠাইয়া দিলাম। যথাসময়ে উত্তর পাইলাম যে আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। ১৯১১ সনের ৮ই মার্চ্চ আমি বোম্বাই মেলে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

"জাহাজে ডাক্তার পি, কে, রায়[১৮] ও পি, কে, সিংহ এই দুই জন আমার পরিচিত সহযাত্রী ছিলেন।"

ডাবলিনের রেষ্টারা হাসপাতালে থাকিয়া কাজ শিখিয়া ও পরীক্ষা দিয়া তথাকার এল, এম ডিগ্রী লইলেন এবং গ্লাসগো ইয়ুনিভারসিটীতে পড়িয়া ও Fellowship পরীক্ষা দিয়া Fellow of the Royal Faculty of Surgeons and Physicians উপাধি লাভ করিলেন। কেবল এ দেশের মহিলাদের মধ্যে নহে, সে দেশেও নারীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করিলেন। ইহা তখনকার দিনে বিশেষ গৌরবের কথা। এই উচ্চ উপাধি লাভের পর ১৯১২ সনের জুন মাসে যামিনী আরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিনে গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে লেডী ডাফরিণের সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি অযাচিত ভাবে বার্লিনের Consul ও Ambassador উভয়ের নিকট পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া হাউস[১৯] হইতেও স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের[২০] সুপারিসপত্র পাইয়াছিলেন। জার্ম্মান ভাষা একেবারেই জানা নাই, বার্লিনে একটিও পরিচিত মানুষ নাই, তথাপি কেবল জ্ঞানপিপাসা ও স্বদেশের নারীজাতির কল্যাণেচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এবং ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যাত্রা করিলেন। যে মানুষ স্বভাবতঃ লাজুক এবং অমিশুক, সহজ অর্থে এবং রূপক অর্থেও যাঁহার ভিড় ঠেলিয়া নিজের জন্য পথ করিবার একান্ত অনভ্যাস, তাঁহার এই সাহসের কথা মনে করিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়। কত কষ্টে সেখানে Professor Bremen ও Dr. Mainzer প্রভৃতির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, তাঁহাদের চিকিৎসা ও অস্ত্রপ্রয়োগাদি দেখিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহা কয়েকদিনের লিখিত এক জীর্ণ ছিন্ন স্মৃতিলিপিতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে লিখিত কোন স্মৃতি পুস্তক তাঁহার পাওয়া যায় নাই। বার্লিনে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার কোন ইংরাজ মহিলা বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পরীক্ষার জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই, তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধমনোরথ হইবে। কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত হইল দুঃসহ শোকের পরীক্ষা।

নেপালে থাকিতে যামিনী একটি তিন মাসের ভুটিয়া কন্যাকে তাহার পিতামাতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া, সন্তানস্নেহে পালন করিতেছিলেন। ইহার প্রতি যামিনীর

বাৎসল্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ইহার প্রতি তাঁহার এই আশ্চর্য্য স্নেহের পরিচয় পাইয়া নেপাল হাসপাতালের এক শ্রোত্রীয়া রোগিণী মৃত্যুকালে নিজের শিশুকন্যাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া যায়। যামিনী সেটিকে কলিকাতা আনিয়া নিজের নিঃসন্তানা কনিষ্ঠা ভগিনীকে দিয়াছিলেন। ভুটিয়া বালিকাটির সহাস্য প্রফুল্ল মুখ ও সরল ব্যবহার আমাদের সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যামিনী উহার নাম রাখিয়াছিলেন কল্যাণী, উহার ডাকনাম ছিল 'ভুটু'। যামিনীর ইয়ুরোপ বাসের সময় সে আমাদের জননীদেবী, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া ও বিশেষভাবে মিসেস্ গুপ্তার তত্ত্বাবধানে ছিল। যামিনী যখন বার্লিনে সেই সময়ে (৬ই জুলাই তারিখে) টাইফয়ড রোগে তাহার মৃত্যু হয়। উহার মৃত্যুতে যামিনী দারুণ ব্যথা পাইবেন জানিয়া আমরা সকলেই শঙ্কিত হইতেছিলাম, এবং তাহার রোগের সময় যাহাতে চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার কোনই ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে সাবধান ছিলাম। সে সময়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধীর ইংলণ্ডে ছিলেন।

২

বিদেশে ভগিনী একাকিনী এই আকস্মিক শোক-সংবাদে অভিভূত হইয়া পড়িবেন এই আশঙ্কায় তিনি পত্রে না লিখিয়া, স্বয়ং বার্লিনে গিয়া মুখে তাঁহাকে খবরটি শুনাইলেন এবং সান্ত্বনা ও সহানুভূতি দিবার জন্য কাছে রহিলেন। সন্তান-বিয়োগ গর্ভধারিণী জননীর যে অসহ্য বেদনা, দৈহিক সম্পর্ক বিনাও এই চিরকুমারীর মাতৃত্বরসে ভরা নারীহৃদয় সেই বেদনায় একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। পড়াশুনায় আর কিছুতেই মন দিতে পারিলেন না, সুতরাং দেশে ফিরিয়া আসাই সমীচীন মনে হইল। তখনকার মানসিক অবস্থা—শোকের প্রচণ্ড আঘাতে হৃদয়ের হাহাকার, ঈশ্বরের করুণা ও কল্যাণময়ত্বের প্রতি ক্ষণিক সন্দেহ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব এবং অবশেষে ঈশ্বর-চরণে আত্মসমর্পণ, এ সকলের পরিচয় তাঁহার গোপনে রক্ষিত স্মৃতিলিপি ও দুই একটি ইংরাজী রচনা হইতে সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। দেশে ফিরিবার সময় দীর্ঘ সমুদ্রপথে নির্জ্জনে আপনার বেদনা, অনুযোগ, অভিযোগ সমুদয় পরম-জননীর চরণে লইয়া গিয়া, প্রাণে তাঁহার সান্ত্বনাবাণী শুনিয়া, ক্রমশঃ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী রচনায় এই বাণীশ্রবণ স্বপ্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা স্মৃতিলিপির কিয়দংশ ও ইংরাজী রচনার যথাযথ (literal) অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রের একটা দিক্ সুব্যক্ত হইয়াছে। শৈশবের ও বাল্যের স্নেহ বুভুক্ষা যাহা কোনদিন কেহ তাঁহার মুখে শোনে নাই, এই শোকের আঘাতে ভগবানকে তাহা জানাইয়াছেন এবং নির্জ্জনে গোপনে লিপিমুখেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

"১লা আগষ্ট—

আজ এক সপ্তাহ হইল আমার ভুটুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছি। পৃথিবী সর্ব্বদা যেমন চলে তেমনি চলিতেছে, কিন্তু আমার যেন এই চিরপরিচিত পৃথিবীকে অপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে।...

কতবার মনে হইতেছে—সবই কি স্বপ্ন নয়? আবার এক এক সময় নিজের মস্তিষ্কবিকৃতি হইল না-কি বলিয়াও ভয় হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এই, বিদেশে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে, যেন কিছুই হয় নাই এইরূপ ব্যবহার করা। যদি একলা এক ঘরে পড়িয়া থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধহয় শরীর ও মনের উপর এতটা জোর করিতে হইত না। দুই দিন ত চোখের জল কিছুতেই একটু ক্ষণের জন্যও থামাইতে পারি নাই। কি কঠিন আঘাতই পরমেশ্বর দিলেন। কখনও স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই। কোথায় তাহাকে সুস্থ সবল দেখিবার আশায় বাড়ী যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছি, যেখানে যাহা দেখিতেছি, তাহার জন্য সংগ্রহ করিতেছি, কত জায়গার কত গল্প বলিব ভাবিতেছি—আর কোথায় সে চলিয়া গেল! যতী এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার পরে ভুটুকে যখন বাড়ী* আনিলাম, পিতা মহাশয় বলিলেন যে মেয়েটির ভাগ্য ভাল, এত অল্প বয়সে কেহ এত দূরের দেশ দেখে না। ভাগ্য ভালই, শুধু পৃথিবীর দেশই যে দেখিয়াছে তাহা নহে, স্বর্গরাজ্যে গিয়াও সেখানকার শোভা-সৌন্দর্য্য আমাদের পূর্ব্বেই উপভোগ করিতেছে। এখানেও তো কত জায়গায়ই গিয়াছে। কতবার নেপাল গিয়াছে, হাজারিবাগে গিয়াছে, পুরীতে গিয়াছে, ঢাকায় গিয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে তাহার শৈশবস্মৃতি যেন সুখের হয়, যাহা দর্শনীয় ও শিশুজীবনের উপভোগ্য সবই যেন তাহার জীবনে ঘটিয়া উঠে, বিধাতার কৃপায় তাহা সফল হইয়াছে।

* * * * *

সময়ে সময়ে শরীর যখন অবসন্ন বোধ হইয়াছে, ভবিষ্যতে কার্য্য করার সক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়াছে, গত দেড় বৎসরের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বুঝি বৃথাই হয়, মনে হইয়া আক্ষেপ করিয়াছি, তখনই ভুটুর কথা মনে হইয়া সমস্ত আক্ষেপ থামিয়া গিয়াছে। নিজের শক্তিতে যদি না কুলায় ভুটু আছে, আমার সমস্ত সাধ্য ও শক্তি দিয়া তাহাকে সুশিক্ষা দিব, সে আমার অসমাপ্ত ও আকাঙ্ক্ষিত কাজ সব শেষ করিবে। যেদিন typhoid fever হইয়াছে খবর পাইলাম (তাহার পূর্ব্বেই সে নশ্বর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল) তখনও কেন পরমেশ্বর আমার মনে presentiment আনিয়া দিলেন না? আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। ছেলেমানুষ, typhoid fever, তবে বুঝি অব্যাহতি নাই। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই, চক্ষুর জলে বালিস সিক্ত হইতেছিল। ভোরের বেলায় পরমেশ্বরের দয়ার কথা মনে হইয়া সান্ত্বনার ভাব আসিল। যিনি এতদিন এত করুণা করিয়াছেন, যাঁহারই বিধানে কোথাকার অশিক্ষিত দরিদ্রসমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ গৃহ হইতে এমন শিশু পাইলাম, কেমন করিয়া তাঁহার করুণায় অবিশ্বাস করিতেছি? তিনি কি আমার হৃদয় দেখিতেছেন না? তিনি কি আমাকে মাতা অপেক্ষাও বেশী স্নেহ করেন না? তিনি কখনই আমাকে এমন আঘাত দিবেন না। তিনি যে আমার নিকট হইতে তাহাকে লইয়া যাইতে পারেন, এই চিন্তার জন্য পর্য্যন্ত নিজকে অকৃতজ্ঞতা দোষে অপরাধী মনে করিয়া কতই অনুতাপ করিলাম।

---

* কলিকাতার বাড়ী।

*   *   *   *   *

ভুটুর প্রতি আমার স্নেহের আকর্ষণ দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইতাম। ছোট একটি শিশুর জন্য এতদূর চিন্তা! নিজের কথা না ভাবিয়া তাহারই ভবিষ্যৎ চিন্তা দেখিয়া আমি অনেক সময় পরমেশ্বরকে আমার হৃদয় এইরূপ প্রসারিত করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছি। তাঁহার হাত বিশেষভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি হইয়াছে মনে করিয়াছি। ইয়োরোপখণ্ডে আসিয়া রমণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকটা নূতন ধারণা হইয়াছে, স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া সমাজ সংস্করণ বিষয়ে সচেষ্ট হইব মনে করিয়াছি। ভুটুকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছি। আমাকে দিয়া কোন কাজ না হইলেও তাহাকে দিয়া হইবে আশা করিয়াছি।”

হায় রে মাতৃস্নেহ! হায় রে নারী হৃদয়ের চরম আকাঙ্ক্ষা—আমার সাধ্যাতীত সাধনায় আমার সন্তান সিদ্ধিলাভ করুক! সংসারের কোন জননী না চাহেন, সন্তান তাঁহার চেয়েও কৃতী হয়? কিন্তু এখানে জননী না হইয়াও পালয়িত্রীরূপে সেই আত্মবিলোপী স্নেহ দেখিয়া মনে হয়, নারীত্বের সহিত মাতৃস্নেহ একান্তই অবিচ্ছেদ্য।

P & O. S. N. Co
S. S. China

“২০শে আগষ্ট—

আমার উপরে সমুদ্রের এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব।

জাহাজখানা জিব্রল্টারে আসিয়াছে। অধিকাংশ যাত্রী ষ্টীমলঞ্চে চড়িয়া বন্দর দেখিতে গিয়াছেন। চারিদিকে বিষম ব্যস্ততা আর নানা রকমের বিষম শব্দ। লোকেরা দ্রুতপদে চলিতেছে, ভারী লগেজ সব উত্তোলিত হইতেছে, মেইলব্যাগ রওনা হইতেছে।

জাহাজের যে দিকটা বন্দরের দিকে সেই দিকেই এই ভিড় ও গোলযোগ, কিন্তু বিপরীত দিকে এসব নাই। ও দিকে প্রখর রৌদ্রতাপ, আর এদিকে সবই শীতল ও নিস্তব্ধ। আমি এক লস্করকে আমার ডেকচেয়ারটা এই দিকে আনিয়া দিতে বলিলাম। সেখানে বসিয়া আমি জলে ছোট ছোট ঢেউয়ের খেলা দেখিতে লাগিলাম। আমার পীড়িত ও উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী ধীরে ধীরে যেন স্নিগ্ধ ও শান্ত হইয়া আসিল। আজ এক মাস ধরিয়া আমার হৃদয় সন্তপ্ত, অশান্ত ও বিদ্রোহী। আমার ছোট্টটির* মৃত্যুসংবাদ আমাকে ভীষণ আঘাত করিয়াছে। আমি তাহার কাছে কবে ফিরিয়া যাইব বলিয়া দিন গুণিতেছিলাম। আজ প্রায় সতের মাস হইল আমি ইণ্ডিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছি, আর সেই অবধি এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার জন্যই পড়ি, অথবা দেশ-বিদেশ দেখিয়াই বেড়াই, আমার মন ছিল তাহারই কাছে। ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে তাহাকে শিক্ষা দিব, মনে মনে কত ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতেছিলাম। আমি তাহার জন্য কত বই, কতরকম ছোট ছোট জিনিষ কিনিয়া রাখিয়াছি, যখন যেখানে গিয়াছি সেখানকার পিক্‌চার পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করিয়াছি, যেন ফিরিয়া গিয়া সে সকল স্থানের বিস্তৃত বিবরণ তাহাকে দিতে পারি, সেই জন্য। বাড়ী ফিরিবার দিন যত

---

* My little one কথার এই অনুবাদ করা গেল।

নিকটতর হইতেছিল ততই সেদিন কত আদরে, কত আনন্দে অভ্যর্থিত হইব সেই দৃশ্য কল্পনা করিয়া মনকে সুখী করিতেছিলাম। আমি দেখিতেছিলাম আমার প্রিয়জনেরা একত্র হইয়া গাড়ীবারান্দার দিকে চাহিয়া সিঁড়ীগুলির উপরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছেন আর আমার ছোট্টটি নাচিয়া বেড়াইতেছে। যেমন আমার গাড়ীখানা গাড়ীবারান্দায় ঢুকিল সে আনন্দে মা-মা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, নামিতে না নামিতে আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অন্যেরা তাহাকে এই অধৈর্য্যের জন্য তিরস্কার করিতেছেন, শুনিলাম। বাড়ী ফিরিবার দিনের এই স্বপ্ন আমাকে কতই না আনন্দ দিয়াছে।

ভগবান আমাকে এই বিদেশে এমন নিরাপদে রাখিয়াছেন সেই জন্য আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ ছিল। তিনি আমার এত কল্যাণ করিয়াছেন, তাই আমিও সংকল্প করিযাছিলাম যে, আমি প্রাণপণ শক্তিতে তাঁহার সেবা ও মানবজাতির সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমি সারাজীবন নিঃসঙ্গ, নিপীড়িত। কিন্তু এই ইয়োরোপ প্রবাসের সফলতার পর—তাঁহার এই এত করুণালাভের পর, আমি আর তো অভিযোগ করিতে পারি না। আর আমার নিঃসঙ্গতার দুঃখ থাকিবে না, আমার ছোট্টটি যে আছে, সে যে আমার জীবন মধুময় করিবে। আমি শিশুকালে চিরদিন একলা ছিলাম। আমার প্রকৃতিটা কেহ বুঝিত না, কেহ আমাকে আমার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিত না। একটুখানি মিষ্ট ব্যবহারের জন্য আমি কত লালায়িত ছিলাম, কিন্তু কেহ তাহা জানে নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা চাপা স্বভাবের বালিকা গড়িয়া উঠিলাম। আমার ব্যবহার নিতান্ত শুষ্ক হইয়া উঠিল, লোকে আকৃষ্ট না হইয়া দূরে সরিয়া যাইত। আমার মানুষ-ভাই-বোনদের প্রতি বিরাগ বা বিদ্বেষবশতঃ এরূপ হইয়াছে, তাহা নহে ; ইহার মূলে ছিল আমার অতিরিক্ত সংকোচ বা লাজুকতা এবং নিজের সম্বন্ধে হীনতাবোধ। সে যাহা হউক, এতকাল পরে আমি ভাবিতেছিলাম যে, অবশেষে আমিও সুখী হইতে যাইতেছি, আমি সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইতে চলিয়াছি।

এমন সময়ে অকস্মাৎ আমার ছোট্টটির মৃত্যুসংবাদ আসিল। সব যেন ছিন্ন চূর্ণ হইয়া গেল। কি যে হইয়াছে সম্যক্ উপলব্ধি করিতেও পারিলাম না। এও কি হয়, ভগবান্ আমার এইটুকু সুখে বাদ সাধিবেন? আমার তো নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। অন্যেরা জীবনে কত সুখ সম্ভোগ করে। তাহাদের কত বন্ধুবান্ধব, কত ভালবাসা, কত টাকাকড়ি, হাজারো রকমের কত কিছু আছে। আমার কিছুই ছিল না। আমি খাটিয়াছি অন্যদের সুখী করিবার জন্য ; যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা অন্যদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে। নিজের জন্য অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সর্ব্বদা সকল বিষয়ে নিজের প্রতি কার্পণ্যই করিয়াছি। আমার কোনকালে অশন, বসন ও অলঙ্কারের জন্য অর্থব্যয় করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। অনেক সময় পুস্তক কিনিতে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার সে আকাঙ্ক্ষাও আমি পূর্ণ হইতে দিই নাই। আমি ইয়োরোপে আসিবার জন্য যে বৃত্তি চাহিয়াছিলাম, তাহার কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ ভাল বেতনে বড় চাকরী পাইলে আমার ছোট্টটিকে খুব ভাল শিক্ষা দিতে পারিব, দ্বিতীয়তঃ নারী জাতির পদগৌরব বাড়াইতে পারিব। এতদ্ভিন্ন জ্ঞান লাভ ছিল অপর উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের জন্য কিছুরই আবশ্যক ছিল না। এখন দেখিতেছি

আমার সকল উদ্যম, সকল পরিশ্রম নিষ্ফল হইল।

আমার প্রতি অদৃষ্টের অবিচারের কথাই বার বার মনে হইতেছে। আমার প্রতি এতবড় নিষ্ঠুর আচরণের জন্য ভগবানকেও আমি দোষী করিতেছি। আমার শোকাচ্ছন্ন মন স্বভাবতঃই বিকল হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানকেও বিচার করিবার স্পর্দ্ধা রাখি বলিয়া যেন একটা অস্বাভাবিক গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। হায়রে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবত্বের অহঙ্কার!

লণ্ডনে প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক জিনিষ আমাকে উত্ত্যক্ত করিত। বেচারা সুধীর যথাসাধ্য আমাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিয়াছে ; আমি কিন্তু তাহার প্রতি প্রথম প্রথম বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু তাহার মিষ্ট স্বভাব ও ধৈর্য্য আমাকে ক্রমে জয় করিয়াছে। আমি যতক্ষণ তাহার কাছে থাকিতাম মুখে প্রফুল্লতা দেখাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তখনও হৃদয়ের মধ্যে শোকের দংশন সমান ভাবেই পীড়া দিত।

সমুদ্র আমার মনের উপর আশ্চর্য্য মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। আমার হৃদয় যেন জুড়াইয়া দিতেছে। আমি যে কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা বুঝাইয়া দিতেছে ; ওর স্নেহমধুর স্বরে আমাকে বলিতেছে—'ওরে অবুঝ, ভগবান্‌কে বিচার করিতে বিচারকের আসনে বসিয়াছ?' তাইতো! এই যে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান লইয়া এত অহঙ্কার, এ জ্ঞান কোথা হইতে পাইলাম? এ যে সেই মঙ্গলময় মহান্ পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞানের ক্ষুদ্রতম কণিকা মাত্র। কি স্পর্দ্ধা আমার, আমি তাঁহার মঙ্গল ভাবের অতল রহস্য উদ্ভেদ করিতে চাই?

আজ সমুদ্র আমাকে ঘুমপাড়ানিয়া গান গাহিয়া স্বপ্নরাজ্যে পাঠাইয়াছিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি আমাদের জীবনদাতা মহান্ পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। আমি ঠিক দৃষ্টি দ্বারা দেখি নাই, কিন্তু আমি তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিতেছিলাম, তাঁহার স্বর শ্রবণ করিতেছিলাম। আমি 'স্বর' ও 'শ্রবণ' এই দুই শব্দ ব্যবহার করিতেছি কারণ ঠিক কি করিয়া মনের অনুভূতি বুঝাইব জানি না। মানুষের ভাষায় কেবল এইরূপেই তাহার প্রকাশ সম্ভব। সেই স্বর যেন বলিতেছিল—'বাছা, তুমি ক্লিষ্ট, তুমি অসুখী, তোমার হৃদয় সংশয় ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। আমি যদিও তোমার হৃদয়খানি ভাল করিয়াই জানি, তবু আমি চাই, তুমি আমার কাছে তোমার মনের সকল কথা খুলিয়া বল।'—আমি বলিলাম, তুমি কেন সকলের সঙ্গে একরকম ব্যবহার কর না? এ সংসারে কেহই সম্পূর্ণ সুখী নহে সত্য, কিন্তু তথাপি প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে কিছু না কিছু সুখ আছে, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আর কাহারও একটু সুখ আছে বলিয়া আমি যে অসন্তুষ্ট তাহা নহে। মানুষ যে পরিমাণে দুঃখ ভোগ করে, তাহার তুলনায় তাহার সুখটুকু অতি সামান্য। আমার যদি সাধ্য থাকিত, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এমন কি নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়াও অন্যের সুখ বৃদ্ধি করিতাম। আমার অভিযোগ এই যে, যে দুঃখ না দিলেও চলে, সেই অনাবশ্যক দুঃখ তুমি দিয়া থাক। আমার সেই ছোট্ট শিশুটি, সে তো কাহারও সুখের পথে বাধা ছিল না ; বরং সে ক্ষুদ্র জীবনটুকু এত সুখে ভরা, এমন আনন্দময় ছিল, যে, যে কেহ তাহার কাছে আসিয়াছে তাহারই উপরে আপনার আনন্দ-কিরণ বর্ষণ করিয়াছে। এমন একখানি জীবন আমার নিকট হইতে কেন কাড়িয়া লইলে? তুমি কি আমার হৃদয়ের শূন্যতা দেখিতেছ না? তুমি কি দেখিতেছ না, যে আমার যাহা কিছু শক্তি ছিল, আমার মধ্যে যাহা কিছু রাখিবার

মত ছিল, তুমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্তই লইয়া গিয়াছ? আমার মনে হয় আমার জীবনে আর কিছুই নাই। আমি একলা এই ভগ্ন হৃদয় লইয়া কিরূপে সংসারের সম্মুখীন হইব? তুমি চিরদিন আমার প্রতি কঠিন। যখন আমি শিশু ছিলাম, আমার মনে আছে, আমি আমার মাতার স্নেহ, মায়ের আদর-মাখা স্পর্শের জন্য কত ক্ষুধিত থাকিতাম, কিন্তু তাহা পাই নাই। যদি তুমি আমার স্নেহের ক্ষুধা না-ই মিটাইবে, তবে কেন এমন হৃদয় দিলে যাহা স্নেহের জন্য এত ব্যাকুল? কেন আমাকে স্নেহ-ভালবাসার অনুভূতি দিলে, অনুভূতিহীন অথবা উদাসীন করিলে না কেন? যদিও আমার হৃদয় প্রীতি ও সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল ছিল, তবু আমি সেজন্য অভিযোগ করি নাই, নিজের অদৃষ্ট লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেই চেষ্টা করিয়াছি। তারপর এই শিশুটিকেই ভালবাসিতে, পরম স্নেহে লালন পালন করিতে দিলে কেন, যদি বেশী দিন ইহাকে আমার কাছে না-ই রাখিবে? আমি এতকাল সব সহ্য করিতে পারিয়াছি, কিন্তু এই শেষ পরীক্ষা আমার সাধ্যের অতীত।

সেই জ্যোতিঃপুরুষ বলিলেন—'শোন বৎসে, কোন শুভ সাধনা নিষ্ফল হয় না। তুমি সত্য বলিয়াছ, তোমাকে কোমলতা, স্নেহ ও সহানুভূতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এ সকল মহত্তম মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করিবে। তোমার সমস্ত ভালবাসা কি তুমি আমাকে দিতে পার না?' আমি বলিলাম—তুমি এত মহান্, বুদ্ধির এমন অগম্য, তুমি চিন্ময় সত্তামাত্র, আমি তোমাকে আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়া তৃপ্তি পাই না। আমি তো বিদেহী আত্মা নই ; আমি একটা মানুষ মাত্র ; আমি যাহাদের ভালবাসি তাহাদের সুখ ও কল্যাণের জন্য আমি আমার সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিতে চাই। আমি এত ক্ষুদ্র, এত তুচ্ছ, তুমিও আমাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পার না, যেমন একজন মানুষ আর একজন মানুষকে ভালবাসিতে পারে। তাহা ছাড়া, মানুষের মধ্যই এ পৃথিবীতে যত সাধু মহাত্মা আছেন, তাঁহাদের তুলনায় আমি কোন্ ছার ; নিশ্চয়ই আমার চেয়ে তাঁহারাই তোমার প্রিয়তর। যে তুমি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর, সে তুমি কি আমার ছোট ছোট নিরাশার ব্যথা, আমার ব্যর্থ অনুশোচনা, দুঃখ দুর্ভাবনা শুনিবার জন্য একটুও আগ্রহযুক্ত হইবে? না-না, তুমি যে আমার পক্ষে অতিশয় মহান্, তোমার ভালবাসা আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। আমি এক অবস্তু সত্তা, একটি ভাব মাত্র লইয়া সুখী হইতে পারি না। আমি একটা মানুষের মত একজন চাই।

তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্তা অতি করুণার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—'অবুঝ হইও না, আমার দিকে চাও, আমার কথা শোন। তুমি আমাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পার না, কারণ আমি সমগ্র, আর তুমি আমার অংশ মাত্র। কিন্তু বিশ্বাস কর, যে, আমি—এই আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহা মানুষের সকল ভালবাসার চেয়ে বড়। আমার ভালবাসা তোমার সবচেয়ে অসম্ভব স্বপ্নেরও অতীত। আমি তোমার স্রষ্টা, তোমার জীবনদাতা, তোমার প্রেম ভিক্ষা করিতেছি। ওরে আমার অবোধ সন্তান, তুই বলিতেছিস্ আমি তোকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে জানি না, যেমন করিয়া মানুষ মানুষকে ভালবাসে? ভালবাসার ভাব কে মানুষদের দিয়াছে? সে যে আমি। কে ভালবাসা প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছে?—সে যে আমি। কোন মানুষ আমার ভালবাসার গভীরতা ও প্রসার ইয়ত্তা করিতে পারে না। আমি তোমাকে আমার জন্য চাহিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাকে সৃষ্টি

করিয়াছি। আমিই তোমার হৃদয় কোমল, স্নেহময় ও পরদুঃখকাতর করিয়াছি। তুমি তোমার বাল্যে বেশী স্নেহ পাও নাই সত্য, কিন্তু স্নেহের অভাবে আমি তোমার হৃদয়টুকু অনুভূতিহীন ও উদাসীন হইতে দিই নাই। আমি তোমার ব্যথিত, পীড়িত হৃদয়খানি আমার দিকে আকর্ষণ করিয়াছি। তুমি স্মরণ করিয়া দেখ, তোমার মনে পড়ে কি না, যে যদিও তুমি তখন ক্ষুদ্র বালিকা ছিলে এবং যদিও বালবুদ্ধিতে আমাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তথাপি তুমি অন্য সব শিশু হইতে একটু ভিন্ন রকমের ছিলে। তুমি আমার কাছে আসিয়া তোমার সমস্ত মনখানি খুলিয়া ধরিতে, আমার কাছে তোমার সব ছোটখাটো অভিযোগ ও নিরাশার ব্যথা লইয়া আসিতে। আর আর ছেলে মেয়েরা যেমন সান্ত্বনার জন্য মায়ের কাছে যায়, তেমনি করিয়া তুমি আমার কাছে আসিতে। কিন্তু শেষ দিকে তোমার মন কঠিন হইয়া যাইতেছিল, তাই আমি তোমার মনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই শিশুটিকে উপায়রূপে নিয়োগ করিয়াছি। তুমি এমন শুষ্ক কঠিন ও মনচাপা হইয়া যাইতেছিলে যে, তোমার মন পৃথিবীর দুঃখক্লিষ্ট ভাইবোনদের জন্য ক্লেশ অনুভব করিলেও সহানুভূতি প্রকাশে তুমি অক্ষম ছিলে। সহানুভূতির নির্ম্মল প্রস্রবণ মৌনতার কঠিন আবরণে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। যদি এই শিশুকে দিয়া সেই আবরণ অন্তরিত না করিতাম সে নির্ঝর একেবারেই শুষ্ক হইয়া যাইত।

'শিশুর মৃত্যুতে তুমি নিদারুণ শোক পাইয়াছ। কিন্তু আত্মা যে অমর। সে তো সত্যই মরে নাই, তাহার স্মৃতি নিরন্তর তোমার সঙ্গে থাকিবে। তাহার এখানকার জীবন সুখময় ছিল, তাহারই উদ্দেশে তুমি আর কোন শিশুকে সুখী করিতে চেষ্টা কর, তবেই পৃথিবীর পক্ষে মৃত হইয়াও সে তোমার অন্তরে কল্যাণ কর্ম্মের অনুপ্রাণনা হইয়া থাকিবে।

'আমি জানি তুমি এই শিশুর চরিত্র গঠন করিবার জন্য কত উপায় কল্পনা করিয়াছ। তোমার পরিমিত বুদ্ধিতে যতটা সম্ভব, তাহাকে তুমি নিখুঁত করিয়া গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলে। তোমার ক্ষুদ্র কল্পনা ব্যর্থ হইল বলিয়া তোমার মন নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তুমি কি বোঝ না, যে, আমি তোমার চেয়ে তাহার ভাল অভিভাবক। আমি যে তোমার দায়িত্বভার ঘুচাইয়া তাহাকে আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করিলাম সেজন্য আনন্দিত হও।

'তুমি তোমার সমস্ত জীবনের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত কর, দেখ, আমি তোমাকে কত যত্নে রাখিয়াছি, তোমাকে প্রত্যেক পাপপ্রলোভনের আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়াছি। তোমার ব্যক্তিগত জীবনে তুমি কোন সুখ পাও নাই বলিয়া অভিযোগ করিতেছ। তুমি বলিতেছ, এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু সুখ পায় ; কিন্তু সুখ যে কি, সে বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ধারণা। তোমায় যাহারা জানে, যাহারা তোমার বন্ধু, তাহারা প্রায় সকলেই বলিবে, তোমার জীবন অবিমিশ্র সুখের জীবন। যাহার যে বেদনা তাহা কেবল তাহার আপন হৃদয়ই জানে। তোমার ভিতরে সহানুভূতির জন্য যে ক্ষুধা ও তাহার অভাবে যে দুঃখ, তাহা অপরে কল্পনা করিতেও পারে না। তাহারা কল্পনা করিতে পারে না, এক একটি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ তোমার প্রাণে কি শূন্যতা, কি কঠিন বেদনা রাখিয়া যাইতেছে। হৃদয় যখন নিরানন্দ তখনও মানুষকে হাসিমুখে বেড়াইতে হয়, দেখাইতে হয়, যেন কিছুই

হয় নাই। আমি ভিন্ন মানুষের হৃদয়ের বেদনা আর কেহ দেখিতে পায় না। তাই, অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া তোমার নিজেকে দুঃখী মনে করা একটা ভুল। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই। তুমি কি আমাকে তোমার সমস্ত হৃদয়খানি দিবে না?'

সুমিষ্ট রাগিণীর মত সেই স্বর আমার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল, আমার হৃদয় বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল, আমি কাঁপিতে লাগিলাম। তাহার পর সহসা এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও অপূর্ব্ব বাৎসল্যরস আমাকে অভিষিক্ত করিল।

ঠিক এই সময়ে ষ্টীমলঞ্চ প্রত্যাগত যাত্রীদের লইয়া জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া লাগিল। আগন্তুকদের সোল্লাসধ্বনি, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিয়া প্রথমতঃ আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না আমি কোথায় আছি। তাহার পর সকল কথা মনে হইল। কিন্তু অনুভব করিলাম আমার হৃদয় এক অপূর্ব্ব শান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে।"

৩

১৯১২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া কিছুদিন কলিকাতা থাকিয়া হাজারিবাগে আমার কাছে আসিলেন। এখানে মহিলা শিল্প-সমিতির সম্পাদিকার বিশেষ আগ্রহে তিনি স্থানীয় মহিলাগণের নিকট তাঁহার ইয়োরোপ যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। জাহাজে ইংরাজ নারীদের সায়াহ্ন পরিচ্ছদ (evening dress) ও নৃত্যাদি তাঁহার ভাল লাগে নাই, সুরুচিসঙ্গতও মনে হয় নাই। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে যে অত্যধিক ইংরাজানুকরণ স্পৃহা দেখা দিয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমার অনুরোধে তিনি তাঁহার পথের ও প্রবাসের একটি ধারাবাহিক বিবরণ লিখিতে স্বীকৃত হন, এবং অল্প কিছু লিখিয়াছিলেন। হয় তো বেশীও লিখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার কাগজপত্র সম্প্রতি যাহা পাইয়াছি তাহা অল্প এবং অসম্পূর্ণ। একটি খৃষ্টান মহিলার যে বিবরণ দিয়াছেন স্থানান্তরে তাহা উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

নবেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে আমি তাঁহাকে ও আমার পুত্রগণকে লইয়া সুবর্ণরেখা প্রপাত বা হুড্রু ফল্স্ দেখিতে গিয়াছিলাম। এই যাত্রাটি আমার স্মৃতিতে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে, ১৮৯০ সনের বড়দিনের ছুটীতে যখন নর্ম্মদা-প্রপাত দেখিতে যাই, তখন যামিনীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। ১৯০৯ সনে স্বাস্থ্যশোধনের জন্য উভয়ে একত্র পুরীধামে ছিলাম। তথা হইতে একসঙ্গে ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি এবং রম্ভা হইতে চিল্কা হ্রদ দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রাচীন তীর্থস্থান, প্রকৃতির মহান্ ও সুন্দর দৃশ্য এবং মানবের গৌরবময় শিল্পসৃষ্টি প্রিয়জনের সহিত একসঙ্গে দেখিবার আনন্দ যে কি, তাহা জানিয়াছি। এবার মনে উৎসাহ থাকিলেও আমার দেহে পূর্ব্বের বল ছিল না; প্রপাত দেখিয়া যামিনীও তেমন বিস্ময় ও আনন্দ-প্রকাশ করেন নাই, যেমন তেইশ বৎসর পূর্ব্বে নর্ম্মদা প্রপাত দেখিয়া করিয়াছিলেন। ইহার এক কারণ, ইতিমধ্যে নেপালের পথে তিনি অনেক ভীষণ ও সুন্দর প্রপাত দেখিয়াছেন। সে যাহা হউক, ছেলেদের এই দর্শনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইতে পারিলাম এবং যামিনীকেও সঙ্গে পাইলাম, ইহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু এই আনন্দ সহসা আতঙ্ক ও বিষাদে পরিণত হইল। হুড্রু হইতে ফিরিয়া

আসিয়াই আমার পুত্র অশোক পীড়িত হইল। যামিনী অতি অল্পক্ষণ দেখিয়াই রোগ Appendicitis বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং ওখানকার Civil Surgeon Major Stevensকে ডাকিতে বলিলেন। তিনিও যামিনীর সহিত একমত হইলেন। উভয়েই বলিলেন, এবারকার মত ব্যথা ভাল হইয়া গেলেই অবিলম্বে অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক। যামিনী আরও বলিলেন—দ্বিতীয়বারের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিবেন না, দ্বিতীয়-বারে এ রোগের আক্রমণ বিপদ্জনক হয়। যামিনী এবার ইহাকে সুস্থ দেখিবার পরই কলিকাতা গেলেন, মেজর ষ্টিভেন্সও ওখান হইতে গয়া বদলী হইলেন। আমি বড়দিনের ছুটীতে ছেলেদের লইয়া কলিকাতা আসিলাম এবং অস্ত্র করিবার জন্য কোন প্রবীণ বাঙ্গালী সার্জ্জনকে ডাকিয়া অশোককে পরীক্ষা করাইলাম। তিনি বলিলেন—আমি এপেণ্ডিসাইটিসের কোন চিহ্নই পাইতেছি না ; কেন এত বড় একটা অপারেশনের ঝুঁকি লইতেছেন?—যামিনী আমাকে একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"Rotunda Hopsitalএ থাকিতে একবার একটি রোগিণী এই রোগ আছে কিনা পরীক্ষা করাইতে আসে। অধ্যাপক আমাকে বলিলেন—ইহাকে পরীক্ষা করুন।—আমি পরীক্ষা করিয়া বলিলাম—হাতে তো কিছু ঠেকিতেছে না। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা Chloroform দেওয়াইয়া দেখুন দেখি?—Chloroform করাইবার পর দেহ যখন শিথিল হইয়া পড়িল, তখন পেট টিপিয়া Appendix পাইলাম।"—এই কথা মনে থাকাতে আমি ডাক্তারকে বলিলাম—"যামিনী তো বলেছেন, কোন কোন সময়ে হাতে ধরা না পড়্লেও, Chloroform দেবার পর Appendicitis হয়েছে কি না ধরা পড়ে।" প্রবীণ ডাক্তারটি বলিলেন—"আমি ওর প্রত্যেক স্নায়ু হাতে অনুভব করছি (I can feel his every nerve) ; এখন তো কিছু নাই। যদি আবার হয় আমি এসে অস্ত্র কর্‌ব।"—বয়সে ও অভিজ্ঞতায় জ্যেষ্ঠ (Senior) বলিয়া যামিনী তাঁহার মুখের উপর কিছু বলিলেন না। আমারও দ্বিরুক্তি করিবার পথ রহিল না। কিন্তু চারি মাস পরেই অশোক অসহ্য বেদনায় আক্রান্ত হইল। যামিনীকে সংবাদ দেওয়া হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ সার্জ্জনকে সঙ্গে লইয়া তিনি হাজারিবাগে আসিলেন বটে কিন্তু অস্ত্রপ্রয়োগের পর দেখা গেল বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে (It was too late) ; ইতিমধ্যে ভিতর এমন পাকিয়া গিয়াছে, আর কিছু করিবার সাহস হইল না। কর্ত্তিত অংশ সেলাই পর্য্যন্ত করা হইল না, কোনরকমে ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখা হইল। অস্ত্রপ্রয়োগের পর দুই রাত এক দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বালক প্রাণত্যাগ করিল।

যাঁহারা নিয়তি বা বিধিলিপি বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলিবেন, যাহা হইবার ছিল হইয়াছে। কিন্তু যথাকালে অস্ত্রপ্রয়োগ হইলে হয়তো এ শোক-ঘটনা ঘটিত না, এই চিন্তা আমার মন হইতে আমি একেবারে দূরে করিতে পারি নাই। এ বিষয়ে আরও একটি পুরুষ ডাক্তার দায়ী ছিলেন। তিনি হাজারিবাগের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন। প্রথম দিনে তাঁহাকে ডাকা হয়, কিন্তু সেদিন তিনি ও আসিষ্টান্ট সার্জ্জন সহরের বাহিরে কোন 'কেসে' গিয়াছিলেন। সারা রাত্রি বালকের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া, অগত্যা ডাবলিন মিশনের মহিলা ডাক্তার কুমারী জেলেট এম. ডি'কে ডাকিলাম। তিনি বলিলেন—অবিলম্বে অপারেশন আবশ্যক। তিনি সেখানে থাকিতে থাকিতেই সিবিল সার্জ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং

রোগী দেখিয়া বলিলেন—"না, তত খারাপ নয় ; দেখা যাক্ আজ কেমন থাকে ; বোধ হয় অপারেশন দরকার হবে না।" ডাক্তার জেলেট তাঁহার নিজের 'কেস্' নয় বলিয়া, ডাক্তারদের রীতি (etiquette) অনুসারে চুপ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা প্রথম দিনই কলিকাতায় রোগের সংবাদ দিয়া সার্জ্জন ঠিক করিয়া যামিনীকে প্রস্তুত থাকিতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, এদিন জানাইলাম, সিবিল সার্জ্জন মনে করেন operation অনাবশ্যক। একজন Sub-assistant Surgeonকে সর্ব্বক্ষণ কাছে রাখা হইল, অবস্থা বুঝিয়া Civil Surgeonকে খবর দিবার জন্য। সন্ধ্যার পর অবস্থা আরও খারাপ হইল, Civil Surgeon খবর পাইয়াও আসিলেন না, পূর্ব্বমত ঔষধ দিতে বলিয়া পাঠাইলেন—সেদিন নাকি ক্লাবে নাচ ছিল। পরদিন প্রত্যূষে, সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসককে লইয়া অবিলম্বে রওনা হইবার জন্য যামিনীকে তার করা হইল। ওখানকার শ্বেতাঙ্গ সিবিল সার্জ্জনটি অস্ত্রব্যবহারে সুদক্ষ ছিলেন না, তাঁহার বাঙ্গালী এসিষ্টান্টটি তখনও ফেরেন নাই, সেই জন্যই অপারেশন অনাবশ্যক বলিয়াছিলেন। তিনি আপনার অযোগ্যতা স্বীকার করিলে একদিন আগেই কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনা যাইত, অথবা তিনি ডাক্তার কুমারী জেলেটকে সহকারিণী রূপেও পাইতে পারিতেন। অনেকেই পুরুষ ডাক্তার হইতে নারী ডাক্তারদের হীন মনে করেন। কিন্তু আমি হাজারিবাগের দুইটি নারী চিকিৎসক Miss Omeara M.D. এবং Miss Eva Jellet M.D. (ইনি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও গ্রন্থকার Dr. Jelletএর নিকট সম্পর্কিতা) এবং আমার ভগিনী যামিনীকে অনেক পুরুষ ডাক্তার হইতে চিকিৎসায় এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি। ইঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান ও করুণা ইঁহাদিগকে রোগীর সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হইতে দেয় নাই। অবান্তর কথা হইলেও নারী আমি, এই নারী চিকিৎসকত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশের এই সুযোগ গ্রহণ করিলাম।

যামিনী অশোকের শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে যে 'অশোকস্মৃতি' পঠিত হয় তাহা তাঁহারি রচনা।

কিছুকাল স্বাধীনভাবে 'প্রাক্‌টিস' করিবার পর যামিনী Women's Indian Medical Service-এ চাকরী পাইয়া কলিকাতা Dufferin Hospital-এ অস্থায়ীভাবে কাজ করিতে লাগিলেন।

সমান যোগ্যতা সত্ত্বেও, এমন কি অধিকতর যোগ্যতা থাকিলেও, ইংরাজ বা ইয়ুরেশীয়ানদের সমান পদ, সমান সুখ-সুবিধা ও সম্মান ভারতীয়দের ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। অন্যদিকে দোষ-ত্রুটি ও অযোগ্যতা শ্বেতবর্ণের গুণে অনেক সময়েই মার্জ্জনা লাভ করে। তাই যখন ১৯১৪ সনের জুন মাসে কোন বিশেষ অপ্রীতিকর কারণে আগরার নারী হাসপাতালের তিনটি ইংরাজ নারী ডাক্তারকে বদলী করা নিতান্ত আবশ্যক হইল, শাস্তির ব্যপদেশে তাঁহাদের কেহবা সিমলা পাহাড়ে কেহবা অন্যত্র প্রেরিত হইলেন। আর সেই নিদারুণ গ্রীষ্মে যামিনীকে আগরা গিয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতে হইল। কিছুকাল একলাই তাঁহাকে তিনজনের কাজ সামলাইতে হইতেছিল। কিন্তু মাস ছয় পরে যখন পূর্ব্বের গোলমাল মিটিয়া গেল, ডিসেম্বর মাসের দুঃসহ শীতে যামিনী সিমলায় প্রেরিত হইলেন ; পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ কন্যারা আগরা ফিরিয়া বড়-দিনের উৎসব করিলেন।

আগরা বাসকালে দরিদ্র রোগিণীরা শতমুখে তাঁহার গুণ গাহিয়াছে এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। সহযোগিনী ইংরাজ মহিলা থাকিলেও সকলে 'শাড়ীওয়ালী ডাংদারিন সাহেবকে' চাহিত! কারণ, যতই ঘৃণাকর রোগ ও কষ্টকর চিকিৎসা হউক, এই শাড়ী-পরিহিতা তাহাদের স্বদেশিনী 'ডাংদারিন' কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না, তুচ্ছ করিতেন না, বরং রোগ যত অধিক কষ্টকর হইত দয়ায় তাঁহার হৃদয় তত অধিক আর্দ্র হইত। রাত্রে দূরে যাইতে হইলে, আগেই, কত টাকা দিবে বলিয়া দামদস্তুর করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। উপযুক্ত ফী দিতে অক্ষম জানিলে অনেকের কাছে তিনি টাকা লইতেন না, অল্প কিছু দিলে ফিরাইয়া দিতেন, কিছু লইতে কাতরে অনুরোধ করিলে, হাসপাতালের কোন আবশ্যকীয় আস্‌বাব ক্রয়ের জন্য তাহা লইয়া হাসপাতালের নামে জমা করিতেন। এইরূপে একটি ভাল অপারেশন টেবিল ক্রয় করা হয়।

সিমলায় আসিয়া দেখিলেন রিপন হাসপাতালের নিকট তাঁহার বাসের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ হাসপাতালের নিকটেই তাঁহার থাকা আবশ্যক। ঐ হাসপাতালের নীচের তালায় দুইটি কামরা বহুকাল হইতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তিনি সেই দুইটীকে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। প্রায় নয় মাস কাল এইভাবে কাটিবার পর, কেন ঠিক বলা যায় না, তিনি Inspector General of Hospitals এবং Civil Surgeon-এর বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। তাঁহার নামে এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হইল, যে, তিনি বিনা অনুমতিতে হাসপাতালের অংশ বিশেষ অযথা অধিকার করিয়া হাসপাতালের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও কার্য্যের ক্ষতি করিয়াছেন। ইহার উত্তরে তিনি জানাইলেন যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনীর আমল হইতে হাসপাতালের ঐ অংশ অব্যবহৃত পড়িয়াছিল। সেখানে কোন কাজ হইত না বলিয়া তিনি উহা নিজের ব্যবহারে লাগাইয়াছেন। তাঁহাকে ঐ প্রকোষ্ঠ দুটি ছাড়িয়া দিতে হইলে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনীকে বাড়ী ভাড়া বাবত অতিরিক্ত ১০০্ টাকা দেওয়া হইত, অতএব তাঁহাকেও অন্যত্র থাকিবার জন্য ১০০্ টাকা মঞ্জুর করা হউক, যদি তাহা না হয়, তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করা হউক। বস্তুতঃ তিনি যে রকম হীন আবাসে আছেন তাহা Women's Indian Medical Service-এর কোন মহিলার যোগ্য নহে।—বাড়ীভাড়া বাবত ১০০্ টাকা মঞ্জুর হইল না। তাঁহার বদলীর ব্যবস্থা করা যাইবে এই আশ্বাস দেওয়া হইল। হাসপাতালের জন্য একজন মেট্রনের নিয়োগেরও আবশ্যক তাহা যামিনী জানাইয়াছিলেন, সেজন্য মেট্রন ১০০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইল।

আসল কথা বোধ হয় এই, যে, একজন বাঙ্গালী নারী সিমলার মত বহু রাজপুরুষের বাসস্থানে, নারী হাসপাতালের অধ্যক্ষতা করেন, ইংরাজ মহলের উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী কোন কোন ব্যক্তির তাহা মনঃপূত হয় নাই। যামিনীর মধ্যে বড়মানুষ খুঁজিয়া মেলা-মেশা ও প্রিয় হইবার চেষ্টা একেবারেই ছিল না ; হাসপাতালের সুব্যবস্থা ও রোগীর চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য জানিতেন। একবার নাকি পাঞ্জাবের ছোটলাট-পত্নী লেডী ওডেয়ার হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিবার পর, যামিনী হাসপাতালের কোন কোন অভাব জ্ঞাপন করেন ও সে সকলের সুব্যবস্থা প্রার্থনা

করেন। সিমলার সিবিল সার্জ্জন মহাশয় ইহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। তিনি মনে করিলেন তাঁহাকেই প্রথমে জানান উচিত ছিল। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া, এ যেন তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইল। এদিকে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী মহলে যামিনীর প্রতিপত্তি ও লোকপ্রিয়তাও তাঁহার বিশেষ ভাল লাগে নাই।

যাহা হউক, যামিনী অগত্যা অন্যত্র বাড়ীভাড়া করিয়া হাসপাতালের উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইলেন। চিকিৎসার্থীর সংখ্যার বৃদ্ধি বশতঃ ক্রমে হাসপাতালের জন্য একটা নূতন ব্লক তৈয়ার হইল।

ডাক্তারের বাসস্থানও নূতন হইল ; কিন্তু সব রকমের যখন সুবিধা ও সুব্যবস্থা হইল, যখন সহরবাসীরা তাঁহার সুখ্যাতিতে মুখর, তখন শীতপ্রধান সিমলা শৈল হইতে তাঁহাকে সিন্ধুপ্রদেশের গ্রীষ্মপ্রধান শিকারপুর নামক স্থানে বদলী করা হইল এবং একজন ইংরাজ মহিলা তাঁহার স্থানে আনীত হইলেন। হাসপাতালের উন্নতি ও পরিবর্দ্ধনের প্রশংসাটা এই নবাগতাকে দিবার সুবিধা হইতেছিল, কিন্তু সমারোহ পূর্ব্বক নূতন ব্লক খুলিবার দিনে বড়লাটপত্নীর ও সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, এই হাসপাতালের উন্নতিকল্পে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তিনীই ধন্যবাদের পাত্রী। বড়লাট-পত্নী (Lady Chelmsford) চুপি চুপি কোন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়কে বলিতেছিলেন,— এতবড় হাসপাতালের পরিচালনের যোগ্যতা কিন্তু ভারতীয়াতে সম্ভব নহে। নবাগতা ডাক্তার মহিলা ও উক্ত সম্ভ্রান্ত ভারতমহিলা উভয়ের সহিতই আমার পরে আলাপ হইয়াছে, তাই এই সব সংবাদ পাইয়াছি। এই সময় আমি সিমলায় বাস করিতেছিলাম।

একবার যামিনীকে করাচি পাঠাইবার কথাও উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানে ডাক্তারের বাহিরের পশার খুব বেশী, সুতরাং ইংরাজ রমণীরই সেস্থান প্রাপ্য। দিল্লীতে নারীদের জন্য যে মেডিকেল কলেজ খোলা হইল কলিকাতা ডাফরিণ হসপিটালের ভূতপূর্ব্ব নেত্রী তাহার অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন ; শিক্ষাদাত্রী (Lecturer) রূপেও যামিনীর সেখানে স্থান হইল না।

শিকারপুরের ভীষণ গরম যখন অসহ্য হইল এবং শরীরে অনেক ফোড়া হইয়া কষ্ট পাইতে লাগিলেন, তখন একবার ছুটী লইলেন এবং সেন্ট্রাল কমিটিতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে আর ছয় মাসের মধ্যে বদলী না করিলে তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। তখন তাঁহাকে গয়া পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। ইতিপূর্ব্বে গয়ার লেডী ডাক্তার ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার সেন তাঁহার স্থানে আসিতেছেন শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটীর আবেদন প্রত্যাহার করিলেন। এই বঙ্গনারীর চিকিৎসানৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তার কথা অনেকেই শুনিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি বেহার প্রদেশে বেতিয়ার হাসপাতালে প্রেরিত হইলেন। এখানে তিনি আরামেই ছিলেন, কিন্তু এখানে কাজ বেশী না থাকাতে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যামিনী নিয়মিতরূপে তাঁহার দৈনিক চিন্তা বা কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার অবসরও বড় একটা মিলিত না। কিন্তু দেখিতেছি, শিকারপুর থাকিতে অনেক দিস্তা কাগজের একখানি প্রকাণ্ড খাতা করিয়া তাহাতে দৈনিক

মন্তব্য লিখিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। খাতাখানির প্রথম পৃষ্ঠায় সর্ব্বোপরি লিখিত—কেহ খুলিবেন না। তাহার নীচে নিজের নাম এবং তাহারও নিম্নে Teach me to Live শীর্ষক একটি ইংরাজী কবিতা উদ্ধৃত।

Teach me to live ! 'T is far easier to die,
Gently and silently pass away
On earth's long night, to close the heavy eye
And waken in the glorious realms of day,

Teach me the harder lesson—how to live,
To serve Thee in the darkest paths of life,
Arm me for conflict new, fresh vigour give
And make more than conqueror in the strife.

Teach me to live, Thy purpose to fulfil,
Bright for Thy glory let my taper shine,
Each day renew, remould this stubborn will,
Closer round Thee my heart's affections twine,

Tech me to live and find my life in Thee
Looking from earth and earthly thing away,
Let me not falter, but untiringly
Press on and gain new strength and power each day.

এই কবিতাটির মধ্যে তাঁহার অন্তরের নিভৃততম প্রার্থনার প্রতিধ্বনি ছিল, সেই জন্যই ইহাকে খাতার উপরে স্থান দিয়াছিলেন।

শিকারপুরে দুই দিন এবং বৎসরকাল পরে বেতিয়ায় মাত্র একদিন ইহাতে লিখিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন তাহাও জানাইয়াছেন। ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরের আর একটু ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম করিবার জন্য কেমন উন্মুখ হইয়া থাকিতেন, স্বদেশের অশিক্ষিতা রোগপীড়িতা নারীদের জন্য তাঁহার কত মমতা, কত দরদ ছিল, তাহাদের জন্য খাটিয়া কত আনন্দ পাইতেন, তাহাদের জন্য স্থানবিশেষে আরদ্ধ কর্ম্মের পূর্ণফল দেখিবার সুযোগ না পাইয়া কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, সে সকলের আভাস ইহার ভিতরে আছে, তাই ইহা সমগ্র উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা সাহিত্য হিসাবে দেখিবার নয়, সে ভাবে লেখাও হয় নাই। ইহা অপরের দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহা তিনি ক্ষণেকের জন্যও মনে করেন নাই। তাই গোপনীয় না হইলেও ইহা উদ্ধৃত করিতে আমার মন এবং হস্ত একটু সঙ্কুচিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহাকে পরিচিত করিবার জন্যই এই অপূর্ণ বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, যদি এতৎসম্পর্কে আমার অপরাধ ঘটে একান্ত অন্তরে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করি।

শিকারপুর থাকাই কর্ত্তব্য, কি না থাকা, এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই তিনি স্থির করিয়াছিলেন প্রতিদিন থাকার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত যুক্তি মনে উদয় হইবে সমস্ত

লিপিবদ্ধ করিয়া অবশেষে গুণিয়া দেখিবেন কোন্ পক্ষে যুক্তি অধিকতর হইল এবং সেই অধিকতর যুক্তির অনুযায়ী কাজ করিবেন।

যামিনীর যে লেখাটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে হাসপাতালের উন্নতির উল্লেখ আছে। যামিনী ১৯১৬ সনের মে মাসে শিকারপুর বদলী হন। ঐ বৎসর জুলাই মাসে সেন্ট্রাল কমিটীর সেক্রেটারী শিকারপুরের কলেক্টর ও স্থানীয় কমিটীর প্রেসিডেন্টকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

"সিমলা, ১১ই জুলাই, ১৯১৬

সেন্ট্রাল কমিটী শুনিয়া অতীব সুখী হইয়াছেন যে ডাক্তার সেনের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার্থীর সংখ্যা এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছে যে স্থানীয় কমিটী বর্ত্তমান হাসপাতালকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার অথবা সম্পূর্ণ নূতন একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। আপনাদের কমিটী যখন ডাক্তার সেনের কার্য্যে এত সন্তুষ্ট তখন হয়তো তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া ওখানে থাকিয়া যাইতে সম্মত করিতে পারিবেন। আপনারা তাঁহাকে রাখিতে চাহিলে সেন্ট্রাল কমিটী কোন আপত্তি করিবেন না।"

যামিনীর স্মৃতিলিপি হইতে উদ্ধৃত :

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭। শিকারপুর।

এবার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে মার্চ্চ মাসে কাজ ছাড়িয়া দিব। কাজ ছাড়িবার ইচ্ছা এত বলবতী ছিল যে আমার প্রয়োজনীয় অনেক instrument ও কাপড় ইত্যাদিও বাড়ীতে ফেলিয়া আসি। বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে কাজকর্ম্ম এত ভাল চলিতে লাগিল এবং গ্রীষ্মও না থাকাতে একটু একটু করিয়া এ জায়গা ছাড়িবার ইচ্ছা আমার চলিয়া যাইতে লাগিল। এখানকার হাসপাতাল অনেকদিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এই নয় মাসে যত কাজ হইয়াছে, এত কাজ কখনও হয় নাই। হাসপাতাল আশ্চর্য্য রকম popular হইয়াছে। গত মাসে paying patientদের নিকট হইতে ৯৩্ টাকা পাওয়া গিয়াছে। দিন ২্ টাকা ভাড়া দিয়াও ভদ্রলোকের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ঘর ভাড়া লইতেছে। ১৯১৫ সালে indoor patientদের সংখ্যা ছিল ২১৩, ১৯১৬ সালে ৪৭৮। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে maternity case সম্বন্ধে। ৫৩ জন রোগী ১৯১৫ সালে এখানে প্রসব হইতে আসে, কিন্তু ১৯১৬ সালে ৯৬ জন।

এখানে প্রসবের পর অধিকাংশ স্ত্রীলোকই septic হয়। মৃত্যু-সংখ্যাও খুব বেশি। আমি এই অল্পদিনের মধ্যেই ইহাদিগকে মৃত্যুর কারণ বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি। শিকারপুরের রমণীদের জন্য এই নয় মাস আমি যেমন খাটিয়াছি তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের বিশ্বাসভাজনও হইয়াছি। আরও কিছুদিন থাকিলে হয়তো ইহাদের আরও কিছু উপকার করিতে পারিব, এই বিশ্বাসে আমার থাকা প্রার্থনীয় একথা কখন কখন মনে হয়। এখানে থাকার দিক হইতে আরও এক কথা বলা যায়।—যেখানেই যাই না কেন, ইংরাজ থাকিবেই,

এবং যেখানে ইংরাজ সেইখানেই অবিচার ও অন্যায় influence। শিকারপুরে ইংরাজ নাই সেটা একটা খুব বড় সুবিধা। এই তো গেল এখানে থাকার পক্ষে। সিমলার কথা মনে হইলেই bitterness আসে। থাকার বিপক্ষেও অনেক কথা বলা যায়—

(১) বাঙ্গলা দেশ হইতে এ জায়গা এত দূরে।

(২) ভাষা না জানাতে, যতটা কাজ করা উচিত (অর্থাৎ সভা ইত্যাদি করিয়া) তাহা হইয়া উঠে না। তর্জ্জমা ইত্যাদি করাইতে অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হয়। হয়তো অন্য জায়গায় ইহা অপেক্ষা বেশী কাজ হইত।

(৩) হাসপাতালটাকে আমি এত popular করিয়া দিয়াছি যে, আমি চলিয়া যাইবার পরেও লোকে হাসপাতালে আসিবে। সুতরাং আমার কাজ বিফল হইবে না।

(৪) হাসপাতাল ছোট থাকার দরুণ, আমি যাহা করিয়াছি ইহার চেয়ে বেশী কাজ আর আপাততঃ করিতে পারিব না। নূতন হাসপাতাল তৈয়ার হইতে অন্ততঃ এক বৎসর দেড় বৎসর লাগিবে।

(৫) গ্রীষ্মের সময়কার অসহ্য গ্রীষ্মে আমার শরীর টিকিবে কি না?

(৬) চাকর-বাকরের কষ্ট অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি নিজের মন গত পাঁচ মাসে তো ঠিক করিতে পারিলাম না, কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে ঠিক করাই চাই সেই জন্য মনে মনে সংকল্প করিয়াছি যে এই এক মাস প্রতিদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া দিনের শেষে সেদিনকার মত এ স্থানে থাকা অথবা পরিত্যাগ করা, ইহার মধ্যে যাহা উচিত মনে হইবে সেটা লিখিয়া রাখিব এবং পরে কতটা থাকার পক্ষে ও কতটা বিপক্ষে তাহা গণনা দ্বারা যাহার সংখ্যা বেশী হইবে সেই অনুসারেই কাজ করিব। যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছি তাহা ছাড়া আরও দুইটি কারণ আমাকে influence করিতেছে। একটা মৌলবী সাহেবের অনুরোধ, লক্ষ্ণৌ গিয়া তাঁহার স্কুলের সাহায্য করা, দ্বিতীয়, ডাক্তার বসুর lecture যে আমি জীবনের যতটা উচিত ততটা সদ্ব্যবহার করিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন :—

You can do a lot of good if you want. You always keep yourself in the background. But India wants workers, specially women. If ladies like yourself come forward, we shall soon have things different from what it is at present. If you do not mind, I may tell you that you have no right to waste the gifts that have been given to you. Everyone's gifts are public property to be utilised for the good of the public and the needy.

আমি তো জীবনের সদ্ব্যবহারই করিতে চাই, কিন্তু কি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইবে সেইটাই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমিও চাই—To feel myself directed pardoned and sustained by the Supreme Power, to feel myself in the right road, at the point where God would have me be in order with himself and the universe. This faith gives strength and calm. I have not got it. All that is, seems to me arbitrary and fortuitous. It may as well be as not be. Nothing in my own circumstances seems to be providential. All appears to me left to

my own responsibility and it is this thought that disgusts me with the government of my own life.

Amiel's *Journal*.

কোন্ পথ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত পথ তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

প্রভো, তোমার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। প্রতিদিনই পথের উদ্দেশে তোমার কাছে কাতর প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

আজ শিকারপুর ছাড়িবার দিকেই মনটা বেশী ঝুঁকিতেছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে এই খাতাতে মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিতে প্রায় সাড়ে দশটা বাজিয়া যায়। আমি ৯॥০-টায় লিখিতে বসি।

ঘুম ভাল হয় নাই ; ঘুমের ভিতরেও বোধহয় এখানে থাকা উচিত কি উচিত নয়, এই কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়াছে, কেন না, সকালে ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্রই মনে হইল যেন শিকারপুর ছাড়িবার সব বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এই রূপ মন লইয়াই হাসপাতালে যাই। হাসপাতাল হইতে একটার পর ফিরি। ২টার সময় Mr. Moysey-র চিঠি পাইলাম। তাহাতে হাসপাতালের জন্য তিনি চেষ্টিত আছেন শুনিয়া একটু ভাল লাগিল। শিকারপুরের স্ত্রীলোকদের জন্য দুঃখ হয়। আমি জানি যে আমি এখান হইতে চলিয়া গেলে কেহই আমার মত ইহাদের জন্য feel করিবে না। আমার স্বভাব একটু অনন্যসাধারণ, অন্য লোকেরা নানারকমে জীবন enjoy করে, আমার কিন্তু কাজের কথা ছাড়া আর কিছুতেই প্রবৃত্তি নাই। সেই-জন্যই আমি সফলকাম হই।

আজ সকালে সিমলার কথা খুব মনে হইতেছিল। এক বৎসর চারিমাস ক্রমাগত কেমন করিয়া হাসপাতালের উন্নতি করিব এই চিন্তা এই চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করি নাই, ফলে হাসপাতালকেও popular করিলাম। কিন্তু তাহার ফল কি হইল?

পরবর্ত্তী প্রায় এক বৎসর পরের লেখা—

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮, বেতিয়া।

একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমায় আর বদলী সম্বন্ধে কিছুই করিতে হয় নাই! ২৮শে ফেব্রুয়ারী Dr. Balfour শিকারপুরে আসেন। তিনি আপনা হইতেই বেতিয়া বদলী হইবার সংবাদ দিলেন। এখানে বদলী হওয়াটা পরমেশ্বরেরই অভিপ্রেত ছিল। পথে মৌলবী সাহেবের মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। আসিবার অর্থাৎ শিকারপুর ছাড়িবার পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া রওনা হইতে বলিয়াছিলেন। লাহোরেই তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার স্কুলের কাজে লাগিব এই কথা ছিল। কিন্তু তিনি তো ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন যাঁহাদের হাতে স্কুল আছে তাঁহারা কিছু না বলিলে আমি কি করিব? কাহার উপর স্কুলের ভার তাহাও জানি না। সেখানে যাওয়া কি পরমেশ্বরের

অভিপ্রেত নহে? এক বৎসর এখনও বাকী আছে, দেখি কি হয়। U. P. তে বদলী হইবারও তো চেষ্টা করিয়াছি, কিছুই তো হইল না।

এখানে তো তেমন কিছু কাজ করিতে পারিতেছি না। বৃথাই সময় নষ্ট হইতেছে।

Those also serve who stand and wait. আমিও কি হুকুমের জন্য অপেক্ষা করিতেছি? এখানে তেমন কিছু কাজ যে হইবে তাহাও মনে হয় না।

বেতিয়াতে বাসস্থানের, আরামের এবং বিশ্রামের সর্ব্ব-প্রকার সুব্যবস্থা ছিল। যাহা সাধারণের বিশেষ বাঞ্ছনীয় তাহাই একটা অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল।

উদ্ধৃতাংশে 'মৌলবী সাহেবের' উল্লেখ আছে। ইনি ছিলেন একজন নারীহিতৈষী সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ইহাঁর পুরা নাম সৈয়দ কেরামত হোসেন। যখন ভগিনী প্রেমকুসুম বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়া এলাহাবাদে Crossthwaite Girls' School-এর প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন, এই প্রবীণ মৌলবী সাহেব তখন ঐ স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। এবং বোধ হয় সেইখানেই একবার নেপাল যাইবার পথে যামিনীর সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। ইনি পূর্ব্বে বারিষ্টার ছিলেন, পরে হাইকোর্টের জজ হন।

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারকে মৌলবী সাহেব তাঁহার নারীবিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য Women's Indian Medical Service-এর চাকরী ছাড়িয়া আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং আহূত ব্যক্তিও যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, স্মৃতি-লিপিতে ইহা পাঠ করিয়া প্রথমতঃ আমার একটু বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলাম। স্বদেশের নারীজাতির কল্যাণার্থ নিবেদিত এই জীবন চিরদিনই জীবন-দেবতার অঙ্গুলি সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় থাকিত। কোন্ পথে, কি ভাবে তাহার শিক্ষা, শক্তি ও সামর্থ্য সার্থক হইবে সে সকল নির্ণয়ের ভার এবারেও তাঁহার অবিচারপীড়িত ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত নিজের উপর রাখিতে চাহে নাই। বিশেষতঃ নারী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও অধ্যাপনাদির সহিত চিকিৎসা কার্য্যের স্বভাবতঃ কোন বিরোধ নাই, কেবল অর্থাগমের সম্ভাবনাই ছিল কম।

৪

বেহার হইতে বেরার প্রদেশে আকোলায় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল। সেখানে নূতন হাসপাতাল নির্ম্মিত হইবে ; তাহার যাহা কিছু ব্যবস্থা তিনিই নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার উপরে সমুদয় পরিদর্শনের ভার পড়িয়াছিল। আকোলায় তিনি স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে কাজ করিতেছিলেন, স্থানীয় কমিটীর সকলে তাঁহার কার্য্যে প্রীত এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। এইখানে কাজ করিবার পর আমার কন্যা বুলবুলের পীড়া যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন তাহার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য করিবার জন্য যামিনী ছয় মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতা আসিলেন। আকোলায় তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতে লোক পাওয়া কঠিন হইল। নানা কারণে স্থানটি ইংরাজ ডাক্তারের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় ছিল। বিশেষ সেখানে বাহিরের প্রাক্‌টিস বেশী হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আহার্য্যাদি ছিল দুর্ম্মূল্য। এই অবস্থায় ডাফরিণ সেন্ট্রাল কমিটীর অনারারী সেক্রেটারী তাঁহাকে অবিলম্বে আকোলায় ফিরিয়া যাইতে লিখিলেন।

যামিনী উত্তরে লিখিলেন—"আমার বোনঝিটির জীবনের মাত্র কয়েকটি দিন বাকী, সে আমাকে কাছে চাহে, আমি এ সময়ে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।" ইহার উপরে উক্ত সেক্রেটারী মহাশয়া লিখিলেন—"আমাদের নিজের স্বার্থ দেখিলে চলিবে না। এই রকম ব্যবহারের জন্য Women's Medical Service-এর নিন্দা হইতেছে।" যামিনী প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"তুমি আমার কাজের সম্বন্ধে কি জান, যে লিখিতেছ যে আমার কাজের দ্বারা W. M. S.-এর নিন্দা হইতেছে? তোমার এ রকম উক্তি করিবার কোন কারণ নাই। সে যাহা হউক, আমার এই পত্রই তুমি আমার পদত্যাগ-পত্ররূপে গ্রহণ করিবে।"—৫৫০্ টাকা বেতনের চাকরী—বৎসর বৎসর বৃদ্ধির কথা—একটা কথায় ছাড়িয়া দিলেন। আকোলার স্থানীয় কমিটী সংবাদ পাইয়া সেন্ট্রাল কমিটীকে সত্বর লিখিয়া পাঠাইলেন, "ডাক্তার সেন যত দিন খুশী ছুটিতে থাকুন, আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব। কিন্তু তিনি যেন আমাদের না ছাড়েন।" যামিনী পদত্যাগ করেন সেন্ট্রাল কমিটীরও সে ইচ্ছা ছিল না, তবে তিনি যে এতটা তেজ প্রকাশ করেন তাহাও তাঁহাদের ভাল লাগে নাই! শ্বেতাঙ্গী সম্পাদিকার প্রতি তাঁহার চিঠিখানা কিছু অবিনীত ভাবের পরিচয় দিয়াছে বলিয়া, তাঁহারা বলিলেন, ডাঃ সেন চিঠির জন্য ক্ষমা চাহিলেই তিনি থাকিয়া যাইতে পারেন। যামিনী বলিলেন, "ক্ষমা চাহিবার মত কাজ আমি করি নাই, সেক্রেটারীরই আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।" তাঁহার অতীত কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করা হইল।

স্নেহের ভাগিনেয়ীর প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল, তিনি মুক্ত হইলেন।

বেতিয়ার এক হিন্দু মজুরণী হাসপাতালে আসিয়া কয়েক দিন পরে মারা যায়। তাহার দ্বাদশ বর্ষীয় এক পুত্র কোথায় যাইবে? যামিনী তাহাকে বালক ভৃত্যরূপে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। এক মুসলমানী ঐরূপ মরিয়া গেলে তাহার সপ্তম বর্ষীয় কন্যার পালন ও রক্ষণের জন্য ভারও লইয়াছিলেন। আকোলার হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ দুইটি মাতৃপরিত্যক্ত শিশু-কন্যাকে ১০।১২ দিন বয়স হইতে তিনি নিজের গৃহে রাখিয়া মিসেস গুপ্তের সাহায্যে পালন করিতেছিলেন। স্বজনগৃহে তাহাদের অনাদর হয়, বা কেহ তাহাদের দুর্ভার মনে করে, সেই জন্য এই বালক বালিকা ও ৬ মাস বয়সের শিশুদ্বয় লইয়া পুরীতে চলিলেন। সেখানে ইতিপূর্ব্বেই 'বিশ্রামকুটীর' নামে একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এইগুলিকে লইয়া তিনি তথায় সংসার পাতিলেন।

তাঁহার শিশুবাৎসল্যের কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এক সময়ে আমি আমার স্বামীর পূর্ব্বপক্ষের একটি পুত্রের পীড়ার মধ্যে নিজের আট নয় মাসের শিশুপুত্র অশোককে ভাল করিয়া দেখাশুনা করিতে পারিব না এই আশঙ্কায়, যামিনীর কাছে রাখিয়াছিলাম, বলিয়াওছিলাম—"এ ছেলে তোমারই হউক।" যামিনী তখন কলিকাতায় প্রাক্‌টিস্ করিতেছিলেন। বাহিরের কাজ সত্ত্বেও শিশুকে অপূর্ব্ব যত্নে নিজের কাছে রাখিয়া কিছুকাল লালন-পালন করিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় শিশুর পিতার অভিমত নাই জানিয়া যামিনীকে একদিন বলিলাম, বেশী মায়ায় জড়িত হইও না, পরের ছেলে, পরভৃৎ কোকিল-বাচ্ছার মত। পাখা হইলেই নিজের দলে উড়িয়া আসিবে। এই কথায় তাঁহার কত ব্যথা লাগিয়াছিল,

তাহা তাঁহার কলিকাতা ছাড়িয়া সোলাপুর চাকরী লইবার সময় জানিয়াছিলাম। যামিনী যেমন শিশুদের ভালবাসিতেন, শিশুরাও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইত। ভ্রাতা নিশীথচন্দ্রের প্রথম পুত্রটিও তিন বৎসর বয়সে তাহার মেজোপিসীমার সঙ্গে সিমলা চলিয়া গিয়াছিল, এবং স্নেহ-যত্নে পালিত হইতেছিল। কিন্তু তাহার মাতা সন্তানের অদর্শনে একান্ত অধীর হওয়াতে শিশুর অনিচ্ছাক্রমেই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইল। এই সকল ঘটনা হইতে যামিনীর মনে ধারণা হইয়াছিল যে, ভাই কি ভগিনীর সন্তান সম্পূর্ণ আপনার হয় না ; যাহাকে দাবী করিবার কেহ নাই, এমন কোন শিশুকে আপনার করিয়া এবং আপনার মনের মত করিয়া গড়িতে হইবে। হায়! সে আশাও ব্যর্থ জানিয়া গিয়াছেন, তবু স্নেহের এবং চেষ্টার অভাব ছিল না। পালিত সন্তানগুলির সুখ ও সুশিক্ষার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি বলদেওদাস মাতৃভবনের একটি মাতৃপরিত্যক্ত শিশুপুত্রকেও সন্তাননির্ব্বিশেষে পালন করিতেছিলেন। শেষ পীড়ার আরম্ভে, মিসেস গুপ্ত কলিকাতা থাকাতে, জ্বর লইয়া শিশুর পরিচর্য্যা করিয়াছেন। তাই এক এক সময়ে মনে হইয়াছে, অদৃষ্ট ইঁহাকে মাতা হইবার সুযোগ দেয় নাই বলিয়াই কি প্রকৃতি এই প্রতিশোধ লইতেছে? নিজেরা মাতা হইয়া যাহা করিতে পারি নাই, এই চিরকুমারী কিরূপে তাহা পারিতেছেন?

পিতামাতা, ভাইভগিনী এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও তো ভক্তি, প্রীতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কোন ত্রুটি কোনদিন দেখি নাই। ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন রুগ্ন হইলে সপত্নীক তাহাকে ও মাতৃদেবীকে নেপালে নিজের কাছে লইয়া গিয়া কত সেবাই না করিয়াছিলেন! অন্যের জন্য যখন প্রাণপণ খাটিয়াছেন, তখন মনে মনে বলিয়াছেন, "ভগবান, আমি এত লোকের জন্য এত খাটিতেছি, আমার ভাইটিকে তুমি বাঁচাইবে না?"

ভ্রাতার মৃত্যুর চারিমাস পরে পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক সংবাদ পাইয়াই নেপাল হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। যথেষ্ট সেবার সুযোগ পাইলেন না বলিয়া চিরকাল মনে দুঃখ ছিল। ইহার সাত বৎসর পরে যখন মাতৃদেবীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, যামিনী তখন সিমলায়। হঠাৎ সংবাদ পাইয়া অভিভূত হইবেন ভয়ে, তাঁহাকে টেলিগ্রামে মাতার পীড়ার অবস্থা বলা হয়, এবং কোন আত্মীয়াকে টেলিগ্রামে সত্য ঘটনা জানাইয়া অনুরোধ করা হয়, যেন তিনি নিজে গিয়া ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ করেন। কিন্তু যামিনী টেলিগ্রাম পাইবামাত্র সিবিল সার্জ্জনকে চিঠি লিখিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিলেন। সেটা কলিকাতা আসিবার ট্রেণ ছিল না। মাঝ-পথে নামিয়া অন্য গাড়ী ধরিয়া তিনি যে সময়ে কলিকাতা পৌঁছিলেন, সে সময়ে আসিয়া পড়িবেন, কেহ এমন কল্পনাও করেন নাই। তাঁহাকে যে ঘটনার কথা লেখা হইয়াছিল তাহাতে রোগীকে কখনো কখনো ৪৮ ঘণ্টা বাঁচিতে দেখা যায়। তাই প্রাণপণ করিয়া ১৮ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু আসিয়া মাকে দেখিতে পাইলেন না। সে দুঃখ চিরদিন তাঁহার ছিল। পরিবারের যে কোন ব্যক্তিরই হউক, রোগের সংবাদ পাইলে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারিতেন না। বাহির হইতেও যে কোন রোগীর জন্য যখন ডাক আসিত, আহার, নিদ্রা, পথক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার কাছে ছুটিতেন।

Women's Medical Service ছাড়িবার পর চিকিৎসাবিদ্যায় আরও নূতন তথ্য ও দক্ষতা লাভ করিবার জন্য ১৯২১ সনে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন। এইবার কেম্ব্রিজ হইতে Public Health সম্বন্ধে পরীক্ষা দিয়া ডিপ্লোমা লইয়া এবং লণ্ডন School of Tropical Medicine হইতে Certificate লইয়া ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে যখন দেশে ফিরিলেন, তখন Buldeodas Maternity Homeএর বাড়ী নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে গবর্ণর-পত্নী দ্বারা গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হইবে, কিন্তু কে যে তৎপূর্ব্বে তাহাতে ভিতরকার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া তাহা দর্শনীয় করে, তাহা তখনও অনিশ্চিত। এই অবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত যামিনীকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। রায় বাহাদুর মেডিকেল কলেজে যামিনীর সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলিলেন, মিস সেনের গুণোচিত বেতন কর্পোরেশন দিতে পারিবে না, কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানের সূচনায় অর্থের দিকে না চাহিয়া, তিনি উহার ভিত্তি পত্তন করিয়া দিন। এই অনুরোধে তিনি অস্থায়ীভাবে বলদেওদাস-প্রসূতি-নিকেতনের ভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মাস দুই পরেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মেয়র হইলেন এবং তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তিনি স্থায়ীভাবেই রহিয়া গেলেন। বেতন তাঁহার সর্ব্বথা উপযুক্ত না হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল।

এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁহার হাতে গড়া জিনিষ। ইহার জন্য তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রসূতিদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা প্রধান কাজ হইলেও প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনের দায়িত্ব সম্পূর্ণতঃ তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। সে দায়িত্ব অতি সুন্দরভাবে পালন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ক্লাস করিয়া বাচনিক শিক্ষা ও সঙ্গে রাখিয়া হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া, Nurse প্রস্তুত করাও তাঁহার আর এক কাজ ছিল। তিনি কয়েকটি সুনিপুণা সেবিকা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সেবিকার সংখ্যা কম, প্রসূতি ও প্রসূতের সংখ্যা তদনুপাতে বহুগুণ অধিক হইলেও, তিনি নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরিদর্শন-গুণে এই মাতৃভবনকে সুশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও আরামের স্থান করিয়া তুলিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ইহার প্রতিপত্তি এমন বিস্তৃত হইল, যে, বাঁকুড়া, বৰ্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতেও আশু-সন্তানবতীরা এখানে আসিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে মনে করা গিয়াছিল যে কেবল নিম্নশ্রেণীর এবং দরিদ্র পরিবারের নারীরাই এখানে আসিবে, কিন্তু দেখা গেল ডাক্তারের চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া ভদ্র মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের মহিলারা কঠিন কঠিন "কেস্" লইয়াও অসঙ্কোচে এখানে আশ্রয় লইতেন। ইহাতে এক সময়ে যে আর একদিকে এই প্রসূতি-নিকেতনের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয় নাই, তাহাও নহে। এত এত কঠিন abnormal case এখানে আসিবে এবং সহজে বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইয়া যাইবে, এমন ধারণা বলদেওদাস-মাতৃভবনের প্রতিষ্ঠাতাদের ছিল না। যাঁহাদের বিশেষ চেষ্টায় ও ব্যক্তিগত প্রভাবে এই ভবনের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রধানতম এক প্রাচীন চিকিৎসক মহোদয়কে বলিতে শোনা গিয়াছে—"যদি জানিতাম এই Maternity Home করিলে ডাক্তারদের রুজি মারা যাইবে তবে কি এমন কাজ করিতাম।" এখানে দরিদ্র

নারীরা আসিবে, যাহাকে স্বাভাবিক কেস্ (normal case) বলে, তাহাই আসিবে ; বেশী বেতনে খুব উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসক থাকেন ও নিপুণ চিকিৎসা হয়, অনেকের কাছেই তাহা অনাবশ্যক মনে হইয়াছে। সে যাহা হউক, এখানে যে সকল ভদ্রমহিলা আসিয়াছেন তাঁহারা ডাক্তার মিস সেনের সদয় ব্যবহার, কোমল হাতের সেবা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

আপনাকে বাঁচাইয়া কাজ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আবার তাঁহার শরীর ভঙ্গিয়া পড়িল। দুই একবার অল্পদিনের ছুটীতে উপকার হইতেছে না দেখিয়া, কর্ম্ম ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দীর্ঘ ছুটী লইলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, এবং পুরীতে বাস করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া পুরীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ সেনাপতি ও প্রবীণ কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু পুরীর হাসপাতালের নারী বিভাগের ভার গ্রহণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন পুরীর হাসপাতালে তাঁহাকে কলিকাতার মত গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইবে না। এই আশ্বাস পাইয়া তিনি পুরী হাসপাতালের নারী বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মিঃ সেনাপতি মহাশয় বদলী হইয়া গেলেন। তখন নারী হাসপাতাল সম্বন্ধে সহানুভূতিকারী কেহ রহিল না। ডাক্তারের বাসগৃহের চারিদিক অপরিচ্ছন্ন, একদিকে বাঁশবন। বায়ুর অভাব ও মশকের উৎপাতে রাত্রে তাঁহার নিদ্রা অসম্ভব হইল। তদ্ভিন্ন হাসপাতালের অবস্থা সম্বন্ধে উপরিতন ব্যক্তিদের ঔদাসীন্য ও নানাপ্রকার অব্যবস্থা দেখিয়া তিনি বড় দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিলেন। যেন তেন প্রকারেণ কাজ সারা ও মাসান্তে বেতন গুণিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল, প্রত্যেকটি রোগীর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করিতেন। চিকিৎসকের কাজ একটি পবিত্র ব্রত বলিয়া তিনি অনুভব করিতেন। যাহা ভাল করিয়া করিতে পারিবেন না, নামরক্ষার জন্য তাহা করিতেন না ; সেইজন্যই এ কাজে থাকিতে পারিলেন না। এ দিকে কলিকাতার "মেটারনিটি হোম" হইতে নানা বিশৃঙ্খলা ও রোগিণীদের কষ্টের সংবাদ তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার অধীনে কাজ করিতেন, তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও পূর্ব্বভার পুনরায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই গুরুতর পরিশ্রম আর কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না। তিনি ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আসন্ন বিচ্ছেদকাতর মেটারনিটি হোমের কর্ম্মিগণ তাঁহাকে যে বিদায় অভিনন্দন দিয়াছিলেন তাহার শেষ কথা কয়েকটি এই—"আপনার নিকট আমরা আর কোনও আশীর্ব্বাদ কামনা করি না,—শুধু এইটুকু, যেন আমরা আপনার ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ধন্য হ'তে পারি।"

বিশ্রামের জন্য আবার পুরী আসিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রাম লেখেন নাই। আবার পুরীর হাসপাতালের জন্য আহ্বান আসিল। নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার থ্যাডেনির বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে, নিজ ভবনে থাকিয়া দুই বেলা আসিয়া হাসপাতালের কাজ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবারও ইচ্ছামত হাসপাতালের উন্নতি করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং পরিশ্রমও যথেষ্ট করিতে হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডাদের পত্নীরা হাসপাতালে আসিতেন

না ; যামিনীর চিকিৎসার খ্যাতিতে এখন কোন কোন পাণ্ডা পত্নী ও সম্পর্কিত মহিলাদের হাসপাতালে পাঠাইতে লাগিলেন। বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়েরাও আসিতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর যখন একান্ত অপটু হইয়া পড়িল, তখন বহু অনুরোধ সত্ত্বেও গত অক্টোবর মাসে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর হইতেই বিশ্রাম সত্ত্বেও আর আরাম লাভ হইল না। গত ১১ই ডিসেম্বর মাসে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে কলিকাতা আনা হয়।

যিনি বহুলোকের রোগের উপশম করিয়াছেন, নিজ জীবনের শেষ কয়েক দিন অতি নীরবে দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৭ই মাঘ, ইংরাজি ১৯৩২ সনের [২২শে] জানুয়ারী শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজন এবং সকল পরিচিতজনের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি লইয়া অমর-লোকে প্রস্থান করিলেন।

এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছি তাহা দ্বারা তাঁহার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকিতে পারি নাই জানি। তাঁহার মহনীয় নারীত্বের সব দিক দেখান আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহার কর্ম্মজীবনের অনেক কথা আমার অপরিজ্ঞাত।

রোগের সময় আত্মীয়-স্বজনের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন বলিলেই পারিবারিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি আরও কিছু করিয়াছেন। আমি, যামিনী ও প্রেমকুসুম তিনজনই অন্য ভাইবোনদের অগ্রজা। পিতামাতা পুত্রের সমান যত্নে কিংবা অধিকতর যত্নে আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন, তাই আমাদেরও সংকল্প ছিল অন্য লোকের পুত্রেরা যাহা করে আমরা তাহা করিব। বৃদ্ধ পিতামাতাকে বিশ্রাম দিয়া কনিষ্ঠ ভাইবোনের শিক্ষার ভার আমরা বহন করিব। ঘটনাচক্রে আমি ও প্রেমকুসুম তাহা করিতে পারি নাই। যামিনীর দ্বারা এই কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইয়াছে। নেপালে যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্তই পরিবারের কল্যাণে ব্যয় হইয়াছে। যখন যতীন্দ্রমোহন চৌরঙ্গীতে দোকান দিলেন এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা বিলাতে গেলেন, তখন নিজের জন্য মাসে ২৫ টাকা মাত্র রাখিয়া সমুদয় অর্জ্জন বাড়ী পাঠাইতেন। দুই কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের ব্যয়ও তিনি বহন করিয়াছেন। তৃতীয় ভ্রাতার বিলাতের শিক্ষার ব্যয়ও তিনিই দিয়াছেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও ভাইদের জন্মদিনে তাহাদের বস্ত্রাদি দিতেন, পরিবারের অন্য সকলের জন্মদিনেও উপহার দিতেন। সকলকে নিজের হাতে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। তিনি ভাল রাঁধিতে ও জলখাবার প্রস্তুত করিতে পারিতেন। নেপাল ছাড়িবার পর, একবার কলিকাতার বাড়ীতে যখন পাচক ছিল না, বা অসুস্থ ছিল, একাদিক্রমে বহুদিন যামিনীকে বাড়ীর সকলের জন্য একতালার পুবের বারান্দায় বসিয়া রাঁধিতে দেখিয়াছি। সব ভাইবোন সেখানে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে নানারকম গল্প জুড়িয়া দিত, বসিবার ঘর খালি থাকিত। যখন ম্যাটার্নিটি হোমে থাকিতেন, সেখানে কতবার সকলকে আহারে এবং চায়ে নিমন্ত্রণ করিতেন। পুরীতে ছুটী উপলক্ষে সকলকে আসিতে অনুরোধ করিতেন। আসিলে কত সুখী হইতেন, কত যত্নে সকলকে খাওয়াইতেন। কোন কোনও nurseকেও তাহাদের স্বাস্থ্যশোধনের জন্য আনাইতেন। এই প্রসঙ্গে nurseদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের একটা উদাহরণ মনে পড়িতেছে। একটি nurseএর Typhoid হয়। প্রসূতি ও শিশুদের কাছে তাঁহাকে যাইতেই হইত। সংক্রামক রোগের দ্বারা তাহাদের পাছে অনিষ্ট হয় সেই

ভয়ে সকল সময়ে এই নার্সটির কাছে যাইতে পারিতেন না ; তবু তাহার জন্য অনেক কিছু করিতেন, রাত জাগিতেন, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার অনুরোধে বড় বড় ডাক্তার আসিয়া বালিকাকে দেখিয়া যাইতেন। কিন্তু এত করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। বালিকার অকালমৃত্যুতে যামিনী অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। নিজের সম্পর্কিতের মত ব্রাহ্মমতে তাহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করাইলেন। তাহার দুইখানি বড় ছবি করাইয়া একখানি হাসপাতালে দিলেন, একখানি নিজের কাছে রাখিলেন।

তাঁহার হৃদয়খানি ছিল একটি স্নেহকরুণার নির্ঝর। তাই হাসপাতালে কোন রোগী মরিলে বড় ব্যথা পাইতেন। রোগীদের যখন হাসপাতাল হইতে দামী ঔষধ মিলিত না, নিজের ব্যয়ে তাহা কিনিয়া দিতেন। শিশু রোগীদের কখনও ঔষধ কিনিয়া দিতেন, কখনো প্রফুল্ল রাখিবার জন্য খেলানা দিয়া আসিতেন।

বাল্য অতিক্রম করিবার পর হইতে তিনি নিজের বস্ত্রালঙ্কার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, কিন্তু অন্যথা সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। ফুল-ফলের বাগান করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার পুরীর বাগানের বালুময় ভূমিতে সবুজের প্রাচুর্য্য ও পুষ্পসম্ভার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন।

লোকে জানিতেন না যে তিনি অবসরকালে সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছেন। এক সময় আমার অনুরোধে Olive Schreiner লিখিত *Dreams* গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন[২১]। ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পীড়ার সময় নিজের অনুবাদ লইয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। দুঃখের বিষয় কোন মাসিকের সম্পাদিকার অনবধানতায় ঐ অনুবাদগুলি হারাইয়া গিয়াছে। 'বলদেওদাস প্রসূতি ভবনে' তিনি নার্সদের জন্য 'প্রসূতি তত্ত্ব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

তাঁহার স্বদেশ প্রীতি এত বেশী ছিল যে উহা আমার কাছে একটু উগ্র বোধ হইত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত তর্ক করিতাম না। যাহা সরল ও অকৃত্রিম তাহা শ্রদ্ধা করিতাম। *Statesman* কাগজ তাঁহার অস্পৃশ্য ছিল, কারণ সে কাগজ এদেশের নিন্দা প্রচার করে।

দেশজ শিল্পদ্রব্য গ্রহণ কেবল বস্ত্র সম্বন্ধেই নয়, সব বিষয়েই চেষ্টা করিতেন। কলিকাতা আসিলেই নানা দোকান খুঁজিয়া হরেকরকম দেশী দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইতেন।

এত স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম, এত জ্ঞান, এত কর্ম্মশক্তি, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার তাহাতে দেখি নাই। এই সুন্দর মহৎ জীবনখানি বিধাতা আরও কিছুদিন কেন সংসারে রাখিলেন না বুঝিতে পারি না। সারাজীবন বড় বেশী খাটিয়াছেন বলিয়াই বুঝি বিশ্রামের ব্যবস্থা হইল।

বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৩৯

[ধারাবাহিক এই লেখাটির পূর্ণাঙ্গ একজায়গায় না পাওয়ায় আমরা তিনটি গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার সাহায্য নিয়েছি। প্রতিষ্ঠান তিনটির নাম : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এবং গুরুসদয় দত্ত ফোক আর্ট সোসাইটি। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।]

সন্তান ও শিষ্য

নিভৃতে দুই কণ্ঠে কথা হইতেছিল। একটীর স্বর ধীর ও শান্ত, জিজ্ঞাসার ভিতরে অভিজ্ঞতার পরিচয়। অপর কণ্ঠ আবেগকম্পিত, আশা ও আকাঙ্ক্ষার মিলনে উচ্ছ্বাসিত।

*　　*　　*　　*　　*

তুমি কি চাও?

সন্তান।

তুমি শান্তিতে আছ ; একটা মাত্র দেহের রোগ স্বাস্থ্য, ক্লান্তি ও আরাম একলা ভোগ করিতেছ ; একটা মনের সুখ ও দুঃখ সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছ ; বেদনার প্রসার ও তীব্রতা বাড়াইবার জন্য এ আগ্রহ কেন? আজ তুমি মানবসমাজে কেবল নিজের জন্যই দায়ী, দায়িত্বের ভার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ করিবার কেন এ ব্যাকুল প্রয়াস?

আমি যখন আর এই পৃথিবীতে থাকিব না, আমি চাহি যেন তখনও আমার চিহ্ন আমার দেহের ও যাতনার অংশ কেহ এখানে থাকে, আমার সকল শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া এইরূপ মধুর সুবাসিত আলোক-তিমিরে চিত্রিতা বিচিত্র লীলাভূমিতে আনন্দে বিচরণ করে ; আমার জ্ঞানের দায়দরূপে সেই জ্ঞান সম্ভোগ করিতে করিতে উহা বৰ্দ্ধিত করিয়া চলে ; দূরে ও নিকটে, সমুদ্রের গভীর তলদেশে আর পৃথিবীর তপ্ত গর্ভে এবং চন্দ্রতারকা শোভিত উৰ্দ্ধে আকাশে তাহার চিন্তা বিশ্বকৰ্ম্মার চিন্তাকে যেন ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া আসে। ফুল ফলের শোভা স্রোতস্বতীর নৃত্যলীলা আমাকে যে আনন্দ-আপ্লুত করে, মেঘের ও আলোকের কৌতুকক্রীড়া, তুষারমণ্ডিত পৰ্ব্বতের মহিমাময়ী মূর্ত্তি, ঝটিকা-তাড়িত সমুদ্রের রুদ্র-বিক্ষোভ আমার প্রাণে যে ভাবরাশি মথিত ও উদ্বেলিত করিয়া লয়, তাহার জন্য একটি নূতন আশ্রয় রাখিয়া যাইতে চাহি। মানব ইতিহাসে দেবদানবের নিরন্তর সংগ্রাম দেখিয়া যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি ও সংকল্প হৃদয়কে কোমল ও দৃঢ় করিতেছে, সেই সকল অন্য এক হৃদয়পাত্রে সঞ্চারিত করিয়া যাইতে চাহি। আমি যাইব, কিন্তু আমার একান্ত আপনার আর কেহ থাকুক এই প্রিয় পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব সম্ভোগ করিতে, আর আমার বিপুল আশা ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত রাখিতে।

তুমি চাও তোমার অনুভূত আনন্দ, তোমার জ্ঞানের সাধনা তোমার সঙ্গে শেষ না হয়। কেবল এই—?

আরও আছে! আমি যে দৃশ্য ও অদৃশ্য রাজ্য জয় করিয়াছি সে তাহা রক্ষা করিবে। আমি যে কৰ্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি সে তাহা সম্পন্ন করিবে এবং সেই কৰ্ম্মের ধারা যাহাতে প্রবাহিত ও বৰ্দ্ধিত হইতে পারে তাহার পথ করিয়া দিবে। আমি যে মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যবর্ত্তী উৰ্দ্ধবাহী পথ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, ক্রমে ক্রমে মানুষ যাহাতে একটী একটী করিয়া সোপান গড়িয়া তুলিতেছে, আমি নিজে এবং আমার পরে আমার রক্ত মাংস-গঠিত আর কেহ তাহার ইষ্টকপ্রস্তরাদি উপকরণ সংগ্রহ করিবে না? আমার পার্থিব আয়ু শেষ হইলে আমার জীর্ণ দেহ ও শিথিল হাত, ভস্মীভূত বা মৃত্তিকাসাৎ হইবে—তাহা হউক; কিন্তু আর একখানি সবল, তরুণ দেহ কি কৰ্ম্ম-দৃঢ় হস্ত লইয়া আমার স্থান পূর্ণ করিতে

আসিবে না? আমি সেই তরুণ নবীভূত আমাকে, আমার আত্মনকে পৃথিবীতে আমার স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে চাহি।

তুমি কেবল অদৃশ্য ভবিষ্যতের জন্যই সন্তান চাও? এই পৃথিবীর জন্য, ভবিষ্যৎ মানব সমাজের কল্যাণের জন্য জ্ঞানের শক্তির এবং প্রীতির একটী ভাণ্ডার চাও ; স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সোপান রচনা করিবার জন্য শিল্পী চাও, ভাস্কর চাও, তোমার নিজের জন্য কি কিছুই চাহনা?

চাই বই কি? এ সকল তো একান্ত নিজের জন্য। সন্তানের মধ্যে আমার পরিণতি ও সার্থকতা দেখিবার গভীর তৃপ্তি, তাহার জীবনে আমার নূতন সুখ দেখিবার বিপুল আনন্দ, তাহার যৌবনে আমার যৌবনের পুনরুজ্জীবন দেখিবার সৌভাগ্য, এ সমস্তই নিজের জন্য। পৃথিবীতে আমার মত আরও মানুষ আসিয়াছে, আসিবেও, কিন্তু আমার সন্তান সে আমারই অতীতের বর্ত্তমানের ভবিষ্যতের মূর্ত্তিরূপে, আমার অমরত্বরূপে আমার নামের ও মানের চিরন্তন রক্ষকরূপে কল্পনা করিয়া আমি মুগ্ধ হইতেছি। সন্তানকে চাহিতে গিয়া আমি আপনাকেই নূতন চোখে ফিরিয়া চাহিতেছি—আমাতে আমার সন্তানে পার্থক্য কোথায়?

কোন পার্থক্য, কোন স্বাতন্ত্র্য সন্তানের সঙ্গে মানুষের নাই?—ঘটে না?

পার্থক্য থাকে, ঘটিতেও পারে!

তবু আশা করিয়াছি সে পার্থক্য বিস্তৃতির গভীরতার, রূপগত ও বস্তুগত নহে।

তাই কি?

নয় কি?

কালে দেখিবে। কিন্তু একি সত্যকথা যে জীবিত কালে নিজের দেহের আরামের জন্য তুমি কিছুই চাও না?

চাই বই কি? খুবই চাই। বার্দ্ধক্যে আমার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিলে আমি কাহার শক্তিকে আশ্রয় করিব? আমার দেহমনের সমস্ত ক্ষমতা দিয়া জন্মের পর মুহূর্ত্ত হইতে আমি যাহাকে জীবিত রাখিব, শৈশব ও বাল্যে যাহার দেহ ও মনের আরাম ও স্বাস্থ্য বিধান করিব, আমার বার্দ্ধক্যের অক্ষমতার মধ্যে সেই আমার সহায় ও অবলম্বন হইবে। আমার জীবিকা সংগ্রহ করিবে। কিন্তু জীবিকার জন্য তত চিন্তিত নহি, আরামের জন্যও লালায়িত নহি। আমি যতদিন জীবিত থাকিব, আমার যৌবনের সঞ্চয় কি আমার বার্দ্ধক্যের এবং তাহার শৈশবের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না! কেবল দেহের ক্ষুধা এবং দেহের আরাম নহে। কিন্তু সে যেন নিবারণ করিতে পারে অন্তরের ক্ষুধা, তাহার ভক্তি ও সেবা দিয়া সে যেন দিতে পারে চিত্তের আরাম। অপরে যদি নাও বোঝে সে যেন বুঝিতে পারে আমার মানব-মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও বেদনা, ব্যর্থ ও সার্থক সাধনা। সে যেন আপন হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারে আমার যত নিভৃত নীরব অনুভূতি। আমার রক্ত-মাংসে গঠিত যাহার দেহ তাহার হৃদয় যেন আমার হৃদয়ের স্বজাতীয় ও আজন্ম-পরিচিত হয়। সে যেন সর্ব্বথা আমার সন্তান, আমারই নূতন প্রসার, বিস্তার ও উচ্ছ্রায় হয়।

পৃথিবীতে মানুষ যাহাকে সন্তান বলে সকল সময়ে তাহার দ্বারা সন্তান নামের সার্থকতা হয় না। আত্মজকে সন্তান করিতে হইলে কঠিন সাধনা চাহি।

তাহাই হউক। আমি সন্তানের জন্য তপস্যা করি।

২

তুমি আবার কি চাও?

শিষ্য।

কেন? সন্তানের দ্বারা মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না?

না। সন্তান আমার দেহের ও মনের দোষগুণ রোগ ও স্বাস্থ্য দুইই লইয়া আসিয়াছে ; বুঝিবা গুণ হইতে দোষ এবং স্বাস্থ্য হইতে রোগের উত্তরাধিকারই পরিমাণে গুরুতর হইয়াছে। আমার বহু পরিশ্রমে অর্জ্জিত যে অমূল্য জ্ঞান, বহু পরীক্ষায় লব্ধ যে চরিত্রের দৃঢ়তা, বহুল অশ্রুমার্জ্জিত যে দূরদৃষ্টি তাহার জন্মের পর হইতেই তাহার গ্রহণের জন্য সম্মুখে ধরিতেছি, সে অবহেলাভরে সে সমুদয় প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি যে পথ তাহার জন্য নির্দ্দেশ করিতেছি, সে পথে চলিতে সে নিতান্তই অনিচ্ছুক। বুঝি পথ-স্খলিত না হইলে সে সুপথে চলিতে শিখিবে না ; যতদিন না অভাবের দ্বারা নিষ্পেষিত হইবে, ক্ষতি-লাভ গণনা করিয়া কার্য্যারম্ভ তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। সে আপন ইচ্ছায় সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইতেছে। আমি তাহাকে যত দিতে পারি সে তত লইতে প্রস্তুত নহে।

জান না, যাহা দুঃখের পথ চলিয়া স্বয়ং আহরণ করা যায় তাহাই মহার্ঘ? বিনা মূল্যে যাহা বিক্রীত হয় বিনা পরিশ্রমে যাহা লব্ধ তাহা সংসারে যতই প্রয়োজনীয় হউক, মানুষ তাহাকে মূল্যবান মনে করে না।

তাহা বুঝিয়াছি, ভালরূপেই বুঝিয়াছি। সেইজন্যই শিষ্য চাহি।

সে শিষ্য কোথায়, তাহার সন্ধান পাইয়াছ?

শিষ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা লইয়া, আমার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে খুঁজিব না। অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠ-খণ্ড হইতে যেমন সংস্পৃষ্ট অপর কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ হইবে। সে আমার ভিতরের অগ্নিটুকু আপনাতে গ্রহণ করিবে। আমার পার্থিব জীবন শেষ হইলে এবং চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া অস্থিগুলি অঙ্গারে পরিণত হইলেও ঐ অগ্নিটুকু সে সঞ্জীবিত রাখিবে তাহার আপন অন্তরের মধ্যে। আমার যেটুকু গ্রহণীয় তাহাই লইবার জন্য সে একান্ত আগ্রহ লইয়া আসিবে। সে আমার দেহের অংশে নয়, তাই সে আমার যাতনার অংশে হইতে চাহিবে। আমার চিন্তার, জ্ঞানের, চরিত্রের, আশা ও আকাঙ্ক্ষার সর্ব্ববিধ উদ্যমের, তপস্যার ও তপঃফলের উত্তরাধিকারী সে হইতে চাহিবে। আমার মধ্যে যেটুকু সুখ ক্ষণস্থায়ী, অমর, অবিনশ্বর তাহাই লইয়া সে আমার প্রকৃষ্টতর পুত্র হইবে। অতি নৈকট্য তাহাকে আমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন করে নাই, স্নেহাতিশয্য ও অতিশয় মমতা তাহাকে স্বেচ্ছাপ্রবণতা ও স্বার্থপরতার পথে চালিত করে নাই, তাহাকে চাই। আমি তাহার মধ্যে জীবিত রহিব।

সেও তো মরিবে, সেও মনুষ্য, মরণশীল। সেও মরিবে। কিন্তু সে আমার ও তাহার অমৃতাংশ রাখিয়া যাইবে। সে শিষ্য, সে গুরুদত্ত অগ্নি আজীবন ইন্ধন-সংযোগে প্রজ্বলিত রাখিয়া উহা মৃত্যুর পূর্ব্বে অপর কাহাকেও শিষ্যত্বে বরণ করিয়া, তাহার হস্তে ন্যস্ত ধনের মত অর্পণ করিয়া যাইবে। গুরুর এবং শিষ্যের পরস্পর আশ্রয় করিয়া জ্ঞানের প্রেমের ও

কর্ম্মের উত্তাপ ও আলোক-শক্তি জগতের হিতে নিযুক্ত হইবে। শিষ্যই ধর্ম্ম-সন্তান, জ্ঞানের ও কর্ম্মের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাই শিষ্যের আসন সন্তানের আসনের বহু উর্দ্ধে।

যদি ভাগ্যক্রমে তোমার সন্তানই একদিন তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে?

তবে আমার জন্ম ও জীবন, এবং তাহারও জন্ম সর্ব্বথা সার্থক হইবে।

৩

শিষ্য লাভ হইয়াছে কি?

আমি শিষ্য লাভ করিয়াছি। আমার ভাগ্য-বিধাতাকে প্রণাম করি।

শিষ্যত্বে গৃহীত হইবার জন্য সে আকুল আগ্রহে, অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা লইয়া, গভীর আকাঙ্ক্ষা ও বিপুল আশার সহিত আমাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছে।

তুমি কি তোমার সঞ্চিত ধন দিয়া তাহাকে একেবারেই ঐশ্বর্য্যবান্ করিয়া দিবে, তোমার সমস্ত জ্ঞান দিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিবে? তাহার অস্তিত্ব কি লুপ্ত হইবে?

না। না। ধীরে, ধীরে, ক্রমে, ক্রমে সে ফুটিয়া উঠিবে, আমি কেবল তাহার বিকাশের ও বর্দ্ধনের সহায় হইব। সে চায় একটু আলোক, একটু দৃষ্টি, একটু পথের সন্ধান। দুর্গম পথে মাঝে মাঝে একটু হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া যাইব ; পথের সঙ্কট নিজে যতটুকু জানিয়াছি, জানাইব ; যখন সংশয়ের অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করিবে, আমার অভিজ্ঞতার আলোকে তাহাকে চালাইয়া আনিয়া, যেখানে মেঘমুক্ত চন্দ্রালোকে চারিদিক সমুজ্জ্বল সেইখানে উপস্থাপিত করিব। পরে সে নিজেই পথ চিনিয়া চলিবে। একবার গিরিপৃষ্ঠে উঠিলে চারিদিক তাহার পরিচিত হইয়া আসিবে।

শিষ্য লাভ করিয়া তুমি নূতন কিছু পাইলে?

এই জ্ঞানটুকু পাইলাম যে সকলকে শিষ্য করা যায় না ; সকলকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। দশজনের মধ্যে নয়জন দান গ্রহণ করিতে জানে না। যে একজন জানে সে কেবল লয় না, সে সঙ্গে সঙ্গে কিছু দেয়। তাহার জিজ্ঞাসা গুরুকে নবতত্ত্বের সন্ধানে নিয়োগ করে। তাহার দৃষ্টি কখনও বা গুরুর দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া চলে। তাহার তরুণ প্রাণের সাহস ও সজীবতা বিগত-যৌবন গুরুর জীবনে নব উদ্যম সঞ্চার করে। শিষ্য কেবল শিষ্যই নহে, সে গুরুর আলোকও বটে।

যদি পার্থক্য আসে, যদি অভিমান, অহঙ্কার আসে? যদি শিষ্য জ্ঞানে গুরুকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে গুরুর আসন হইতে বিচ্যুত করে?

তাহাতেও দুঃখ নাই। বীজদেহ পচিয়া শিশুর আহার জোগাইয়া অদৃশ্য হয়, তরু পল্লবিত কুসুমিত হইয়া কত শোভা পায়। পুষ্প দেখিতে কত মনোহর, আঘ্রাণ তাহার কত মধুর ; সেও ফুটিয়া ঝরিয়া যায় ফল রাখিবার জন্য। গুরু শিষ্যের জন্য এবং শিষ্য তাহার পরবর্ত্তীদের জন্য কিছু রাখিয়া যায়। এই রাখিয়া যাওয়াই থাকিয়া যাওয়া,—নষ্ট হওয়া নহে, নিরর্থক হওয়া নহে।

জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৩৯

স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

অদ্যকার এই সভা স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর পরলোক গমনে শোক প্রকাশের জন্য। সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের২২ পত্রখানি হাতে লইয়া একবার মনে হইয়াছিল, স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্বন্ধে 'শোক' শব্দটা ব্যবহার করা হয়তো সঙ্গত হইল না। তিনি উপযুক্ত বয়সে বাঞ্ছনীয় উন্নততর লোকে নব জন্ম লাভ করিয়াছেন। বিধাতা তাঁহাকে যে জীবনখানি দিয়াছিলেন, সে জীবনখানি পৃথিবীতে দীর্ঘকাল জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যে বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহারি সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, অবশেষে তাঁহারি কাছে ফিরিয়া গিয়াছে। যে শক্তি ও সদ্‌গুণের বীজ অন্তরে লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন, আলস্যে, ব্যসনে, ভয়ে বা অবসাদে তাহা ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহাকে দেশমাতা যে এতকাল কোলে রাখিয়াছিলেন, বঙ্গের বহু নারী যে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছেন এবং সম্মুখে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাখিয়া যে তাঁহার পদানুসরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, ইহার জন্য আজ বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা দিতে এবং সমস্ত হৃদয়ের সহিত এই বাণীর পূজারিণীকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে আমরা সমবেত। তথাপি একথা সত্য যে, আমরা যাঁহাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, যাঁহাকে লইয়া গৌরব বোধ করি, যত বয়সেই হউক তাঁহার অন্তর্দ্ধান আমাদের ব্যথিত না করিয়া পারে না। সেই জন্যই ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে স্বর্ণকুমারী দেবীর দেহাবসান হইলেও তাঁহার বিচ্ছেদে আমরা ব্যথিত এবং বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত। সান্ত্বনা এই যে, সাধারণ জনের মৃত্যুর মতো বিশিষ্টজনের মৃত্যু একেবারে 'গত হওয়া' নহে। যিনি যে পরিমাণে সমকালীন ও পরবর্ত্তী মানুষদের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অধিকার করিতে পারেন, অথবা নিজের ও অপরের অলক্ষিতেও যিনি আপন জীবন দ্বারা অপরের জীবন প্রভাবিত ও উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে মৃত্যুকে জয় করিয়া অ-মৃত বা নিত্য-জীবিত। এদেশে একটি সত্য বচন সকলেই আবৃত্তি করেন—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি", যাঁর কীর্ত্তি আছে তিনি বাঁচিয়া থাকেন! কিন্তু এর চেয়ে বড় সত্য বোধ হয় এই যে, কৃতী যিনি তিনি বাঁচিয়া থাকেন, তিনি চির-জীবিত। কালে কালে কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিকথা মানুষ ভুলিয়া যায়, কবিযশঃ সাহিত্যিক গৌরব কালভেদে, রুচিভেদে, ক্ষীণ হয়, কিন্তু জীবনের দৃষ্টান্ত, মনের বল, চির প্রচলিত প্রথা ও জন্মগত সংস্কারকে ভ্রান্ত জানিয়া তাহার বর্জ্জন ও শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন, কর্ম্ম দ্বারা আদর্শকে মূর্ত্তি প্রদান—ইহার প্রভাব অপর জীবনে নীরবে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া অক্ষয় থাকে। ইহাই কৃতিত্ব। এই কৃতিত্ব স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যে ছিল। তাঁহার কৃতকর্ম্ম ও তাঁহার আজীবন সাধনার দ্বারা তিনি পুরাতন ধারণা পরিবর্ত্তিত করিয়া, বহু নারী পুরুষের আচরণ ও আদর্শ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। একথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহার সৎ সাহস, তাঁহার সাহিত্যসেবা এবং তাঁহার নারীহিত প্রচেষ্টা যে পরিমাণে বঙ্গের অন্যান্য নারীর জীবনকে সাহিত্যপথে ও সাবলম্বনের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহাদের ভিতরে অলক্ষিতভাবে তিনি এবং তাঁহার সমসাময়িক কতিপয় উদারচেতা নারী পুরুষ জীবিত আছেন এবং পুরুষ পরম্পরায় সাধনার বিস্তারের মধ্যে ভবিষ্যতেও থাকিবেন।

এতকাল নারীর সকল শক্তি আবদ্ধ ছিল গৃহকর্ম্মের মধ্যে। পরিবারের বাহিরে তাহার

চিন্তা কথা ও কর্ম্ম বাহির হইবার তেমন পথ পায় নাই। যখন উহাদের গতির প্রসার বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও বাড়িয়া চলিল। যে সুদুর-সঞ্চরণশীলা লতাবিস্তৃত ক্ষেত্রের শোভা সম্পাদন করিতে পারিত, সে পথ না পাইয়া একটি ক্ষুদ্র যষ্টি অবলম্বন করিয়া কিয়দ্দূর উঠিয়া বার বার আপনাকে জড়াইয়া জড়াইয়া স্ফীত আকার ধারণ করিয়াছিল, আজ যেন বিস্তৃত বিচরণ স্থান লাভে চারিদিকে শাখা প্রশাখা বাড়াইয়া, পল্লব পুষ্পে বিভূষিত হইয়া জন্ম সার্থক করিল। যে কেবল একটি প্রদীপের মত নিজ বাসভবন আলোকিত করিতেছে, সে যে চন্দ্র তারকার মত সুদূরে আপনার আলোকমালা প্রেরণ করিতে পারে একথা পূর্ব্বে স্বীকৃত হয় নাই। নারী ছিল উপদেশের পাত্রী, উপদেশ দাত্রী নহে, শ্রোত্রী, বক্ত্রী নহে ; পূজাকারিণী, পৌরহিত্যে, তাহার অধিকার ছিল না ; যদি সুদূর অতীতে থাকিয়া থাকে, মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। এই অধিকারের দাবী কেবল একজনের দ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই, দুই একদিনেই ইহা স্বীকৃতও হয় নাই ; কেবল স্বদেশী ভাব ও স্বদেশের চেষ্টায়ও ইহা সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গনারীর শিক্ষা ও অধিকার বিস্তারের বিস্তৃত ইতিহাস দিবার সময় আজ নহে। কেবল এই কথাই আজ স্মরণীয়, যে, এই অধিকারের স্পষ্ট উচ্চারিত দাবী লইয়া নহে, যুদ্ধার্থীর মত সশস্ত্র হইয়া নহে, কিন্তু নীরবে, কতকটা আপনার অজ্ঞাতসারে, পারিবারিক শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গূঢ় প্রভাবে, স্বর্ণকুমারী যখন বঙ্গ নারীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসীমার বাহিরে পা বাড়াইলেন, তখন এই দাবী অনেকেই স্বীকার না করিয়া পারিলেন না।

বাঙ্গলা ১২৬৪ সালের ১১ই ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৫৬ সনের ২৮ আগষ্ট, স্বর্ণকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্য-বিধাতা তাঁহাকে সকল দিক দিয়া সৌভাগ্যবতী করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে অতি অল্প নারীর ভাগ্য তাঁহার সহিত তুলিত হইতে পারে। তাঁহার জনক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই মহর্ষি আখ্যার পর তাঁহার আর বর্ণনা অনাবশ্যক। দার্শনিক প্রবর, হাস্য-কৌতুক প্রিয়, আনন্দ সরস প্রাণ দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান উদার-চরিত, সমাজ-সংস্কার ব্রতী নারী-হিতৈষী সত্যেন্দ্রনাথ, সৎসাহসী, দৃঢ়চেতা, শিল্পানুরাগী হেমেন্দ্রনাথ, বহুভাষাবিদ্ নাট্যকার ও নানা গ্রন্থের অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ, এবং বিশ্ববরেণ্য কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুজ। বহু রত্নের আকরের মধ্যে স্বর্ণকুমারী যে আর একটি রত্নরূপে প্রকাশিত হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এই রত্ন লোক-চক্ষুর অগোচরেই থাকিত, যদি না ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ পরিবারস্থ নারীগণের অবরোধ-মোচনে ব্রতী হইতেন। মহর্ষিদেবের গৃহে কন্যা ও বধূরা কিছু শিক্ষা পাইলেও তাঁহারা পর্দ্দানশীনই ছিলেন। বাহিরে চলাফেরা, দেশ-ভ্রমণ ও ভিন্ন রাতিনীতি দর্শন, বহু সুধীজনের সহিত আলাপ-পরিচয়াদি দ্বারা যে শিক্ষা লাভ হয় তাহা এ পর্য্যন্ত তাঁহারা পান নাই। এই শিক্ষা লাভের সূচনা হইয়াছিল বোম্বাই গিয়া সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে। তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে শিশু কন্যাকে লইয়া তিনি বৎসর কাল সত্যেন্দ্রনাথের নিকট অবস্থান কালে ইংরাজী ভাষা ভাল করিয়া শিখিবার সুযোগও পাইয়াছিলেন। কেবল পিতৃভাগ্য ও ভ্রাতৃ-ভাগ্যই নহে, তাঁহার স্বামীভাগ্য ও সন্তানভাগ্যও নারী সাধারণের দুর্ল্লভ। দশ কি একাদশবর্ষে জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়[২৩]। স্বর্ণকুমারী নানা উপলক্ষে নানা স্থানে

স্বীকার করিয়াছেন যে, ইঁহাকে স্বামীরূপে না পাইলে তাঁহার জীবন-বিকাশের পথ সহজ হইত না। স্বামীর স্নেহ, সহানুভূতি. উৎসাহ ও আশ্বাসবাণীই ছিল তাঁহার সাহিত্য-সাধন ও সকল কর্ম্ম প্রচেষ্টার সহায়। একমাত্র পুত্রকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল; এবং কন্যাদ্বয় তাঁহার সাহিত্য সাধনা ও নারীহিত-প্রচেষ্টায় তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে সুখী করিয়াছেন। তাঁহার এই সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া আজ আমরা আনন্দিত হই এবং বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা দিই। কত প্রতিভাপূর্ণ নারীজীবন স্নেহ ও সহানুভূতির অভাবে শুষ্ক ও নিষ্ফল হইয়া যায়।

বঙ্গের নারীগণের মধ্যে সাহিত্য সাধনায় তিনি অগ্রবর্ত্তিণী ও পথপ্রদর্শিকা। কিন্তু আমি আমার দশম বর্ষে প্রথম যখন তাঁহার দর্শন পাই, তখনও তিনি সে খ্যাতি লাভ করেন নাই। তখন তাঁহার সৌন্দর্য্যই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি কেবল কয়েক মাস পূর্ব্বে মিস্ এক্রয়েড (Miss Akroyd) প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহিলা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছি। এই বিদ্যালয়টি ছিল হিন্দু যুবতী ও বালিকাদের জন্য সর্ব্বপ্রথম বোর্ডিং স্কুল। হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় নাম হইলেও কোন গোঁড়া হিন্দু পরিবারের কন্যা বা বধূ এখানে শিক্ষা পাইতে আসেন নাই। আসিয়াছিলেন কয়েকটি ব্রাহ্ম বধূ ও ব্রাহ্ম পরিবারের বালিকা, আর কয়েকটি হিন্দু সমাজ হইতে পলায়মানা, ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রিতা বাল্য-বিধবা। দুই একটি ভিন্ন প্রায় সকল ছাত্রীই ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের। বধূদিগের স্বামীরা তখন শিক্ষার্থ বিলাতে বাস করিতেছিলেন। কেহ কেহ বা সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া নিজ নিজ পত্নীকে সুশিক্ষিত হইবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহাদের পত্নীরাও স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বঙ্গের নারী-শিক্ষার ইতিহাসের এক অধ্যায়রূপে ইঁহাদের বৃত্তান্ত স্মরণীয়।

যেদিন প্রথম স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখিলাম, সেদিন মিস্ এক্রয়েড মহিলাদের জন্য একটি সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সমাগত মহিলাদের মধ্যে স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দুই কন্যা মালতীমালা ও মতিমালা[২৪] এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর উপস্থিতির কথা আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত আছে। শৈশবে শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার নামটা পরিচিত ছিল। তিনি যে নারী শিক্ষার প্রথম যুগে বেথুন স্কুলে কন্যাদিগকে পড়িতে দিয়া 'এক ঘরে' হইয়াছিলেন সে কথা তখনও জানা ছিল না।

স্বর্ণকুমারী দেবীকে তাঁহার স্বামী পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। মেয়েদের মধ্যে জিজ্ঞাসা চলিল—ইনি কে? ইনি কে?—শুনিলাম ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী, মিসেস্ ঘোষাল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মিস্ এক্রয়েড হয়তো বিলাতেই চিনিতেন। স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে চুপি চুপি যে কথা হইতেছিল, তাহা হইতে জানিলাম, তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর, ইতিমধ্যেই তিনি চারিটি সন্তানের জননী ; আর বেশী কিছু শুনিলাম না। সেই সুগঠিত কৃশ দেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আয়ত ঘনকৃষ্ণ চক্ষু, সুন্দর ললাটে বলয়িত চূর্ণ কুন্তল দীর্ঘকেশ সূচিতা কবরী, আর পরিধানের প্রশস্ত সাদা পাড় যুক্ত কালোরং-এর বোম্বাই শাড়ী, কণ্ঠে মুক্তমালা, কর্ণে মুক্তা-গ্রথিত বড় বড় মাকড়ি—এ সমস্ত এখনও স্মৃতিতে সুস্পষ্ট দেখিতে

পাই। তখন সরস্বতীর নহে, লক্ষ্মীর প্রতিমারূপে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে নব প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালয়ে যখন আবার পড়িতে আসিয়াছি, তখন একবার স্বর্ণকুমারী দেবী পতি ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তখনও অভ্যাগতাদের সৌন্দর্য্য ও সাজসজ্জার সমালোচনাই সহপাঠিনীদের সহিত করিয়াছি। তবে কয়েক দিন পরে, কৌতূহল বশতঃ পরিদর্শকদের মন্তব্য লিখিবার বহিতে স্বর্ণকুমারী দেবীর মন্তব্য পড়িয়াছিলাম। সুকুমার সাহিত্যের সহিত বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এই কথা তিনি জানাইয়াছিলেন। 'সুকুমার সাহিত্য' কথাটা তখন নূতন ঠেকিয়াছিল। ইহারই কিছুদিন পরে অথবা পূর্ব্বে ১৮৭৭ সনে 'দীপ-নির্ব্বাণ'[২৫] প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি সম্পূর্ণতঃ স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা অথবা ভ্রাতার সাহায্যে লিখিত এই লইয়া বাদানুবাদ শুনিয়াছিলাম। সন্দেহ অমূলক হইলেও এই সন্দেহই গ্রন্থখানির উৎকর্ষের প্রমাণ। সে কালের লোকের মনে হইয়াছিল—এত ভাল লেখা, এ কি নারীর পক্ষে সম্ভব? নিশ্চয়ই ইহাতে পুরুষের হাত আছে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় উদ্যম, 'বসন্ত উৎসব', রচনাকাল ১৮৮০[২৬]। হিরণ্ময়ীর নিমন্ত্রণে বেথুন স্কুল হইতে এই গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখিতে আমরা ঠাকুরবাড়ী গিয়াছিলাম। স্বর্ণকুমারী যোগিনী সাজিয়াছিলেন। অন্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথের পত্নী[২৭], ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী[২৮]। বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীর (বলেন্দ্রনাথের[২৯] মাতা) কণ্ঠ বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল।

ইতি পূর্ব্বে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী, সরলা ও ঊর্ম্মিলা আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। একদিন বিকালে স্বর্ণকুমারী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী আমাদের সহিত Badminton খেলিতে গিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাদের সহিত আমার খেলা করিবার সৌভাগ্যও হইয়াছিল।

বসন্ত-উৎসবের পর 'মালতী' নামে[৩০] একটি ছোট করুণ গল্প, ছিন্নমুকুল উপন্যাস এবং গাথা[৩১] নামে কবিতায় গল্প। গাথা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সনে। এখানি সে বয়সে আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। ইহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন ছোট ভাইটিকে। অর্দ্ধশতাব্দী পরেও উৎসর্গের কথাগুলি বোধ হয় ঠিকই মনে আছে :

যতনের গাথা হার, কাহারে পরাব আর
স্নেহের রবিটি তোরে আয়রে পরাই,
যেনরে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়া ফেলনা খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই তাইতে ডরাই।

এই দুরন্ত ছোট ভাইটি তখনও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার ছোটই ছিলেন। তখন তিনি জানিতেন না যে, এই স্নেহের ভাইটি হইবেন বঙ্গ-সাহিত্য জগতের একচ্ছত্র সম্রাট এবং সর্ব্ব দেশপূজ্য কবি। দুই ভাই বোনে এই সময় হইতে ভারতীর[৩২] পৃষ্ঠায় অনেক ছোট ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন।

দেখিতে পাই স্বর্ণকুমারী তাঁহার প্রত্যেক পুস্তক কোন না কোন প্রিয়জনকে উৎসর্গ

করিতেন। উহা কবিতায় লিখিত হইত। পিতা, অগ্রজ, অনুজ, সখী, পতি, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও অন্য আত্মীয়, সকলেই বীণাপাণির পূজার নির্ম্মাল্য দান করিয়া আনন্দ বোধ করিয়াছেন। এই বান্ধব-প্রীতি বড়ই সুন্দর মনে হয়।

১৮৮৩ সনে 'পৃথিবী' প্রকাশিত হইল[৩৩]। ইহা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইলেও ইহাদ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের কলেবর পুষ্টতর হইয়াছে। এ-জাতীয় পুস্তক আর কোন বঙ্গনারী কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নাই। আজকাল অজস্র গল্প ও কবিতার বদলে এই জাতীয় পুস্তক আরও হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৮৭৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৩ পর্য্যন্ত স্বর্ণকুমারী দেবী মিবার রাজ, বিদ্রোহ, স্নেহলতা, ফুলের মালা, কাহাকে, হুগলীর ইমামবাড়ী প্রভৃতি উপন্যাস[৩৪], কবিতা ও গান নামক কবিতাগ্রন্থ, দেবকৌতুক প্রভৃতি নাটিকা, কৌতুকনাট্য ও কয়েকটি প্রহসন লিখিয়াছেন।[৩৫] তিনি যে অশ্রান্তভাবে সাহিত্যের সাধনা করিয়াছেন এইটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাঙ্গলা ১২৮৯ (ইংরাজী ১৮৮৪) সালে তিনি জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে ভারতী পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। এই গুরুতর ভার তিনি একাদিক্রমে এগার বৎসর কাল অতিশয় যোগ্যতার সহিত বহন করিয়াছিলেন। ১৩০২ (ইংরাজী ১৮৯৫) সনে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ উহা কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলার হস্তে অর্পণ করেন। ১৩১৫ (ইং ১৯০৮) সনে আবার উহা স্বহস্তে পুনর্গ্রহণ করিয়া ১৩২৩ (১৯১৬) সন পর্য্যন্ত চালাইয়াছেন। উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র সম্পাদনে বহু আয়াস, চিন্তা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন। অপরের প্রবন্ধাদির গ্রহণ, বর্জ্জন, পরিবর্ত্তনাদি কর্ম্মে ধৈর্য্য ও সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির আবশ্যক। সমসাময়িক চিন্তা ধারণার সহিত যোগ-রক্ষাও অপরিহার্য্য। সকলেই স্বীকার করেন যে পত্রিকা পরিচালনের দায়িত্ব স্বর্ণকুমারী সুন্দররূপে পালন করিয়াছেন। 'ভারতী' পত্রিকার ভিতর দিয়া দেবী ভারতী যে [পূজা] পাইয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। তিনি করুণ ও হাস্যরসযুক্ত, ইতিহাসমূলক ও সমাজের বর্ত্তমান চিত্র সম্বলিত গল্প উপন্যাসাদি দ্বারা ও নাটকাদি দ্বারা এবং নানাবিধ সাময়িক বিষয়ের আলোচনা ও সমালোচনা দ্বারা পত্রিকাখানির মূল্য ও সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছিলেন।

বঙ্গ রমণীদের মধ্যে প্রথম উপন্যাস লেখিকা, প্রথম পত্রিকা সম্পাদিকা, প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা ও গীতের রচয়িত্রী বলিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্য মন্দিরের বর্ত্তমান ও ভাবী পূজারিণীগণের নমস্যা হইয়া থাকিবেন।

আজকালকার মত জটিল সমস্যামূলক, সমাজ-বিদ্রোহ-সূচক এবং বহু তথ্যের আলোচনাপূর্ণ গল্প বা উপন্যাস তিনি লেখেন নাই। যাহা এদেশের প্রতি দিনের, প্রতি স্থানের সুলভ ঘটনা, যাহা জীবনের করুণ ও শান্ত ভাবগুলি ফুটাইয়া তোলে, সৌন্দর্য্যের ও মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে রকম চিত্র তিনি সহজ সুন্দর ভাবে আঁকিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সফল যত্ন হইয়াছেন। নির্য্যাতিতা নারীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে, তথাপি রুদ্র বিদ্রোহের রক্ত ধ্বজা তুলিয়া তিনি এক হীনতা হইতে আর এক হীনতায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে নারীকে আহ্বান করেন নাই। তিনি সকল বিষয়ে ধীর ও সংযত ছিলেন। কোন উদ্দাম ভাব তাঁহার কথায় বা লেখায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাঠককে আকৃষ্ট

করিবার জন্য কোন অযথা চেষ্টা তাঁহার ছিল না। বাণী পূজার আনন্দই তিনি তাঁহার চরম পুরস্কার বলিয়া জানিতেন। তিনি গাহিয়াছিলেন—

ওগো কমল-আসনা, রঞ্জিনি বীণাপাণি,
আমি কাহারেও আর জানি না ভারতি,
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা,
জানি না প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা,
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
আমি জানি না তো তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুরগন্ধ,
শুধু প্রীতি পূরিত পরমানন্দ
তোমার চরণে দানি।
আমি না চাহি আনন্দ বিভব ঋদ্ধি,
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি,
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত বাণী।

বাণী পূজাই তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। শুনিয়াছি শেষ পীড়ার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গীত রচনা ও তাহাতে সুর প্রয়োগে নিযুক্ত ছিলেন।

জগত্তারিণী পদক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন। বাং ১৩১৬ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী পদে তিনি বৃত হইয়াছিলেন। আমিই সেদিন তাঁহাকে সভানেত্রীর অর্ঘ্য ও মাল্য নিবেদন করিয়াছিলাম। তাহার পর তাঁহার নিমন্ত্রণে আর একটি দিন তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার শেষ সস্নেহ আহ্বান রক্ষা করিতে পারি নাই, সে দুঃখ আমার রহিয়া গেল।

তাঁহার জীবনের আর একটা দিক এখনও বলা হয় নাই। তিনি মানুষের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতেন, কারণ মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল। কেবল গল্পে উপন্যাসে গানে তাঁহার নারী-হৃদয় স্বদেশের নারীর জন্য কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। যাহাতে নারীদের পরস্পরের সহিত সখ্য সদ্ভাব ও সহানুভূতি জন্মে, পরস্পরের সম্মিলনে স্বদেশের প্রতি মমতা বর্দ্ধিত হয়, সম্মিলিত শক্তি লইয়া যাহাতে সকলে নানা শুভ অনুষ্ঠানে সমবেত হইতে পারেন ;—যাহাতে নারীর শিক্ষা বিস্তারের নূতন পথ হয়, শিক্ষাগুণে আপনাদের ভরণ-পোষণের শক্তি বর্দ্ধিত হয়—যাহাতে স্বদেশী শিল্পের বিস্তার হয়, এই সকল উদ্দেশ্যে তিনি সখিসমিতি নামে একটি নারী-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে এ দেশের পুরুষ নারী এখনও পারিতেছেন না ; তাই গঠন-মূলক (Construction) কাজের জন্য উৎসাহ বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তাই সখি-সমিতিও দীর্ঘায়ু হইল না[৩৬]। ইহার

মৃতদেহের উপর এক বিধবাশ্রম মাতা ও কন্যায় মিলিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। কন্যা হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পর উহা হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম[৩৭] নামে এখনও ক্ষীণভাবে বাঁচিয়া আছে। স্বর্ণকুমারী দেবী এই আশ্রমকে নিজের সমুদয় পুস্তকের স্বত্ব দান করিয়াছেন, আর উহাতে দুইটি বৃত্তি স্থাপনের জন্যও উহাতে আড়াই হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সকল শুভ আকাঙ্ক্ষা ও শুভ চেষ্টা দিন দিন ফলবতী হউক, তাঁহার অমর আত্মা অমর লোকের আনন্দ লাভ করুক এবং ইহলোকে আমাদের মধ্যেও জীবিত থাকুক।*

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৩৯

* [বিগত ৩১শে জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্বর্ণকুমারী দেবীর পরলোক গমনে শোক প্রকাশের জন্য যে সভা হয় তাহাতে পঠিত]।

সাহিত্য ও সুনীতি

বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে নীতি-শৈথিল্যের কথা শুনিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে আজ তাহাই তরুণ-তরুণীগণের নিকটে প্রকাশ করিতেছি। আমার মনে হয় নির্ব্বিচারে পাশ্চাত্য রীতিনীতির ও সাহিত্যের অনুকরণের আত্যন্তিক চেষ্টা এই শৈথিল্যের জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। আমি বলিতে চাহি না যে যাহা কিছু ভারতীয় তাহাই পাশ্চাত্য জগতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কোনও দেশের বা কোনও যুগের সভ্যতা অন্য দেশের এবং অন্য যুগের সভ্যতা হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং হিতকর, একথা স্বীকার করি না। এদেশে যে-সকল দুর্নীতি এবং কুরীতি আছে সে-সকল যেমন অবশ্য-বর্জ্জনীয় সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশেরও যাহা অভদ্র, অশোভন এবং মানবচরিত্রের হীন দিকের প্রকাশ তাহাও বর্জ্জনীয় ; যাহা ধর্ম্মভাব ও নীতিজ্ঞানকে সুদৃঢ় করে, রুচিকে নির্ম্মল করে, আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত করে, সম্বন্ধের পবিত্রতা স্মরণপূর্ব্বক গৃহ পরিবার ও সমাজের হাওয়া বিশুদ্ধ রাখে, এক কথায় যাহা আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ করে তাহাই সকল দেশের সভ্যতা হইতে গ্রহণীয়।

একটা কথা আছে "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং"। দর্শন ও পঠন দ্বারা জীবনের অর্দ্ধ গঠন হয়, বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। সিনেমায় দেখা চোরডাকাতের অসম-সাহসিকতা এবং অদ্ভুত কৌশল, চুরিডাকাতির দূষণীয়তা ভুলাইয়া অনেক তরুণ মনকে সেই সাহসিকতা ও কৌশলকলার মোহে অভিভূত করে এবং চুরিডাকাতিতে লিপ্ত করে। যাহা বার-বার চক্ষে দেখা যায় তাহার সম্বন্ধে মানুষের ঘৃণা কমিয়া আসে, বিশেষ হাস্যরস যদি তাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎসারিত হয়। তখন কতকগুলি অশ্লীল হাবভাব এবং দুষ্কার্য্য যেন একটা ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার হয়।

রাস্তাঘাটে গৃহে পরিবারে যাহা চক্ষে পড়ে তদপেক্ষা রঙ্গ-ভূমিতে যাহা অভিনীত দেখা যায়, তার ছবি মনে দৃঢ় অঙ্কিত থাকে, মনের চিন্তা এবং প্রবৃত্তির উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং অবস্থাবিশেষে কার্য্যেও তাহার প্রভাব প্রকাশ পায়। সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। শক্তিশালী লেখকের দ্বারা চিত্রিত চরিত্র মনের মধ্যে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়। আমরা নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাদের সঙ্গে লইয়া বেড়াই এবং সঙ্গগুণে যাহা ঘটিতে পারে, সাধু-অসাধু ভেদে তাহা ঘটিয়া থাকে। এ-দেশে নারীর সতীত্ব অর্থাৎ স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম এবং শারীরিক সংযম ও শুচিতা চিরকাল নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত এবং আদৃত হইয়া আসিয়াছে। সীতা, সাবিত্রী ও দয়মন্তী প্রভৃতি নারীর কথা পড়িয়া এবং মুখে মুখে শুনিয়া ভারতে নারীর উচ্চ আদর্শ সেই ভাবেই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু যে-আদর্শ নারীকে দুশ্চরিত্র স্বামীর সেবাদাসী ও খেলার জিনিষ করিয়া রাখে, যাহা নারীকে আত্মমর্য্যাদা হইতে ভ্রষ্ট করে, এরূপ আদর্শও এ-দেশে আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইউরোপের মহাদেশের উপন্যাসগুলির তর্জ্জমা এবং তাহাদের একান্ত অনুকরণে লিখিত গল্প-উপন্যাস একদল তরুণ-তরুণীর প্রেম ও নীতির যে-আদর্শ নূতন করিয়া গড়িয়া দিতেছে তাহা আরও বহু গুণে শোচনীয়। আমার মনে হয়, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের

হাতে এই সব বই দেওয়া বিধেয় নহে।

সাহিত্যের সমালোচক হইতে আমি ভয় পাই। অনেকের মত যে, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্প-কলার সম্বন্ধে—অর্থাৎ আর্ট সম্বন্ধে—নীতিবাদ খাটে না। অভিপ্রায়মূলক সাহিত্য, অর্থাৎ কোনও নীতির প্রচারের অভিপ্রায়ে, মানুষকে ভাল হইবার জন্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া যাহা লিখিত তাহা আর্ট নয়। যাহা সুন্দর এবং আনন্দ দেয় তাহাই আর্ট। এ কথা মানিয়াও কিন্তু বলিতে হয় যে, এক জিনিষই সকলের কাছে সমান সুন্দর এবং মধুর না-ও লাগিতে পারে। ফুলের নির্ম্মলতা, সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ সকল মানুষকে সমান আনন্দ দেয় না। মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ ও আনন্দানুভূতির মূলে থাকে তাহার রুচি। এই রুচিকেই সর্ব্বাগ্রে সুগঠিত এবং বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক। কু-সাহিত্য, কু-দৃশ্য মানুষের রুচিকে বিকৃত করে। যে-রকম সমাজনৈতিক ধারণা এবং তদনুরূপ আচরণ এ-দেশে ছিল না অথবা কেবল কদাচিৎ দেখা যাইত, তর্জ্জমা-করা উপন্যাসের অনুকরণে সেই ধারণা, সেই আচরণ এবং নারীপুরুষের অবৈধ সম্বন্ধের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দেশের নূতন সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পুস্তককে কলঙ্কিত করিতেছে। সাহিত্য যখন ভবিষ্যৎ সমাজের জীবনকে গঠন করে তখন এরূপ সাহিত্যকে উৎসাহ না দেওয়াই উচিত। আর্ট নাম দিয়া অনেকে অনেক কিছু ক্ষমা করিতে প্রস্তুত। আমাদের দেশেই প্রাচীন অনেক ভাস্কর্য্যে অনেক কিছু আছে যাহা সাধারণ লোকের রুচিকে আঘাত করে। বর্ত্তমান শিল্পীরা তাহা অনুকরণ করেন না। আমাদের দেশের কাব্যে অনেক স্থানে অশ্লীল উপমার বর্ণনা আছে, এখন তাহা সুরুচিসঙ্গত মনে হয় না। সে-কালের আদিরসঘটিত রচনা এবং বর্ত্তমানের রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীতে আকাশপাতাল পার্থক্য। আমরা কোন্‌টাকে এখন উচ্চাসন দিই? আমাদের তরুণ সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের সাহিত্য সাধনা দ্বারা দেশের চিন্তা ও চরিত্রকে উন্নত করুন এই প্রার্থনা।

একটা প্রশ্ন ওঠে "যাহা সত্য অর্থাৎ মানবজীবনে এবং সমাজে যাহা ঘটে, সাহিত্যে তাহা কেন স্থান পাইবে না?" অনেক তরুণ-তরুণীই আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার উত্তরে আমি বলি "সাহিত্যে আর্ট" এই জন্য। যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দদায়ক, যাহা মনকে উর্দ্ধমুখ করে তাহাই আর্ট। চিত্রকর নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, পুষ্পাদি অঙ্কিত করেন, কিন্তু নর্দ্দমা ইত্যাদি অপবিত্র এবং কুদৃশ্য স্থান আঁকেন না। ঐ স্থানগুলিও সত্য এবং মানুষের পক্ষে আবশ্যক।

তরুণদিগের চালচলন এবং নৃত্য-অভিনয়াদি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, নৃত্য মাত্রই দূষণীয় নয়। স্বাধীনভাবে চলাফেরা স্বাভাবিক এবং আবশ্যক, কিন্তু তাঁরা যেন সর্ব্বপ্রযত্নে বিদেশীয় বেশ-বিন্যাসের এবং নৃত্যাদির নির্লজ্জতাটুকু পরিহার করেন। আপনার শরীরকে সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখুন, উহা সকলের চক্ষের সম্মুখে অর্দ্ধাবৃত ও লোভনীয় করিয়া দেখাইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা পশ্চিমের বর্ত্তমান যুগের নারীদের পাইয়া বসিয়াছে, তাহা তাহাদের দেশেও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। দেহের সৌন্দর্য্যই নারীর চরম সৌন্দর্য্য নহে।

বিদেশ হইতে আনীত একটা কচুরি-পানা আজ বঙ্গদেশের নদী, বিল, খাল, পুষ্করিণী ছাইয়া ফেলিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কে জানে বিদেশী সাহিত্যের দুই-একটা

আবর্জ্জনা ও বিদেশী নৃত্যের কুরুচির দ্বারা কত গৃহপরিবারে দুর্নীতি প্রবেশ করিবে।

সুরুচির পথে সুনীতি এবং সুনীতির সহিত যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, এবং যাহা শুভ তাহাই আমাদের তরুণ সমাজকে গৌরবান্বিত করুক।

প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩৯

সংযোজন

মহিলা-পরিষদ

আমি অনেক দিন পর্য্যন্তই কলিকাতায় বাস করি না, কাজেই এখানকার রমণীদের বিশেষতঃ আধুনিক রমণীদের নিকট আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। দিন কয়েক পূর্ব্বে আমি এই পরিষদের কথা অর্থাৎ ইহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী জানিতে পারিয়া ইহার প্রতিষ্ঠাত্রীদের মনে মনে সাধুবাদ করিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি আধুনিক সকল বিষয়েই মহিলাদিগকে শিক্ষা প্রদান ও সকলকে সহানুভূতি-সূত্রে একত্রে গ্রথিত করাই ইহার অভিপ্রায়। পাশ্চাত্য জগতে দেখা যায় যে, অনেক বালক বালিকাকেই অতি অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ- পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলেও বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহারা নিজেদের সুশিক্ষিত করিয়া লয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিতই শিক্ষার সমাপ্তি হয়, সেইজন্যই মোটের উপর বিলাতের লোকেরা আমাদের অপেক্ষা সুশিক্ষিত। সেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিবার জন্য যে কত উপায়ই রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। শ্রমজীবীদের সমস্ত দিন কাজ করিতে হয়, সুতরাং তাহাদের জন্য Night School অর্থাৎ রাত্রিকালীন বিদ্যালয় আছে ; সব সময়েই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকেরা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজ অবসর মত যাহার ইচ্ছা সে এই সকল স্থানে যাইয়া নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। সেখানে অনেক কৃষকেরাও অণুবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। সভাসমিতি ইত্যাদি গঠনপূর্ব্বকই এইরূপ শিক্ষার বিস্তার হয়। এইরূপ সভা ও সমিতি যে শুদ্ধ জ্ঞান উপার্জ্জনেই সহায়তা করে, তাহা নহে ; ইহা হৃদয় বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করে। বহুসংখ্যক লোক একত্র হইয়া বাক্যালাপ করিলে নানা বিষয়ে আলোচনা করিলে হৃদয়ের ভাবেরও বিনিময় হয়, পরস্পর পরস্পরের সহিত সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। আমি বহুকাল পূর্ব্বে সহানুভূতি সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি আখ্যায়িকা (রূপক) পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। অদ্য তাহার অনুবাদ আপনাদের নিকট পাঠ করিয়া তৎপরে তাহা পাঠে আমার মনে যেরূপ ভাব হইয়াছিল তাহা এই স্থানে বিবৃত করিব। মহিলা-পরিষদে এই আখ্যায়িকাটির অবতারণার সার্থকতা তাহা হইলে আপনারা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবেন।

*   *   *   *   *

সূর্য্য কিরণের ক্রীড়াভূমি সমুদ্রতীরে *জীবন*, সারাদিনই বসিয়া আছে, মৃদু সমীরণ তাহার কুন্তলের সহিত সমস্তক্ষণই খেলা করিয়াছে। তাহার সুকোমল তরুণ মুখখানির দৃষ্টি জল-রাশির অপর পারে ; মুখখানির ভাব প্রতীক্ষাব্যঞ্জক, যেন সে কিসের জন্য নিতান্ত একাগ্র ভাবে অপেক্ষা করিতেছে ; কিন্তু তাহার হৃদয় প্রতীক্ষার ভাবে পূর্ণ হইলেও, এই প্রতীক্ষা যে কাহার অথবা কিসের জন্য তাহা সে নিজেও জানিত না।

সারাদিন ধরিয়া সমুদ্রের ঢেউগুলি তীরে ছুটাছুটি করিতেছে, একবার ছুটিয়া বালুকা ক্রোড়ে পড়িতেছে আবার তৎক্ষণাৎই সে ক্রোড় ছাড়িয়া সমুদ্র ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া

পড়িতেছে; ক্রীড়াসঙ্গী নানাবর্ণের ঝিনুকগুলিও তাহার অনুসরণ করিতেছে।

জীবন সমুদ্রতীরে বক্ষে সূর্য্য কিরণ লইয়া কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

* * * * *

জীবন দীর্ঘ প্রতীক্ষাবশতঃ শ্রান্ত হইয়া মস্তক নিজ জানুদ্বয়ের উপর রাখিয়া বসিয়া রহিল; অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত হইয়া পড়িল, কিন্তু এই অবস্থাতেও প্রতীক্ষার ভাব ঘুচিল না।

* * * * *

ইত্যবসরে একখানি তরণী বালুকাতটে ঠেকিল ; *প্রেম* তাহা হইতে তীরে অবতরণ করিল। তাহার পদশব্দে জীবনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রেমের হস্ত জীবনকে স্পর্শ করিল, তাহার হস্তস্পর্শে জীবনের হৃদয়খানির ভিতর কি অপূর্ব্ব আলোড়ন ও স্পন্দনই উপস্থিত হইল! মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্র প্রেমের বিশাল ও প্রশান্ত নয়নের সহিত তাহার নেত্রদ্বয়ের মিলন হইল। সেই মুহূর্ত্তেই তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, সে বুঝিতে পারিল কাহার শুভ আগমন প্রতীক্ষায় সে এতক্ষণ সমুদ্রতীরে বসিয়াছিল।

প্রেম জীবনকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া নিজ সন্নিকটে টানিয়া লইল। প্রেম ও জীবনের মিলন হইতে একটি দুর্ল্লভ ও সুন্দর পদার্থের জন্ম হইল। নবজাত শিশু "আনন্দ" অথবা "অভূতপূর্ব্ব আনন্দ" নামে অভিহিত হইল। ইহার স্ফূর্ত্তি, চঞ্চল, চিরক্রীড়াশীল জলের সহিত সূর্য্যকিরণের সম্মিলন জনিত স্ফূর্ত্তিকেও ম্লান করিয়া দিল। গোলাপকোরকগুলির সূর্য্যের প্রথম চুম্বন-লাভের আশায় উৎফুল্লিত বিম্বাধরগুলির আরক্তিম সৌন্দর্য্যও নবজাত "আনন্দের" সৌন্দর্য্যের নিকট পরাভব মানিল। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীগুলির কি দ্রুত বেগ,—ইহার ক্ষুদ্র শরীরখানি কি সুন্দর উষ্ণ ও সুকোমল! কথা বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু অধরপ্রান্তের সুমিষ্ট হাস্যটি ভাব প্রকাশে কথাকেও পরাস্ত করিত। সে সূর্য্যকিরণে কি সুন্দর খেলাই করিত!

প্রেম ও জীবনের সুখের সীমা নাই। দুই হৃদয়ের অকথিত ভাষা একই —"এই অতুলনীয় আনন্দকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি, সে যাবজ্জীবন আমাদেরই থাকিবে।"

অতঃপর এমন একটা সময় উপস্থিত হইল, যখন তাহাদের আনন্দ আর পূর্ব্বের আনন্দ রহিল না। (দিন, মাস, বর্ষ গণনা দ্বারা এই সময়ের হিসাব দিতে পারি না, কেননা প্রেম ও জীবনকে পৃথিবীর সময়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না) আনন্দের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, এখনও সে হাসিত, খেলিত, ও তাহার ক্ষুদ্র রক্তিম ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ ফলের রসে অধিকতর আরক্তিম করিত। পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ইহাই লক্ষিত হইত যে অনেক সময়েই তাহার ক্ষুদ্র হস্তদ্বয় শ্রান্তভাবে পার্শ্বদেশে পড়িয়া থাকিত ও নেত্রদ্বয় উদাসভাবে জলরাশির অপর পারে চাহিয়া থাকিত।

জীবন ও প্রেম এখন আর পরস্পরের চক্ষের দিকে তাকাইতে সাহস করিত না, মুখ ফুটিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না "আমাদের প্রাণের ধনের কি হইয়াছে?" দুইখানি চিন্তাকুল ও ব্যথিত হৃদয় নিজকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিত "ইহা কিছুই নহে, আগামী কল্যই ইহার সকল অসুখ সারিয়া যাইবে, কল্যই হয়ত তাহার হাস্য কলরব আমাদের কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিবে।"

অতঃপর কত কল্যই আসিল ও গত হইল **শিশু কিন্তু** আর তাহার পূর্ব্বভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইল না। পথ পর্য্যটনকালে তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া ক্রীড়ারত রহিলেও ক্রমশঃই তাহাকে অধিকতর শ্রান্তিভারাক্রান্ত দেখাইতে লাগিল।

একদিন জীবন ও প্রেম নিদ্রাভঙ্গে আনন্দকে আর তাহাদের পার্শ্বে দেখিতে পাইল না। নিকটেই তৃণাসনে বিষাদ ও করুণাতে বিস্ফারিতনেত্র একটি অপরিচিত শিশু বসিয়াছিল বটে, কিন্তু দুঃখে ম্রিয়মাণ উভয়ের মধ্যে কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। জীবন ও প্রেম পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে "আমাদের আনন্দ, আমাদের অন্তর্হিত আনন্দ, সত্যই কি আমরা তোমাকে হারাইলাম? এ জীবনে কখনই কি আর তোমাকে দেখিতে পাইব না?" বলিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল।

করুণাময় ও বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া ক্ষুদ্র অজ্ঞাত শিশুটি তাহাদের নিকটে আসিয়া স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা উভয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরস্পরের সন্নিহিত করিল এবং তাহারাও ইহাকে মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল। জীবন যখনই শোকে অভিভূত হইয়া চক্ষু নত করিত, তখনই শিশুর সুকোমল চক্ষে নিজের অশ্রুরাশি প্রতিফলিত দেখিত। প্রেম তীব্র যন্ত্রণায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যখনই বলিত "আমি যে পথক্লেশে বড়ই শ্রান্ত, পদদ্বয় যে চলিতে চাহে না, পথও ত দেখিতে পাইতেছি না, সম্মুখে ঘন অন্ধকার। আলোকরাশি কি কেবলই পশ্চাতে?" তখনই সে তাহার ক্ষুদ্র রক্তাভ অঙ্গুলী দ্বারা গিরি-পার্শ্বে যেখানেই একটু আলোকের রেখা থাকিত, তাহা দেখাইয়া দিত। ইহার বিশাল নয়নদ্বয় সর্ব্বদাই বিষাদ ও চিন্তাপরিপূর্ণ থাকিলেও ওষ্ঠদ্বয় স্নিগ্ধ হাস্যে রঞ্জিত থাকিত।

তীক্ষ্ণধার প্রস্তরে যখনই জীবনের পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইত শিশু নিজ পরিচ্ছদ দ্বারা ক্ষতস্থানের রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া সে স্থান চুম্বন করিত। মরুভূমিতে প্রেম যখন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িত (প্রেমও সংসারে অনেক সময়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়) শিশু তপ্ত বালুকার উপর দিয়া নগ্নপদে ছুটিয়া তাহার নিকট যাইত এবং সেই মরুভূমির মধ্যেও পাহাড় খুঁজিয়া বাহির করিয়া কোথাকার কোন্ অজ্ঞাত গহ্বরের ভিতরে যাইয়া জলের সন্ধান করিয়া তাহা আনিয়া প্রেমের শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় জলসিক্ত করিত। সে নিজে কখনও তাহাদের ভারস্বরূপ হয় নাই, ইহাকে দিয়া তাহাদের সুবিধা ব্যতীত কিঞ্চিৎমাত্রও অসুবিধা হয় নাই। বস্তুতঃ ইহাকে পার্শ্বে না পাইলে তাহাদের সংসার-পথে ভ্রমণ করাই দুরূহ হইত।

অতঃপর যখন ইহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারখণ্ডমণ্ডিত অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুর্গম গিরি সঙ্কটে উপস্থিত হইল (প্রেম ও জীবনকে অনেক সময়েই এইরূপ অজ্ঞাত ও ভীষণ পথ দিয়া চলিতে হয়) যেখানকার সকল পদার্থই তুষারাবৃত থাকিয়া তাহাদের তুষার শীতল নিঃশ্বাসে পথযাত্রীদের শরীর অবশ করিয়া দেয়, তখনও এই শিশু তাহাদের শীতক্লিষ্ট হাতগুলি নিজ উষ্ণ বক্ষমধ্যে রাখিয়া উত্তপ্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছিল এবং কৃতকার্য্য হইয়া তাহাদিগকে গন্তব্যপথের দিকে লইয়া গিয়াছিল।

এই স্থান অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন সূর্য্যালোক ও পুষ্পের রাজ্যে প্রবেশ করিল, তখন শিশুর কি আহ্লাদ! মুখখানি হাস্যের আভাতে উদ্ভাসিত হইল। হাস্যোজ্জ্বল মুখে সে কোমল দূর্ব্বাদলের উপর ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। বৃক্ষের কোটর হইতে মধুর অনুসন্ধান

করিয়া করতলে ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে উপহার দিল, তৃষ্ণানিবারণার্থে পানীয় পদ্মপত্রে বারি আনয়ন করিল ; নানাবিধ পুষ্প চয়নপূর্ব্বক মালা গাঁথিয়া তাহাদের কণ্ঠে পরাইয়া দিল। তাহার সুমধুর হাস্যরঞ্জিত মুখ দেখিয়া তাহাকে প্রফুল্লতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ অনুমিত হইতেছিল। ইহার স্পর্শ আনন্দের স্পর্শের অনুরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু তারতম্য ছিল। স্পর্শকালীন অঙ্গুলি সঞ্চালনের মধ্যে ইহার যেন কেমন একটা মধুর স্নেহ-কোমল ভাব ছিল।

এই ভাবে জীবন ও প্রেম ও এই শিশুটি অনেক পথ পর্য্যটন করিল, কখনও বা অন্ধকারের ভিতর দিয়া,—কখনও আলোকের মধ্য দিয়া—কিন্তু শিশুটির স্থান ছিল উভয়ের মধ্যস্থলে। সে যেন মধ্যস্থলে থাকিয়া উভয়েরই মনে সাহস আনিয়া দিত।

জীবন ও প্রেম অনেক সময় তাহাদের প্রথমজাত উজ্জ্বল আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিত, "তাহাকে যদি আমরা ফিরিয়া পাইতাম।"

সময়ক্রমে তাহারা "অতীত চিন্তার" আবাসভূমিতে উপস্থিত হইল। "অতীত চিন্তা" নাম্নী এই বর্ষীয়সী রমণীর প্রকৃতিতে একটু বিশেষত্ব আছে, তাহার একখানি হস্ত সে সর্ব্বদাই এক পার্শ্বের জানুর উপর ও অপর হস্ত চিবুকে স্থাপনপূ··ক বসিয়া থাকে। ইহার আর একটু বিশেষত্ব এই যে, সে সর্ব্বদাই অতীত হইতে আলোক অপসরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেয়।

জীবন ও প্রেম তাহাকে দেখিবামাত্র সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "জ্ঞানময়ী জননি, আমাদের একটি সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিন। আমাদের প্রথম মিলনকালে, আমরা এক অভিনব সুন্দর ও অত্যুজ্জ্বল পদার্থের অধিকারী হইয়াছিলাম। অশ্রুবিহীন সুখ ও ছায়াশূন্য সূর্য্যালোক আমাদের নিজস্ব ছিল, কোন্ অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য আমরা ইহাকে হারাইলাম ; কোথায় গেলে ও কি করিলে আমরা তাহাকে পাইব অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিন।"

সেই বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা বলিলেন, "তাহাকে পাইবার জন্য তোমাদের মধ্যস্থিত শিশুটিকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছ কি?"

প্রেম ও জীবন উভয়েই ব্যথিত কণ্ঠে সন্ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "অসম্ভব"।

জীবন বলিল, "ইহাকে পরিত্যাগ করিব? দুর্গম পথে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, কে সেই কণ্টকবিষ স্বীয় সুকোমল ওষ্ঠদ্বারা চুষিয়া ক্ষতস্থান সুস্থ করিয়া দিবে? শিরঃপীড়াকালে কে সেই ব্যথিত মস্তকের বেদনা দূর করিয়া দিবে? কে তাহার স্নেহ শীতল করস্পর্শে শিরঃপীড়া জনিত ধমনীগুলির বেগাধিক্য প্রশমিত করিয়া দিবে? শীত ও অন্ধকারে কে আমার শীতে অবশ হৃদয়কে উষ্ণ করিবে?"

প্রেম বলিল, "এই শিশু হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয়। 'আনন্দ' ব্যতিরেকেও প্রাণধারণ সম্ভবপর কিন্তু এই শিশু বিহীন হইয়া আমি প্রাণধারণে একেবারেই অক্ষম।"

বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা বলিলেন, "নির্বোধ ও অন্ধ সন্তানদ্বয়, তোমাদের পূর্ব্বেও যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। প্রেম ও জীবনের মিলনকালে একটি ছায়াবিহীন উজ্জ্বল পদার্থের জন্ম হয়। যখন পথ বন্ধুর হইতে আরম্ভ হয়, যখন ছায়াদ্বারা অন্ধকারের উৎপত্তি হয়, যখন

দিনগুলি কঠোর, রাত্রিগুলি দীর্ঘ ও তুষার শীতল হইতে থাকে তখনই এই উজ্জ্বল পদার্থের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। জীবন ও প্রেম ইহা দেখিয়াও দেখিতে চাহে না, জানিয়াও ভালরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না। অবশেষে এক দিন অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, ও আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠে "হা বিধাতঃ, আমরা ত আনন্দকে হারাইয়াছি, কি করিলে ও কোথাও গেলে আবার তাহাকে পাইব?"

"তাহারা বুঝে না হর্ষোৎফুল্ল আনন্দকে, মরুভূমি, হিম ও তুষারের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ অনাহত ও অপরিবর্ত্তিতভাবে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। তাহারা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না যে তাহাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী শিশুটিই তাহাদের সেই প্রথম আনন্দ—বয়োপ্রাপ্ত প্রথম আনন্দ। এই যে জীবন ও প্রেমের মধ্যস্থিত গম্ভীর, কোমল প্রাণপদার্থটি যাহা অসহনীয় শৈত্যগুণবিশিষ্ট তুষাররাশির মধ্যেও উষ্ণতা আনিয়া দেয় ও প্রচণ্ডতম মরুভূমিতেও সাহস দান করে—ইহার নাম সহানুভূতি—ইহাই পূর্ণ বিকশিত প্রেম।"

এই আখ্যায়িকাটিকে নানা অর্থে ও নানা ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। যদিও জীবন ও প্রেমকে দুইটি ভিন্ন আত্মা মনে করা যাইতে পারে, তথাপিও আমি এই রূপকটিকে সে ভাবে গ্রহণ করি নাই। আমার নিকট জীবনকে মানবাত্মার প্রতিনিধি স্বরূপ বোধ হইয়াছে, অর্থাৎ জীবন অর্থে মানব জীবন। প্রত্যেকের জীবনেই বাল্যকালের অবসানে, বাল্য ও কর্ম্মজীবনের সন্ধিস্থলে এমন একটা সময় উপস্থিত হয়, যখন আমরা নিজের জীবনটাকে পরমেশ্বরের একটা বিশেষ দান বলিয়া অনুভব করি এবং নিজ জীবনকে সেই দানের উপযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হই, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকস্থ কোন্ পথে গেলে যে ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে না পারিয়া ও পাছে অজ্ঞানতাবশতঃ ভুল পথে যাই, এই আশঙ্কাতে, আমরা সমুদ্রতীরে, সূর্য্যকিরণের ক্রীড়াভূমিতে, প্রতীক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া থাকি। পরমেশ্বরের অঙ্গুলি নির্দ্দেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনেক সময়েই আমরা সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য ও রোগে মুহ্যমান মানবমণ্ডলীর দিকে আকৃষ্ট হই। সকল নরনারীর উপরই হৃদয়ের প্রীতি ধাবিত হয়, প্রেমের হস্ত জীবনকে স্পর্শ করে, তাহার হস্তস্পর্শে জীবনের হৃদয়খানির ভিতর কি অপূর্ব্ব আলোড়ন ও স্পন্দনই উপস্থিত হয়। প্রেম হইতে আনন্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই যে আনন্দ ইহা সংসারের অভিজ্ঞতাজাত আনন্দ নহে বলিয়াই স্থায়ী হয় না। এখন পর্য্যন্তও পৃথিবীর দুঃখ, তাপ ও নিরাশা আমাদিগকে স্পর্শই করে নাই, তখন পর্য্যন্ত মনে অদম্য উৎসাহ,—প্রাণে পরমেশ্বরের সৃষ্ট নরনারীর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার ঐকান্তিকী বাসনা। লাভালাভ ও ক্ষতিবৃদ্ধি গণনার ভাব মুহূর্ত্তেকের জন্য হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কিন্তু সংসার পথ বাস্তবিক পক্ষে কঠিন ; এই পথে যাঁহারা দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহ কেহ বা ভ্রান্তিবশতঃ কেহ কেহ বা নিরাশা-প্রযুক্ত ও কেহ কেহ ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তিগুলির অপব্যবহার পূর্ব্বক নিজেদের পূর্ব্ব প্রকৃতি হারাইয়া ফেলিয়া সেই সদ্যজাগ্রত আত্মাগুলির অপকার সাধন করেন। সহানুভূতি ও উৎসাহের অভাবে ইঁহারা ভগ্নমনোরথ ও নিরানন্দ হইয়া পড়েন!

এই সময় হইতেই নবজাত প্রথম আনন্দ ক্রমশঃ মলিন হইতে মলিনতর হইয়া অবশেষে একেবারেই অন্তর্হিত হয়, অথবা তাহাদের চক্ষের অগোচর হয়। কিন্তু যে হৃদয়

একবার মানুষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, অথবা পারিয়াছে, সেই হৃদয় হইতে আনন্দ একেবারে অন্তর্হিত হইতে পারে না, সুন্দর অত্যুজ্জ্বল, অশ্রুবিহীন সুখ ও ছায়াশূন্য সূর্য্যালোক রূপান্তরিত হইয়া স্নিগ্ধ কোমলপ্রাণ সহানুভূতিতে পরিণত হয়। জীবন ও প্রেমের মধ্যস্থিত, গম্ভীর কোমলপ্রাণ পদার্থ—যাহা অসহনীয় শৈত্যগুণবিশিষ্ট তুষাররাশির মধ্যেও উষ্ণতা আনিয়া দেয় অর্থাৎ সংসারের অপ্রীতির মধ্যেও হৃদয়কে স্নেহকোমল রাখে ও প্রচণ্ডতম মরুভূমিতে অর্থাৎ সঙ্কট ও বিপদজালের মধ্যেও সাহস দান করে—ইহারই নাম সহানুভূতি—ইহাই পূর্ণবিকশিত প্রেম। সহানুভূতি তাঁহাদিগকে পৃথিবীর সকল নরনারীর সহিত সংযুক্ত করে। তাঁহারা Coleridgeএর Ancient Marinerএর ন্যায় "A sadder but a wiser man" হয়েন। এইরূপ ব্যক্তির নিকট দুর্ব্বলতার জন্য কোন মানবই একেবারে ঘৃণ্য নহে। আমরা সকলেই একই আদর্শে সৃষ্ট, সকলের মধ্যে দুর্ব্বলতার বীজ যেমন নিহিত আছে, দেবত্বলাভের সম্ভাবনাও সেইরূপই আছে। পৃথিবীরূপ বীজবপন ভূমি হইতেই স্বর্গের উৎপত্তি। নরনারী সকলেই আমরা বীজ বপন করিতেছি। কাহারও ভূমি উর্ব্বর, কাহারও অনুর্ব্বর, কাহারও ভূমির প্রকৃতি এই উভয় অবস্থার মধ্যস্থানীয়! যে সৌভাগ্যবান—যাহার ভূমি উর্ব্বর,—যাহার সুবিধা প্রভূত, তাহার কি উচিত নহে অপেক্ষাকৃত দুর্ভাগ্যবানদের সাহায্য করা? আমার মনে হয় যে সমষ্টিভূত মানব দ্বারাই পরমেশ্বররূপ মহাশিল্পীর শিল্পচাতুর্য্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে।

আমি একটা উদাহরণ দ্বারা আমার মনের ভাব আপনাদের নিকট বিশদভাবে বুঝাইয়া দিব। আপনারা এই বলয়গাছি দেখিতেছেন ত? দেখুন সমস্ত গোলকের মধ্যে এক প্রকারেরই কারুকার্য্য ; অথচ সমস্তটা অংশবিশেষে বিভক্ত। এই ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যদি দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত না হইত, এবং দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়াও যদি পরস্পর গাত্রে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন না থাকিত, তাহা হইলে যে কর্ম্মকার এই বলয় নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত না। ইহা সহজেই ভগ্ন হইয়া যাইত ও পরিধানের অনুপযুক্ত হইত। মানবজাতি সম্বন্ধেও আমরা এই কথাই বলিতে পারি। কোন স্থানে একটু ভ্রম অথবা দুর্ব্বলতা থাকিলেই আদর্শটির অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। সেইজন্যই বলিতেছি যে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ। আপনি মনে করিতে পারেন যে আপনি দুরারোহ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করিতেছেন, আমাদের সমতলভূমির দূষিত বায়ু আপনাকে কোনক্রমেই স্পর্শ করিতেছে না—আমাদের পাপ, তাপ ও ক্ষুদ্রতার সহিত আপনার কোনই সংশ্রব নাই, কিন্তু বিশেষভাবে, ব্যক্তিগতভাবে সংশ্রব না থাকিলেও অথবা সংশ্রব না রাখিলেও আপনি পরমেশ্বরের সৃষ্টি বহির্ভূত থাকিতে পারেন না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন কতটুকু। এই বলয়গাছির ন্যায় আমাদের প্রত্যেকের জীবন পরমেশ্বরের মানসস্থিত আদর্শের এক একটি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ মাত্র। এই শিল্পরচনার যে অংশেই আপনার স্থান হউক না কেন, এবং আপনার অংশটি যতই সুন্দর হউক না কেন, আমারও ত সেই রচনার মধ্যে একটু স্থান আছে এবং আমি আমার অপূর্ণতা দ্বারা ত সমগ্র রচনাটির সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দিতে পারি। সেই জন্যই বলিতেছি যে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পরমেশ্বরের সৃষ্টি নৈপুণ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তবে শুদ্ধ নিজের উন্নতি করিলেই চলিবে না,

অন্য সকলের দিকও চাহিতে হইবে। এই পৃথিবীতে কেহই নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আসে নাই। "No man liveth to himself and no man dieth to himself." এমন কি মৃত্যু দ্বারা যে স্থানটুকু শূন্য হইল তাহাও অন্য কাহারও দ্বারা পূর্ণ হইবার উপায় নাই, তাহার জীবনের কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, আবহমান কাল তাহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া থাকিবে।

আপনারা হয়ত মনে করিতেছেন যে মহিলা-পরিষদের কথা বলিব বলিয়া আমি একি মহিলা-পরিষদ নিঃসম্পর্কিত কতকগুলি অনর্থক কথা বলিতেছি! ইহা যে "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" হইল। কিন্তু ঠিক আট দিন পূর্ব্বে মহিলা-পরিষদের কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে এই ভাবগুলির উদয় হইয়াছিল বলিয়া আমি এই স্থানে তাহা সন্নিবেশিত করিলাম এবং ইহা যে নিতান্তই অসঙ্গত তাহাও মনে হইতেছে না। মহিলা-পরিষদের উদ্দেশ্য কলিকাতাস্থ মহিলাদিগকে সহানুভূতি সূত্রে গ্রথিত করা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি আধুনিক সকল প্রকার বিষয়েই মহিলাদিগের মন আকর্ষণ করা। বঙ্গ রমণীদের বুদ্ধি ও হৃদয়-বৃত্তির বিকাশ করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। ইহার প্রতিষ্ঠাত্রীদের সহৃদয়তার জন্য আমি তাঁহাদের সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি নিজে আপনাদের বক্তৃতা দিবার উপযুক্ত নহি, এবং আশা করি আপনারা ইহাকে বক্তৃতাও মনে করিবেন না, ইহা কেবল আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন মাত্র। ক্ষমতা সকলের সমান নহে, কিন্তু শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত মুষ্টিমেয়ও গ্রহণযোগ্য মনে করিয়া আমার বক্তব্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন। অনেকেরই নানা কারণে নূতন প্রকাশিত সাহিত্য পুস্তক, অথবা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক অথবা পৃথিবীর কোন্ স্থানে কি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিতেছে তাহা পাঠ করিবার সময় ও সুবিধা হইয়া উঠে না, কিন্তু এই পরিষদে মাসের মধ্যে দুই দিন দুই ঘণ্টা মাত্র সময় অতিবাহিত করিলেই অনেক বিষয় শিক্ষা করা যায়। অর্থের অভাববশতঃ যাঁহারা গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিতে পারেন না তাঁহারা পত্রদ্বারা জানাইলেই পরিষদ হইতে গাড়ী প্রাপ্ত হন, পরিষদে অন্যান্য সভাসমিতির ন্যায় চাঁদাও গ্রহণ করা হয় না, তথাপিও কলিকাতা মহানগরীর মহিলারা এমনই আলস্যরূপ জড়তাগ্রস্ত হইয়াছেন যে তাঁহারা এই স্থানে আসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, এমন কি গাড়ীর জন্য লিখিয়া পাঠাইবার উপযুক্ত উৎসাহটুকুও তাঁহাদের নাই, গাড়ী পাঠাইয়া দিলেও তাঁহারা গাড়ী ফিরাইয়া দিয়া থাকেন। এইরূপ ঔদাসীন্য ও আলস্য আমার কল্পনারও অতীত। এতগুলি মহিলা একত্রিত হইয়া নানা বিষয়ক কথাবার্ত্তা বলিবেন ইহা চিন্তা করিতেও আনন্দ বোধ হয়।

একতাতেই যে বল তাহা আর আমার আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

আমরা সকলে একত্র হইয়া কাজ করিলে কি অসাধ্য কর্ম্মই না সাধন করিতে পারি? শৈশবে আমাদের একখানা পাঠ্যপুস্তকে একটা গল্প পড়িয়াছিলাম, এই সম্পর্কে তাহা আমার স্মরণ হইতেছে। একজন লোকের পাঁচটি পুত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সদ্ভাব ছিল না, দিবারাত্রই তাহারা বিবাদ বিসম্বাদে ব্যাপৃত থাকিত। আসন্নমৃত্যু পিতা সন্তানদের মধ্যে কিছুতেই সদ্ভাব স্থাপন করিতে না পারিয়া অবশেষে বহুসংখ্যক নাতিস্থূলায়তন বংশখণ্ড (যাহাকে চলিত কথায় কঞ্চী বলে,) সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আনিবার আদেশ প্রদান

করিলেন। অতঃপর প্রত্যেকের হস্তে এক এক খণ্ড (কঞ্চী) বংশ প্রদানপূর্ব্বক তাহা দ্বিখণ্ড করিতে বলিলেন। তাঁহার কথানুসারে সকলেই নিজ হস্তস্থিত বংশখণ্ডখানি দ্বিখণ্ড করিল। তৎপরে তিনি অবশিষ্ট বংশখণ্ড সমষ্টি হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক একত্রে বাঁধিয়া পুনরায় সকলকে তাহা দ্বিখণ্ড করিবার আদেশ দিলেন। এইবার কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কেহ দ্বিখণ্ড করিতে সমর্থ হইল না। তখন তিনি তাহাদের *একতার বল* বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

আমাদের দেশে যে এখনও এত কুপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা কতকটা রমণীদের ঔদাসীন্যেরই জন্য। আমরা সকলেই যদি একপ্রাণ হইয়া যাহা কর্ত্তব্য ও মঙ্গলপ্রদ তাহা করিতে বদ্ধপরিকর হই, তাহা হইলে দেখিবেন কত শীঘ্র নূতন শুভ যুগের উদয় হইবে।

আলস্য ও ঔদাসীন্য আমাদের জাতিগত দোষ হইয়া পড়িয়াছে, আসুন আমরা পরস্পর পরস্পরকে এই অন্তঃশত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সাহায্য করি।

কেবল পাশ্চাত্য জগতে নহে, ভারতবর্ষেও বাংলা দেশ ব্যতীত অন্য সকল স্থানেই মহিলারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া একতাসূত্রে গ্রথিত হইতে প্রয়াস পাইতেছেন। আমরা বঙ্গনারীরাই কি কেবল নিশ্চেষ্টভাবে অলস শয্যায় পড়িয়া থাকিব?

অল্পদিন হইল কোন একটি বন্ধু বঙ্গমহিলাদের সর্ব্ববিষয়ে ঔদাসীন্যের কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন যে বাংলা দেশে যদিও এতদিন হইল স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপিও শিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা যেরূপ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। তিনি ঝালোয়ার নামক দেশীয় রাজার অধীন একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে সেখানে ৪/৫ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে সেই স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ৩০০ হইয়াছে। আর ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য কি উৎসাহ!

আমরা এই পরিষদে বিনা খরচে কত বিষয় জানিতে পারি, কত বিষয় আলোচনা করিতে পারি ; কিন্তু আমাদের সেই ইচ্ছাই নাই। ইচ্ছা ও উৎসাহ না থাকিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে, জোর করিয়া নিজেদের সর্ব্বপ্রকার শুভকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রথমে অপ্রীতিকর হইলেও পরস্পরের জন্য পরস্পরের সহানুভূতি আমাদিগকে বলদান করিবে। আপনারা সকলে কি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন না? এই প্রকার কোন একটা সভা ও সমিতিভুক্ত হওয়াতে যে সকল প্রকারেই কত উপকার তাহা কি আর আমাকে আপনাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ Free Mason-দের[৩৮] কথাই বলি। এখানকার ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে বলিতে গেলে একেবারেই সদ্ভাব নাই, কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে কোন ভারতবর্ষীয় Free Mason হইলে ইংরাজ Free Mason-রা কখন তাহাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে না। এক লক্ষ্য থাকিলে একতা ও সহানুভূতি না আসিয়া পারে না। একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিতভাবে কাজ করিবার জন্যই পরমেশ্বর আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরকে নির্ভরশীল করিয়াছেন। *সম্পূর্ণ একা থাকিয়া, নিজকে লইয়া মানুষ কখনই সুখী হইতে পারে না।* আপনারা সম্ভবতঃ সকলে নিজ পরিবার লইয়াই সুখী, সেই ক্ষুদ্র বৃত্তই আপনাদের সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি প্রদান করিতেছে, বাহিরের অন্য কোন সম্পর্ক আপনাদের পক্ষে

নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করেন। কিন্তু তাহা হইলেও ত আপনারা ঈশ্বরের বৃহত্তর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর সকলেই ত সুখী নহে ; রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য কত লোককে ব্যথিত করিতেছে, জীবন অসহনীয় করিতেছে, তাহাদের সাহায্যের জন্য নিজের সুখ ও শান্তির ব্যূহ হইতে একটু বাহিরে আসুন। আপনাদেরই ন্যায় আর দশজনের সহিত মিলিত হইয়া কি প্রকারে সংসারের দুঃখ মোচন করিতে পারেন, দেখুন। আপনাদের এই সমিতি ভবিষ্যতে কত কল্যাণ করিতে পারিবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে একতা এবং সহানুভূতির নিতান্তই প্রয়োজন। এই যে বিদ্যালয়ের ছাত্রীগুলি, সংসার যাঁহাদের নিকট অছিন্নপত্র, অপঠিত পুস্তকস্বরূপ—যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইবার জন্য একাগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের আপনারা কত সাহায্য করিতে পারেন, জীবনপথের পথিকদের সহানুভূতি দ্বারা কত উপকার করিতে পারেন!

আমার এই সম্পর্কে একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। আমি বার্লিনে একটা Damen Hospiz অর্থাৎ শুদ্ধ ভদ্রমহিলাদের থাকিবার পান্থনিবাসে ছিলাম। ইউরোপের নানা দেশ বিদেশ হইতে আগত মহিলারাই সেখানে থাকিতেন। একটি আমেরিকান মহিলা ও আমি ব্যতীত আর সকলেই জর্ম্মান ভাষাতে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারা কথাবার্ত্তাও জর্ম্মান ভাষাতেই বলিতেন, ইংরাজী একেবারেই জানিতেন না। আমেরিকান মহিলাটির বয়স ২৬/২৭এর অধিক নহে, গীতবাদ্য শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য বৎসরেক পূর্ব্বে বার্লিনে আসিয়াছিলেন। তিনি ভালরূপে জর্ম্মান ভাষা বলিতে না পারিলেও সব কথাই বুঝিতে পারিতেন। আমি কিন্তু কথাও বুঝিতাম না। সুতরাং এই ইংরাজী ভাষাটাই আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধনস্বরূপ হইয়াছিল। প্রতিদিন ১০/১১ ঘণ্টা গান ও বাজনা প্রাক্‌টিস্ করিয়া তাঁহার বড় একটা সময় থাকিত না, কিন্তু তথাপিও সময় পাইলেই আমার ঘরে আসিয়া আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেন।

একদিন হঠাৎ আমার দ্বারে বারংবার করাঘাত শুনিয়া আমি ভিতর হইতে প্রবেশের অনুমতি দিলাম, দেখি, সেই আমেরিকান মেয়েটি উপস্থিত, কিন্তু তাঁহার সমস্ত মুখখানি আনন্দপূর্ণ। আমি হাসিয়া বলিলাম, "কি শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছ? তোমাকে কোন সুপ্রসিদ্ধ গীতবাদ্য-বিশারদ ব্যক্তি কি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "না, ট্রামে আসিতে আসিতে আমার একটি আমেরিকান যুবকের সহিত পরিচয় হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "ইহাতেই এত আনন্দ! আর তুমি পরিচয় হইয়াছে বলিতেছ কেন? তাহাকে কি পূর্ব্বে চিনিতে না? আর না চিনিলে, কি প্রকারেই বা জানিতে পারিলে সে তোমার স্বদেশীয় ব্যক্তি? স্বদেশীয় হইলেও পূর্ব্বে পরিচয় না থাকিলে, তাহার স্বভাব চরিত্র তোমার জানা সম্ভবপর নহে, এস্থলে একজন অপরিচিতের সহিত কথাবার্ত্তা বলাটা ত আমার সঙ্গত মনে হয় না।"

তিনি আমার কথায় বিরক্ত না হইয়া হাসিয়াই অস্থির। বলিলেন, তিনি যে কলেজে পড়িতেন সেই কলেজ সংশ্লিষ্ট একটা সমিতি আছে। ভাল ভাল লোক বাছিয়া সে সমিতির সভ্য করা হয়। সকল সভ্যই প্রাণপণে তাহাদের জীবন দ্বারা পৃথিবীর যতটুকু পারে উন্নতি করিতে প্রতিশ্রুত হয়। সকল সভ্যেরাই সেই সমিতির একটা নিদর্শন অর্থাৎ distinctive

badge পরিধান করে, এই মহিলাটি সেই badge দেখিয়াই তাহাকে সেই সমিতির সভ্য বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং সেইজন্যই সাহস করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হন। সেই চিহ্নে চিহ্নিত ব্যক্তিরা কখন চিন্তা বাক্য অথবা দৃষ্টির দ্বারা তাহাদের উচ্চ আদর্শের অপলাপ করিবে না, ইহাই সেই মহিলাটির ধ্রুব বিশ্বাস।

আমি তাঁহার অসীম বিশ্বাস দেখিয়া যেমন বিস্মিত সেই প্রকার প্রীত হইলাম। আমার মনে হইতে লাগিল যে সেই যুবক যদি ইঁহার কথা শুনিতে পাইত, তাহা হইলে তাঁহার উৎসাহ নিশ্চয়ই দ্বিগুণীভূত হইল।

আপনারাও ইচ্ছা করিলেই এই পরিষদকে King Arthurএর Round Table করিতে পারেন।

"A glorious company, the flower of *women*
To serve as a model for the mighty world
and be the fair beginning of a time.
* * * * *
To break the *frivolities* and uphold the good
To ride abroad redressing human wrongs
To speak no slander, no, nor listen to it
To honour her own word as if her Gods.
* * * * *
And teach high thought and amiable words
And courtliness, and the desire of fame
And love of truth, and all that makes a man."

অর্থাৎ :—রমণীজাতিরূপ পুষ্পদলের শ্রেষ্ঠ ফুলগুলি চয়নপূর্ব্বক একটী দল গঠিত হউক। এই দল যেন বিশাল সসাগরা ধরণীর আদর্শস্থানীয় হইয়া পৃথিবীতে নূতন শুভ যুগের অভ্যুত্থান করে। তাহারা যেন পৃথিবীকে সকল প্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া উন্নত ও শুভ পথে লইয়া যায়।

* * * * *

তাহাদের রসনা কখনও যেন পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা দোষে কলুষিত না হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় যেন এই বিষয়ে বধিরতা প্রাপ্ত হয়। তাহাদের বাক্যে ও কার্য্যে যেন পার্থক্য না থাকে। পরমেশ্বরের বাণীজ্ঞানে যেন তাহাদের প্রত্যেক বাক্য নিজের নিকট সম্মানিত হয়।

* * * * *

তাহাদের দৃষ্টান্ত যেন পৃথিবীর সকল নরনারীকে উন্নত চিন্তা, স্নেহ কোমল ভাব, সৌজন্য, যশাকাঙ্ক্ষা, সত্যে অনুরাগ এবং আরও অন্যান্য গুণাবলী যাহা দ্বারা আমরা প্রকৃত মনুষ্য নামের অধিকারী হইতে পারি, তাহা আমাদের চক্ষের সমক্ষে চির উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয়।*

শ্রীযামিনী সেন

সুপ্রভাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

---

* মহিলা পরিষদের অধিবেশনে পঠিত।

কবি কামিনী রায়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

বর্ষচক্র দ্বিতীয়বার আবর্ত্তিত হইয়া আসিল, গত ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন মহাষ্টমী তিথিতে, ইং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, যুগাবতার রাজা রামমোহন রায়ের শততম মৃত্যুবাসরে, প্রতিভার বরপুত্রী, "আলো ও ছায়া"-র যশস্বিনী রচয়িত্রী, সুকবি কামিনী রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। শৈশব হইতে আমি সেই বিদুষী মহিলা কবির নাম শ্রদ্ধা করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। কৈশোর হইতে আমি তাঁহার রচনার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, শান্ত গাম্ভীর্য্য, অনির্ব্বচনীয় রস-মাধুর্য্য, সরল আন্তরিকতা, পবিত্র রুচি ও অতুলনীয় ভাব-সম্পদে বিমোহিত হইয়াছিলাম। পরে, দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইয়া, সাহিত্যালাপ করিয়া এবং তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া পরম উপকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত একটি কথাও লিখিবার প্রয়াস পাই নাই। কবি কামিনী রায়ের স্বর্গারোহণের কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করিলে আমি 'মাতৃ-স্মৃতি" লিপিবদ্ধ[৩১] করিবার সময়ে বুঝিয়াছিলাম, যেখানে স্নেহের ঋণ অপরিসীম, সেখানে কথা গাঁথিয়া শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদানের প্রয়াস ব্যর্থ হইবেই। সেই জন্য আমি দ্বিতীয়বার এরূপ প্রয়াস হইতে বিরত ছিলাম।

আমি যে কখনও কবি কামিনী রায়ের সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, তাঁহার সহিত সাহিত্যালোচনার সুযোগ পাইব, তাঁহার হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের বিবিধ সদ্‌গুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইব, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাঁহার সৌজন্য ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের, বিনয় ও শিষ্টাচারের মধুর স্মৃতি চিরদিন আমার হৃদয়পটে সমুজ্জ্বল থাকিবে। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কয়েকখানি পত্র আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন-চরিত-রচয়িতার উপকারে আসিতে পারে মনে করিয়া এই পত্রগুলি আজ এই ক্ষুদ্র ভূমিকা সহ প্রকাশিত করিতেছি।

কবি কামিনী রায়ের পিতা, "মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী", "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ", "অযোধ্যার বেগম" প্রভৃতি বিখ্যাত ইতিহাস-মূলক গ্রন্থের প্রণেতা চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের সহিত মুন্সীগঞ্জে, বোধ হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, আমার পিতৃদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আলাপ হয়। চণ্ডীবাবু তখন মুন্সীগঞ্জে মুন্সেফ ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের উজ্জ্বল রত্ন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জ্যোতিষ দে মহাশয়ের পিতা (এক্ষণে অবসর-প্রাপ্ত সবজজ) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এবং শঙ্কর ঘোষের বংশীয় অনন্তরাম ঘোষ (ইহাঁকে চণ্ডীবাবু গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য "মহর্ষি" আখ্যা দিয়াছিলেন) মহাশয়গণও সেখানে তখন মুন্সেফ ছিলেন। পিতৃদেব অল্পকালের জন্য সেখানে অস্থায়ী ভাবে মুন্সেফ হইয়া গিয়াছিলেন। পিতৃদেবের মুখে চণ্ডীবাবুর নানা প্রকার রঙ্গ-রহস্যপূর্ণ গল্প আমি বাল্যকালে শুনিতাম। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে, চণ্ডীবাবু দুই

জনের খুব সুখ্যাতি করিতেন। একজন ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান *কেদারনাথ রায় এবং অপর জন (অধুনা অবসর-প্রাপ্ত জিলা জজ) শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর। তখনও কেদারনাথের সহিত কামিনী সেনের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু উভয়েই পরস্পরকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তখন "আলো ও ছায়া" প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল এবং কেদারনাথ রায় এবং অন্যান্য সুপণ্ডিত ব্যক্তির উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা কবির নাম গোপনের প্রয়াস বিফল করিয়া গৃহে গৃহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট মহিলা কবি কামিনী সেনের নাম সুপরিচিত করিয়াছিল। আমি শৈশবেই 'আলো ও ছায়া' পুস্তকখানি দেখিয়াছিলাম। সেকালে আজিকালিকার মত সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই হইত না বটে, কিন্তু সেকালের পক্ষে বইখানির গেট-আপ (get-up) যে খুব সুন্দর হইয়াছিল, একথা বেশ স্মরণ আছে। পিতৃদেব রাজকার্য্যে নানা স্থানে গিয়াছিলেন, আমার সাহিত্যানুরাগিণী জননী প্রবাসে অবসর-বিনোদনের জন্য যে সকল বাছা বাছা পুস্তক সঙ্গে রাখিতেন, তন্মধ্যে "আলো ও ছায়া" একখানি সর্ব্বদা থাকিত, এবং যখন ভাবপরিগ্রহের সামর্থ্য ছিল না, তখনও শৈশবকালে আমি নিঃসঙ্গ প্রবাসে কবি কামিনী সেনের 'আলো ও ছায়া'-র সরল কবিতাগুলি পড়িবার চেষ্টা করিতাম। বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "কবিগাথা"-য়[৩৯ক] কবি কামিনী রায়ের কয়েকটি অতুলনীয় কবিতাপাঠও কণ্ঠস্থ করি। অতঃপর তাঁহার গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রাদিতে যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইত, সমস্তই আনন্দসহকারে পাঠ করিতাম। "সাহিত্যে" আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সহপাঠী (পরে পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব) *পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় 'আলো ও ছায়া'-র যে সুন্দর সমালোচনা লিখিয়াছিলেন[৩৯খ], তাহার প্রতিও আমার মাতৃদেবী কৈশোরেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

যখন আমি নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমার আবাল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের[৪০] অনুরোধ তৎসম্পাদিত "যমুনা"য়[৪১] কবি কামিনী রায়ের নবপ্রকাশিত দৃশ্যকাব্য "অম্বা-"র[৪২] সমালোচনামূলক একটি প্রবন্ধ লিখি। আমার ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত-নামা লেখকের পক্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠা কবির কাব্যসমালোচনা করিতে যাওয়া যে কিরূপ ধৃষ্টতার পরিচায়ক তাহা বলা বাহুল্য। এ রচনা কবির গোচরে কখনও আসিয়াছিল কি না জানি না, আমি কখনও তাঁহার নিকট উহার উল্লেখ করি নাই।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, "বাঙ্গালার মোপাঁসা" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক মাসিকপত্রে ধারাবাহিক ভাবে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত লিখিতে অনুরোধ করেন।[৪৩] হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত সম্বন্ধে তৎকালে আমার কোন জ্ঞান ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা হেমচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্মৃতিকথা ও সংরক্ষিত পত্রাদি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া কয়েকখানি পত্র লিখিলাম। এদেশে যাঁহারা জীবন-চরিত সঙ্কলনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, উপকরণ সংগ্রহ করা কিরূপ দুঃসাধ্য। নিকটতম আত্মীয়গণের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা

করিলেও তাঁহারা উপকরণ-সংগ্রহে অধিকাংশস্থলে সাহায্য করেন না। বলা বাহুল্য, আমি যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলাম, তাহার কতকগুলির উত্তর পাইলাম, অনেকগুলিরই পাইলাম না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর কবি কামিনী রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, যথাসময়ে তাহার উত্তর না পাইয়া ভাবিলাম উহার উত্তর আর পাইব না। আমি একজন অপরিচিত-নামা নবীন লেখক, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, কোনও মতেই তাহার উপযুক্ত নহি, হয়ত কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কয়েকদিন পরেই সঙ্কল্পচ্যুত হইব, সেই জন্য কবি বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই পত্রের উত্তর দেন নাই। স্মারক-লিপি প্রেরণের সাহস হইল না।

'আলো ও ছায়া'-র পূর্ব্বে কোন উৎসর্গ-পত্র ছিল না, কেবল উহার শেষভাগে "মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক" নামক খণ্ডকাব্যদ্বয় তাঁহার এক অজ্ঞাতনামা সতীর্থের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। এই সতীর্থ যে তাঁহার অন্তরঙ্গ (পরে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল) মিসেস কুমুদিনী দাস তাহা এখনও অনেকে হয়ত জানেন না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আলো ও ছায়া'-র ষষ্ঠ সংস্করণে কাব্যখানি "পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"কে রচয়িত্রী উৎসর্গীকৃত করেন। উৎসর্গপত্রটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল :

বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার,
লুকাইয়া ক্ষুদ্র তনু, ঢালে গীতধার,
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্র পাখী,
সেইরূপে আপনারে লুকাইয়া রাখি,
তব স্নেহ-পত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান
লাজুক এ ভীরু কবি খুলি কণ্ঠ প্রাণ।
তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্ব্বাদ তব,
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
বিংশতি বরষ ধরি' যেই গীত হার,
আজ লোকান্তর হ'তে তাই উপহার
লহ এ ভক্তের হাতে ;—আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা' নয় ;
বিংশ বরষের মম পুরাতন গীত
ভকতি-চন্দন-লিপ্ত, নব-সুবাসিত
পাবে তুমি, আশা এই। আছে আশা আর,
পৌঁছে ধরণীর বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার।

উপরিধৃত উৎসর্গ-পত্রটি পাঠ করিয়া প্রতীত হইয়াছিল যে, কবি হেমচন্দ্রের প্রতি কবি কামিনী রায়ের গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং এ যে কেবল আমার অযোগ্যতার

জন্যই হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত রচনায় তাঁহার সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলাম না, সে বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল।

যাহা হউক, যতটুকু উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা লইয়াই কার্য্যারম্ভ করিলাম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে (ফাল্গুন ১৩২৪) 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে "হেমচন্দ্র"-এর প্রথম পরিচ্ছেদ (উপক্রমণিকা) প্রকাশিত হইল। উহা স্মারকলিপির কার্য্য করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু উহার কিছুদিন পরেই কবির স্বহস্ত লিখিত ২রা মার্চ্চ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ তারিখ সম্বলিত নিম্নোদ্ধৃত দীর্ঘ পত্রখানি হস্তগত হইল। উহার প্রথম অনুচ্ছেদে পত্রোত্তর প্রদানে অযথা বিলম্বের জন্য কবি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। কি সূত্রে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ পরিচয় হয় এবং হেমচন্দ্র 'আলো ও ছায়া'-র ভূমিকা লিখিয়া দেন, তাহা বিশেষ ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা রায় (প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী) এবং লেডি অবলা বসু মহোদয়াগণের স্বনামধন্য পিতা দুর্গামোহন দাস[৪৪] মহাশয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় কিরূপে হেমচন্দ্রের সহিত কামিনী সেন পরিচিতা হন, তাহা পত্রখানিতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

হাজারিবাগ
২রা মার্চ্চ ১৯১৮

মান্যবরেষু

আপনার ২৪শে ডিসেম্বরের পত্রখানির উত্তর দিতে এত বিলম্ব হইল সেজন্য অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত আছি। পত্রখানি কংগ্রেসের সময় হস্তগত হয়। আমি তাহার ৭।৮ মাস পূর্ব্বেই ৪২ হাজরা রোড ছাড়িয়া হাজারিবাগে আসিয়া বাস করিতেছিলাম। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতা যাই ; আপনার চিঠি কলিকাতা হইতে হাজারিবাগ এবং হাজারিবাগ হইতে কলিকাতা পুনঃপ্রেরিত হয়। তখন অবসরের অভাব বলিয়া পরে উত্তর দিবার ইচ্ছায় উহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখি। আজ তিন মাস পরে চিঠিখানি বাহির হইল। ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, কিন্তু মনের ভুলে এই ত্রুটি ঘটিয়াছে, ক্ষমা করিবেন।

আপনি কবিবর হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবেন জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার জীবনের কথা কিছুই জানি না! বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমার পিতৃদেবের 'বন্ধু' ছিলেন ঠিক একথাও বলা যায় না। আমার পিতৃদেবের পাঠ্যাবস্থায় তিনি হেম বাবুর নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য পাইয়াছেন এই কথা শুনিয়াছি।

আমি জীবনে একদিন মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। তখন 'আলো ও ছায়া' যন্ত্রস্থ।

আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আমার কবিতার খাতাগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে দেন এবং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি অবশ্য ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। খাতাগুলি আমি ডাক্তার পি. কে. রায়কেই দেখিতে দিয়াছিলাম।—কবিবর কতগুলি কবিতার উপরে 'সুন্দর' Beautiful ইত্যাদি এবং খাতার উপরে A true poet লিখিয়া দুর্গামোহন বাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা

করিলেন "এ ছেলেটি কে হে?" দুর্গামোহন বাবু বলিলেন "ছেলে নয়, মেয়ে।" তিনি অতিশয় আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমার কবিতা তাঁহার মত লোকের ভাল লাগিয়াছে জানিয়া আমার ভয় ও সঙ্কোচ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। তিনি ভূমিকা লিখিয়া দিবেন জানিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতেও আর দ্বিধা রহিল না। যখন কয়েক ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে, একদিন সকাল বেলা মিসেস পি. কে. রায় (দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা) আমার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম আমার সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে কবিবরকে তাঁহারা আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি কলেজের কাজ হইতে ছুটী লইয়া তাঁহাদের রডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আসিলাম। সেখানে হেমচন্দ্রের সহিত উমাকালী মুখোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা আসিয়াছিলেন। কবি তাঁহার নব-রচিত গঙ্গা-স্তোত্রটি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আহারের পর উমাকালী বাবু তাঁহাকে তাঁহার নিজের কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তিনি কবিতাবলী হইতে "হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে" ইত্যাদি কয়েকছত্র পড়িয়া বলিলেন, "না, মিস সেনের কবিতা হইতে পড়ি।" তখন খুব ভাবের সহিত 'বর্ষ-সঙ্গীত', পড়িয়া শুনাইলেন।

এই দেখা-সাক্ষাতের পর তিনি আমাকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্নেহপূর্ণ চিঠিগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার চিঠি পড়িয়া আমার কবিতার মত আমার গদ্য-রচনারও খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আসল কথা তিনি দোষ খুঁজিতেন না, গুণ খুঁজিতেন ; সৌন্দর্য্য দেখিবার চেষ্টা থাকিলে সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকাতে আমার নারীত্বের উল্লেখ ছিল বলিয়া উহাতে আমার আপত্তি হয়। তিনি সেইজন্য দ্বিতীয়বার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। উহাই 'আলো ও ছায়া'র দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই বিশ্বাস।

তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত 'আলো ও ছায়া'-র সমালোচনাগুলির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং কোন কাগজে সমালোচনা বাহির হইলে সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত আমাকে জানাইতেন। কয়েক মাস পরে হঠাৎ তিনি চিঠি লেখা কেন বন্ধ করিলেন জানি না। একবার উত্তর না পাওয়াতে আমিও আর লিখিতে সাহস পাই নাই। 'নির্ম্মাল্য' ও 'পৌরাণিকী প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই। হয়ত চক্ষুপীড়ার জন্যই চিঠি লিখিতে পারেন নাই।

আমি বাল্যকালে কল্পনা-জগতে, আমার দিবাস্বপ্নে তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া কল্পনা করিতাম। সত্য সত্যই তিনি আমার মানস-পিতা। কিন্তু তিনি যে আমার কবিতা পড়িবেন এবং প্রশংসা করিবেন একথা আমার 'নিশার স্বপ্নের'ও অগোচর ছিল। কি সূত্রে তাঁহার উজ্জ্বল নাম আমার প্রথম পুস্তকের সহিত গ্রথিত হইল মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

আমি তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, অথচ আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। তাঁহার বাক্যেই আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাই বিশ বৎসর পরে, 'আলো ও ছায়া'-র ৬ষ্ঠ সংস্করণের সময় তাঁহার নামেই 'আলো ও ছায়া' উৎসর্গ করিলাম।

শীঘ্রই সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

আমি তাঁহার কথা লিখিতে গিয়া 'আলো ও ছায়া'-র কথাই লিখিলাম। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে পারিতেছি না। সময়ান্তরে লিখিব। আগামী কল্য আমি কার্য্যানুরোধে কলিকাতা যাইতেছি। এবার নানা প্রকারে ব্যস্ত থাকিবার সম্ভাবনা। অন্য কখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সুখী হইব।

কবিবর হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবার আকাঙ্ক্ষা আপনার সফল হউক।

ইতি
শুভার্থিনী
শ্রী কামিনী রায়

এই পত্রপ্রাপ্তির পর আমার সঙ্কোচ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইল। অতঃপর আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম এবং কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহার উপদেশ লইতাম। আমার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে স্বহস্তে উপহার দিয়া আসিতাম এবং তিনিও তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ আমাকে উপহার দিতেন। প্রথম যেদিন তাঁহার ৪২-এ হাজরা রোডস্থিত বাটীতে দেখা করিতে যাই, সেদিনের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। প্রথমে দ্বিতলের ড্রয়িংরুমে কবির সহোদরা ডাক্তার যামিনী সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, কবির একটি কন্যা সঙ্কটজনক পীড়ায় আক্রান্ত, কবি তাঁহার কন্যার রোগশয্যাপার্শ্বে আছেন। যাহা হউক, সংবাদ পাইবামাত্র কবি আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। নানা বিষয়ে সাহিত্যালাপ হইল। কবি নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল না। তিনি তাঁহাব এক আই-এ পরীক্ষার্থিনী কন্যাকে "প্রভাস" কাব্য পড়াইতেছেন। তাহার স্থানে স্থানে এরূপ অর্থহীন প্রলাপ আছে যে, তিনি বলিলেন, সে সকল অংশের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকাল হইতেই তিনি কবি হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার কবিতার অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি "উঠ মা আমার" "জাগো মা আমার" ইত্যাদি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারত-উদ্ধার"[৪৫] পাঠ করিবার পর সেগুলি ধ্বংস করেন। তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয় কবিতা "যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন" ইত্যাদিতে একটি গানের সুর দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণও "মা আমার মা আমার" এই অংশটিতে তাঁহার মনের মত সুর দিতে পারেন নাই।

পিতার নিকটে তিনি তাঁহার সাহিত্যিক প্রেরণার জন্য ঋণী। তাঁহার পিতার 'টমকাকার কুটীরে'র অনেকাংশ পাঠ্যাবস্থায় তিনিই লিখিয়াছিলেন।

কন্যার রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমি শীঘ্র বাটীতে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া শান্তভাবে আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করিলেন। মনে হইল, সাহিত্যানুরাগী বা সাহিত্যসেবকগণের সহিত দুই দণ্ড

আলাপ করিলে যেন তিনি আন্তরিক আনন্দ লাভ করেন। তিনি আমাকে তাঁহার প্রকাশিত বইগুলি উপহার দিলেন। অধিকাংশই আমার পুস্তকাগারে ছিল, যে দুই একখানি ছিল না, (যেমন পারিবারিক শ্রাদ্ধসভায় পঠিত প্রবন্ধাবলী) সেগুলি সংগৃহীত হইল।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে "হেমচন্দ্র" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার সময় যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ জন্মিত বা উপদেশ লইবার আবশ্যকতা বোধ হইত, তখনই কবি কামিনী রায়ের সহিত আলোচনা করিতে গিয়া উপকৃত হইয়া আসিয়াছি। তাঁহার অভিমতগুলি অধিকাংশ সময়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমতের সহিত মিলিত। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, আমার মাতৃদেবীর নিকট আমি আমার সাহিত্যরুচির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী ছিলাম, কোন গ্রন্থপাঠের পর তাঁহার সহিতই উহার দোষগুণের আলোচনা করিতাম এবং মাতৃদেবী কবি কামিনী রায়ের তিন বৎসরের মাত্র বয়ঃকনিষ্ঠা ছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে একই প্রভাবের মধ্যে থাকায় উভয়ের সাহিত্যরুচি প্রায় একই প্রকারের ছিল। কবি কামিনী রায়ের সহিত সাহিত্যালোচনাকালে অনেক সময় মনে হইত আমার মাতৃদেবীর সঙ্গেই সাহিত্যালোচনা করিতেছি।

বোধ হয় কোনও বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল বলিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রিয় দুহিতা লীলাকে হারাইয়াছিলেন এবং বোধ হয় কলিকাতায় সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। আমার পত্র পাইয়া তিনি নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখেন—

৪২এ হাজরা রোড, বালীগঞ্জ
২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১

মান্যবরেষু,

আপনার পত্রখানির উত্তর দিতে বড়ই বিলম্ব ঘটিল, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমার উপর দিয়া অনেক দুঃখ বিপদ গিয়াছে সবিস্তার সব লিখিবার আবশ্যক নাই। সম্প্রতি একটু মাথা তুলিবার অবসর হইয়াছে। আপনার সুবিধামত যে কোন দিন আসিবেন—কেবল পূর্ব্বে একটু সংবাদ দিলে ভাল হয়।

নিবেদিকা
কামিনী রায়

আমার ডায়েরীতে দেখিতেছি ২৭শে ফেব্রুয়ারি হাজরা রোডে কবি কামিনী রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। কবি হেমচন্দ্রের আবৃত্তিশক্তি সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ অভিমত সংগৃহীত হইয়াছিল। স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে লিখিয়াছিলেন এবং আচার্য্য কৃষ্ণকমলও[৪৬] বলিয়াছিলেন যে হেমেন্দ্র [যদ্.] sing-song way-তে পাঠ বা আবৃত্তি করিতেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে কাশীতে অবস্থানকালে হেমচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'ভারতসঙ্গীত'[৪৭] আবৃত্তি করিতে বলিতেন এবং বলিতেন

হেমচন্দ্রের আবৃত্তি তত ভাল লাগে না। পক্ষান্তরে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'[৪৮] আবৃত্তির উচ্চ সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন, এবং স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী[৪৯] হেমচন্দ্রের আবৃত্তির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, যিনি হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' আবৃত্তি শুনিয়াছেন তিনি অমর পদবী লাভের যোগ্য। কবি কামিনী রায় হেমচন্দ্রের আবৃত্তি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ অভিমতের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমার বেশ মনঃপূত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে আবৃত্তি ভাল লাগা বা না লাগা দেশ-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে। য়ুরোপীয় মহিলাদের গান অনেক বাঙ্গালীর ভাল না লাগাই সম্ভব, আবার আমাদের দেশী সুর য়ুরোপীয়দিগের ভাল না লাগিতে পারে, সেকালে আমাদের দেশের লোক যে সুর ভালবাসিত, একালে আমাদের দেশের লোকের তাহা ভাল না লাগিতে পারে, শ্রোতার ব্যক্তিগত শিক্ষা, রুচি ও অভ্যাসের উপর কোন আবৃত্তি ভাল লাগা বা না লাগা প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। এই দিনেও তিনি হেমচন্দ্রের কবিতার উচ্চ প্রশংসা করেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, এ যুগে অনেকেই অতীত যুগের লেখকদের কোন সন্ধান রাখেন না। হেমচন্দ্রের কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যেরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, এখন সেরূপ সমাদৃত হয় কি না সন্দেহ। আমার নিজের মতের কোন মূল্য নাই বলিয়া আমি হেমচন্দ্রের জীবনীতে সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যসমালোচকদিগের অভিমত সঙ্কলিত করিতেছি, কিন্তু আধুনিক জীবিত মনীষিগণ তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন, তাহা গ্রন্থপরিশেষে দিলে ভাল হয়। উহা হয়ত আধুনিক পাঠকগণকে হেমচন্দ্রের কাব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত করাইবে ও হেমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক যুগে যেরূপ, এ যুগেও সেইরূপ যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবেন। আরও কয়েকজন সাহিত্যিককে এইরূপ অভিমত লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কামিনী রায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

বাটী ফিরিবার সময় তিনি বলিলেন, "আমার 'অশোক সঙ্গীত'[৫০] আপনাকে দিয়াছি কি?" বালক পুত্র অশোকের স্বর্গারোহণের পর শোকদগ্ধ হৃদয়ে কবি যে ক্ষুদ্র শোককবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহাই এই পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছিল। পুস্তকখানি পূর্ব্বে পাই নাই শুনিয়া তিনি উহার একখণ্ড আমাকে দিলেন। কবিতাগুলি অতি মর্ম্মস্পর্শিণী, কিন্তু উহার মূল্য কত তাহা কয়েক মাস পরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। জুন মাসে আমার নয় বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র অমলচন্দ্রকে জগজ্জননী নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সেও অশোকের মত অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে অল্প কয়েকদিন মাত্র ভুগিয়া অকস্মাৎ আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল। শেষ দিনও সে প্রশান্ত চিত্তে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল, তাহার কোনও কষ্ট নাই, তাহার জন্য আমরা যেন কাতর না হই এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ভক্ত বালক গভীর আনন্দে "মা এসেছে, মা এসেছে" বলিয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে চলিয়া যায়। তাহার কতকগুলি কথা, কতকগুলি ব্যবহার কামিনী রায়ের কিশোরবয়স্ক পুত্র অশোকের সহিত যেন মিলিয়া যায়। অমলের পরলোক প্রয়াণের পর 'অশোক সঙ্গীত' পুনঃ পুনঃ পাঠে যে সান্ত্বনা ও শোকবিমিশ্রিত

আনন্দ পাইয়াছি, তাহা আর কোন গ্রন্থে পাই নাই। যে ভাষা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, যে বাণী উচ্চারণ করিবার শক্তি নাই, তাহা যেন কবি এক স্বর্গীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থখানি যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্বর্গারোহণের পর[৫১] আমি শোকে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলাম। শরীর ও মন উভয়ই ভগ্ন হইয়াছিল। যেটুকু কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিলে নহে তদ্ব্যতীত আর কিছুই করি নাই। দুই বৎসরের মধ্যে আর কবির সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।

হেমচন্দ্রের জীবনচরিতের শেষ পরিচ্ছেদগুলি লিখিবার সময় আসন্ন হইল। আবার কবি কামিনী রায়ের শরণাপন্ন হইতে হইল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিলাম তিনি শিলংএ গিয়াছেন। 'নব্যভারত'-সম্পাদিকা ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরীর[৫২] নিকট হইতে তাঁহার ঠিকানা লইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার পিত্রালয় বেলতলা রোড হইতে নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখেন।

৯৮ বেলতলা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।
১১ই জুলাই ১৯২৩।

মান্যবরেষু—

আপনার পত্রখানি শিলং ঘুরিয়া আসিয়া গতকল্য সন্ধ্যায় আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি চার পাঁচ দিন হইল কলিকাতা ফিরিয়াছি। এই মাসেই হাজারিবাগ যাইবার ইচ্ছা, হইয়া উঠিবে কি না জানি না। উপরে আমার বর্ত্তমান ঠিকানা দেখিবেন।

আপনি আপনার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে হারাইয়াছেন শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। দুই বৎসর হইলেও আপনার হৃদয় হইতে আঘাতের ব্যথা যায় নাই ; জীবন হইতেও তাহার দাগ যাইবার নহে, তাহা জানিতেছি। আমার 'অশোক সঙ্গীত' শোকের মধ্যে আপনাকে একটু সঙ্গ ও সহানুভূতি দিতে পারিয়াছে জানিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছি। যে উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় তাহা সার্থক হইতেছে। একাধিক শোকার্ত্ত পরিবারের নিকট শুনিয়াছি। ইহাও এক রকম সান্ত্বনা।

হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি, এ সকল কথা এক সময়ে, অর্থাৎ আলো ও ছায়াতে তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকা পড়িবার পর, তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যাহা পাইয়াছি গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার সমালোচনা করিবার ইচ্ছা কখনও হয় নাই, এখনও হইতেছে না। পিতা মাতা বা ধাত্রীকে যেমন মানুষ চিরদিন ভালবাসে, তাহাদের গুণাগুণের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করে না, আমারও কতকটা সেই রকম।

হেমচন্দ্রের কবিতার সমালোচনা করিয়া বর্ত্তমানে কাহাকেও তাঁহার কাব্যের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিব সে বিশ্বাস আমার নাই। যাঁহারা তাঁহার কবিতা পূর্ব্বে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহারা এখনও ভালবাসিতেছেন। নব্যতন্ত্রের সাহিত্যবিলাসীগণ তাঁহার

খুঁতগুলিই ধরিবেন এবং হয়তো গুণের যথেষ্ট সমাদর করিবেন না। সেজন্য আপনার আমার ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। এক এক সময়ে এক একটা বিশেষ ধরণের লেখা সাধারণের নিকট প্রিয় ও আদরণীয় হইয়া উঠে। আজ কাল রবীন্দ্রযুগ—এ যুগে 'আর্টের' দিকেই, বিশেষ রবীন্দ্রের আর্টের দিকেই মানুষের অধিক মনোযোগ। কবিতার প্রভাব (effect) কাণের উপর যতটা ততটা প্রাণের উপর হয় কি না কেহ দেখে না।

রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রীতি, নারীজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ—এ সকল তাঁহার মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেকালে কলা-কুশলতা (art) হইতে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার জলদগম্ভীর ভাষা শুনিয়া আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিত। সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে ঠেলিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত ; আজকাল যেন বাছা বাছা বাঁধা বুলি আগে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেই জন্য ভাব জমাট হয় না, ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। কবিতাটি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া, চক্ষে কর্ণে কেবল মিষ্ট ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের ভিতরে গভীর সাড়া পাওয়া যায় না।

এই কথাগুলি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে যেন বক্তব্যটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই, নিজেকে ভুল বুঝাইতেছি। কেহ হয়তো মনে করিবেন আমি রবীন্দ্রনাথকে অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, গীত-রচনায় অদ্ভুত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তাঁহার লেখনীস্পর্শে শুষ্ক বিষয়ও সরস ও মধুর হয়, যাহা কিছু তাঁহার কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়, সঙ্গীতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু গীতি-রচনায় তাঁহাকে মাপকাঠি করিয়া অন্য সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ব্যবহৃত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব্ব-কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়। আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে। তিনি যে রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 'স্কুলের' প্রবর্ত্তক, তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না। ছন্দ, সুর, নিখুঁত মিল, উপলাহত গিরি-স্রোতের কলকল ধ্বনি, ইন্দ্রধনুর নানাবর্ণের ক্ষণিক খেলা, আবছায়া স্বপ্নের আবেশ এই সব তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক উপাদান। এ গুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা—এই সকল দিয়া যে মানবজীবন তাহার একটা জাগ্রত অস্তিত্বও আছে—এবং তাহার একটা সরল সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম এবং স্পষ্টকে অস্পষ্ট ও সরলকে জটিলও হয়তো করিলাম। এইখানে অদ্যকার মত শেষ করি।

কাল চিঠিখানা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। অন্য কাজে উঠিয়া যাইতে হয়। আজ লিখিতে বসিয়া অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তবুও একটা কথা বাকী রহিয়া গেল, সেটা এই, 'মহাকাব্য' এখন out of fashion. কবিতার গুণদোষ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা গীতি কবিতারই কথা।

বিনীতা—
শ্রীকামিনী রায়

এই পত্রপ্রাপ্তির কয়েক দিন পরে (১৫ই জুলাই ১৯২৩) ভবানীপুরে বেলতলা রোডে কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। সেখানে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ও 'নব্যভারত'-সম্পাদিকা ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরীও গিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ বাবু অল্পকাল পরেই চলিয়া গেলেন। কামিনী রায় আমাকে জলযোগ করাইয়া সাহিত্যালোচনা করিতে বসিলেন। ফুল্লনলিনী তাঁহার শ্বশুর ও স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নব্যভারতকে কোনও রকমে সঞ্জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কামিনী রায়ের তিনি খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ ও সহযোগিতা লাভের জন্য গিয়াছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনা ও আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। ঢাকা হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত "প্রাচী" নামক মাসিক পত্র হইতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার নিজের লিখিত প্রাচী শীর্ষক দুইটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন।[৫৩] ইহার পরে আমার নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে স্বহস্তে দিয়া আসিতাম, কারণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে অলস জীবনে যেন সাহিত্যসেবার একটা উৎসাহ ও প্রেরণা আসিত।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুর সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহার সহিত কয়েকদিন দেখা হয়। সম্মেলনের পরবর্ত্তী রবিবারে (৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০) তাঁহার হাজরা রোডস্থিত বাটীতে সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাৎ করিবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।

আমি কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সেকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জননী ও সহধর্ম্মিণীদের চিত্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতেছিলাম। তাঁহার জননী বামাসুন্দরী দেবীর একখানি প্রতিকৃতির প্রয়োজন ছিল। তিনি চা-পান ও জলযোগ করাইয়া সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তিনি পূর্ব্ব দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনে জগত্তারিণী মেডেল পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কথা হইল। তিনি তাঁহার জননীর একখানি ফটো দিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে পড়িবার জন্য আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুরোধে তিনি যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহার জীর্ণ পাণ্ডুলিপিখানি আমাকে পড়িতে দিলেন। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিতেছে, সেই জন্য তাঁহার ইচ্ছা আছে যে, তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি নির্ব্বাচন না করিয়াই একটি গ্রন্থে মুদ্রিত করিবেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সকল কবিতারই একটি বিশেষত্ব আছে এবং তাহা সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কবিতাগুলি "দীপ ও ধূপ" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার একখণ্ড তিনি আমাকে দিলেন।

এই সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়[৫৪] তৎ-সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য 'দীপ ও ধূপ'-এর[৫৫] একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখিয়া দিতে বলেন। আমি একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতে স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ থাকায় আমি একখানি পত্রে কবিকে মুদ্রিত সমালোচনার লিপিপ্রমাদগুলি দেখাইয়া দিই। সেকালের সমাজের একটি সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জননীর জীবনচরিত বিষয়ক প্রস্তাবটি আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। আমার নিকট উক্ত প্রস্তাবটির সুখ্যাতি শুনিয়া আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়[৫৬] উহা তৎসম্পাদিত 'বিচিত্রা'-য় প্রকাশ করিতে অভিলাষী হওয়ায় আমি উহা 'বিচিত্রা'য় পত্রস্থ করিবার জন্য কবির অনুমতি ভিক্ষা করি। নিম্নোদ্ধৃত পত্রে কবি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

৪২/এ হাজরা রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
৩১ জুলাই ১৯৩০

মান্যবরেষু

আপনার ২৯শে জুলাই তারিখের পত্রখানি সেই তারিখ রাত্রেই পাইলাম। মনে হইতেছে, আমি আপনাকে যে পত্র ইতিমধ্যে লিখিয়াছি এবং গত মার্চ্চ মাসের ২০শে তারিখ যে পুস্তকখানি পাঠাইয়াছি তাহা আপনার হস্তগত হয় নাই। ১/৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীটের ঠিকানায় চিঠি ও বই পাঠাইয়াছিলাম। এতদিন আপনার নিকট হইতে কোন পত্র না পাইয়া এবং ছবি ও প্রবন্ধ ফিরৎ আসিল না দেখিয়া একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হইতেছিলাম। আশা করি আমার এ চিঠি আপনি পাইবেন।

বিচিত্রায় মাতৃদেবীর স্মৃতি মুদ্রিত হয় তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা যে তাঁহার মৃত্যুর ৮ দিন পরে তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে লিখিত ও পঠিত হয় তাহার উল্লেখ থাকা উচিত। সময়ান্তরে হয়তো আরও ভাল করিয়া এবং অন্য আকারে লেখা যাইত। আমার পিতৃ-পরিবারের একটা ছবি আছে, তাহাতে আমি এবং আমার মধ্যম ভ্রাতা নিশীথ নাই। আমাদের সেকালের অপর ছবি চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় বলিতে পারি না।

আপনি যে কোন একদিন এখানে আসিলে এ বিষয়ে কথা হইতে পারে। বিচিত্রার ছাপা ও ছবি বেশ ভাল তাহা দেখিয়াছি। আমি মাসিক পত্রিকা বিনা মূল্যেই কতগুলি পাইয়া থাকি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনটির গ্রাহক এ পর্য্যন্ত হই নাই, সেই জন্য প্রবাসী বিচিত্রা ও বসুমতী পড়া হয় না। সময়ও বড় নাই! ব্রাহ্ম সমাজের মাসিক ও সাপ্তাহিকগুলির অবশ্য মূল্য না দিলে নয়। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর লেখা আরও উচ্চদরের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমি অসুস্থ হইয়া মাস খানেক পুরী গিয়াছিলাম। গত ১৬ই তারিখ ফিরিয়াছি। আশা করি আপনার সর্ব্বথা কুশল। নমস্কার জানিবেন।

বিনীতা
শ্রীকামিনী রায়

অতঃপর একদিন অপরাহ্নে (৩রা আগষ্ট ১৯৩০) বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে লইয়া কবির হাজরা-রোড-স্থিত ভবনে সাক্ষাৎ করি। তিনি তাঁহার পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ের কবিতা একত্র করিয়া "জীবনপথে" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন[৫৭], তাহা উপহার দিলেন। তাঁহার মাতৃস্মৃতির সহিত প্রকাশের জন্য কতকগুলি ফটোগ্রাফ ব্লক করিবার নিমিত্ত চাহিয়া আনিলাম। সেদিন আমাদিগকে চা-পান ও জলযোগ করাইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি উৎসাহের সহিত আমাদের সহিত সাহিত্যালোচনা করেন। শরৎবাবু ও উপেনবাবু কেমন করিয়া উপন্যাস লিখেন, উপন্যাসের প্লট পূর্ব্বে ঠিক করিয়া লন কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার 'দীপ ও ধূপ' সম্বন্ধে কোন নবীনা লেখিকা নাকি বলিয়াছিলেন, কবিতাগুলি সব না ছাপিলেই ভাল হইত, উহাতে তাঁহার যশঃ ক্ষুন্ন হইবে। কিন্তু তিনি বলিলেন, উহার উত্তরও আছে। তাহা তিনি দুইটী কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাকে কবিতা দুইটী পড়িতে বলিলাম। তিনি তাঁহার খাতা আনিয়া স্বাভাবিক সুমিষ্ট কণ্ঠে পড়িলেন :-

অনির্ব্বাচন

যাহা আছে রেখে যাই, বাছিতে সময় নাই,
বুঝি না জমেছে গীত যত ;
কি যে তার দামী, কি যে খেলো,
কি যে শুধু কথা এলোমেলো,
কতটুকু প্রাণহীন কতটুকু বাঁচিবার মতো।

আছে কিছু চিরন্তন সর্ব্বদেশে কালে
মানব প্রাণের অন্তরালে,—
কখনো ধ্বনিয়া উঠে ছন্দে আর সুরে
শুনিতেই স্বতঃ প্রাণে প্রতিধ্বনি জাগে,
জানে যাহা জানে নাই আগে,
আঁধার আলোকে যায় পূরে।

সেই টুকু অজানার চাবি,
সে টুকুতে সকলেরি দাবী ;
নিজস্বতা কারো তাতে নাই।
যদি মোর কোনো ক্ষুদ্র গীতে
পশে তাহা থাকে কোনো চিতে
সব কটা তাই রেখে যাই।

আমার ভাষণ

আমার ভাষণ যদি না লাগে মধুর,
আমার গানেতে যদি নাহি পায় সুর,
পদ্যে মোর নাহি পায় পদের ঝঙ্কার,
অনুপ্রাসহীন গদ্য রিক্ত অলঙ্কার
যদি লাগে, সেই ভয়ে নব ছন্দে লেখা
নহে চেষ্টা। এ বয়সে যায় কিছু শেখা?
যে কথা এসেছে মনে লিখিয়াছি সোজা
মনের সহজ সুরে ; শব্দ বোঝা বোঝা
করি নাই স্তূপাকার ; মিলের সন্ধানে
ভাবে করি নাই শ্রান্ত দীর্ঘ—পদটানে।

কাহারো লেগেছে ভালো সেই সোজা সুর
করুণ, নিভৃত-ব্যথা করিয়াছে দূর
সমবেদনার রসে। তার বেশী কিছু
ছিল না প্রত্যাশা কভু। জনতার পিছু
ছুটি নাই যশোলুব্ধ। আড়ালে বিজনে
যা পেয়েছি আশা তারো ছিল না ত মনে,
যা পেয়েছি নম্রশিরে লয়েছি তুলিয়া
দূরাগত শ্রদ্ধা প্রীতি বেদনা ভুলিয়া।

আমরা এই কবিতা দুইটি 'বিচিত্রা'য় ছাপিবার জন্য লইয়া আসিলাম। কামিনী রায় আমাকে তাঁহার জননীর জীবনচরিতটির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া দিতে বলেন। মল্লিখিত ক্ষুদ্র ভূমিকাসহ জীবনীটি ১৩৩৭ সনের ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলের শেষে আমি রাজকার্য্যানুরোধে দিল্লী যাই। সেখানে অক্টোবর মাসে আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে আমার প্রাণাধিকা দৌহিত্রী এবং পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসে আমার পরমপূজনীয়া জননীকে হারাই।[৫৮] এই সকল পারিবারিক বিপদের জন্য তাঁহার নিকট আমি আর যাইতে পারি নাই, কখনও কখনও সভা-সমিতিতে দেখা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু দেখা না হইলেও আমি প্রায়ই তাঁহার কাব্যগ্রন্থাদি পাঠকালে তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতাম এবং তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে আমার মাতৃবিয়োগকাতর হৃদয়ে আমি দ্বিতীয়বার মাতৃবিয়োগব্যথা অনুভব করিয়াছিলাম।*

বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪২

[* *মন্মথনাথ ঘোষের এই লেখাটি পুনর্মুদ্রণের জন্য অধ্যাপক অলোক রায় এবং শ্রীঅরিজিৎ ঘোষ যে অনুমতি প্রদান করেছেন সেজন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংগ্রহে রক্ষিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা থেকে লেখাটি হাতে কপি করা হয়েছে। এঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।*]

টীকা

১. Gray, Thomas, 1716-71 : English poet. He was educated at Eton and Peterhouse, Cambridge. In 1739 he began a grand tour of the Continent with Horace Walpole. They quarelled in Italy, and Gray returned to England in 1741. He continued his studies at Cambridge, and he remained there for most of his life, living in seclusion, studying Greek, and writing. His first important poems, written in 1742, include "To Spring", "On a Distant Prospect of Eton College", and a sonnet on the death of his close friend Richard West. After years of revision he finished his great "Elegy Written in a Country Churchyard" (1751), a meditative poem presenting thoughts conjured up by the sight of a rural graveyard, it is perhaps the most quoted poem in English.

২. Visigoths : by the 4th cent. the Visigoths were at the borders of the East Roman Empire, raiding across the Danube River, and peacefully infiltrating the trans-Danubian provinces. Constantine I was troubled by the Visigoths, but they became a real menace only after the middle of the 4th cent. At that time groups of Visigoths had settled in Dacia as agriculturalists and many had accepted Arian Christianity partly as a result of the work of Ulfilas. About 364 a group of Visigoths devastated Thrace, and punitive measures were undertaken against them. They were also involved in the revolt (366) of Procopius.

Until 369 Emperor Valens waged war successfully against the Visigoths, who were led by Athanaric . Athanaric asserted his supremacy over Fritigern , a rival Visigothic leader who then retired into the Roman Empire and obtained Roman aid against Athanaric. However, the internal affairs of the Goths became of secondary importance to the invasion (c.375) of their lands by the Huns. Athanaric retired to Transylvania, and the majority of the Visigoths joined Fritigern and fled (376) into the empire. Subjected to oppressive measures by Roman officials, these Visigothic settlers soon rose in revolt. Opposed by Emperor Valens at Adrianople in 378, the Goths won a decisive victory. They then swept across the upper Balkan Peninsula and ravaged Thrace. Theodosius I immediately took up arms against them. In 382 peace was finally concluded, and the Goths under Athanaric were settled in Thrace. Friction, however, continued.

In 395, after the death of Theodosius 1, the Visigothic troops in Roman service proclaimed Alaric I their leader; under his strong guidance they first developed the concept of kingship. Alaric led a revolt in the Balkan Peninsula but was checked by Stilicho. In 401 Alaric began his attacks on Italy; he was halted by Stilicho, but after Stilicho's death he succeeded in his invasion, and the Visigoths became masters of Italy. Negotiations between Alaric and Emperor Honorius failed, and in 410 the Visigoths sacked Rome. Alaric died soon afterward.

Ostrogoths (East Goths) : division of the Goths, one of the most important groups of the Germans. According to their own unproven tradition, the ancestors of the Goths were the Gotar of S Sweden. By the 3d cent. AD, the Goths settled in the region N of the Black Sea. They split into two divisions, their names reflecting the areas in which they settled; the Ostrogoths settled in Ukraine, while the Visigoths,

or West Goths, moved further west of them. By c.375 the Huns conquered the Ostrogothic kingdom ruled by Ermanaric, which extended from the Dniester River, north and east to the headwaters of the Volga River. The Ostrogoths were subject to the Huns until the death (453) of Attila, when they settled in Pannonia (roughly modern Hungary) as allies of the Byzantine (East Roman) empire. The Ostrogoths, who had long elected their rulers, chose (471) Theodoric the Great as king. A turbulent ally, the Byzantine emperor, Zeno, commissioned Theodoric to reconquer Italy from Odoacer. The Ostrogoths entered Italy in 488, defeated and slew (493) Odoacer, and set up the Ostrogothic kingdom of Italy, with Ravenna as their capital. After Theodoric's death (526) his daughter Amalasuntha was regent for her son Athalric. She placed herself under the protection of the Byzantine emperor Justinian I. Her murder (535) served as pretext for Justinian to send Belisarius to reconquer Italy. He crushed the Ostrogothic kingdom, but on his recall (541) the Ostrogoths rebelled under the leadership of Totila. In 552 the Byzantine general Narses defeated Totila, who fell in battle. As a result, the Ostrogoths lost their national identity, and the hegemony over Italy passed to Byzantium and shortly afterward to the Lombards. Under the Ostrogothic kings, the culture of late antiquity was revived by Boethius and Cassiodorus; Dionysus Exiguus compiled church law; and Saint Benedict laid the basis of Western monasticism. Roman law and institutions were for the most part maintained; however, the Ostragoths were resented as aliens by the Italians, from whom they differed not only in culture but also in religion, since they were Arians,

Vandals : ancient Germanic tribe. They originated in N Jutland and, along with other Germanic peoples, settled in the valley of the Oder about the 5th cent BC. They appeared in Pannonia and Dacia in the 3d cent. AD, apparently under imperial aegis. In the early 5th cent., the Vandals began a migration that was to take them farther than any other Germanic people. They invaded (406) Gaul, where the Franks, as allies of Rome, refused them permission to settle. In 409 they crossed the Pyrenees to Spain. After meeting opposition there, they concluded a peace with Roman Emperor Honorius, who recognized their right to the land, subject to imperial authority. While in Spain, however, they continued to fight the Romans and Visigoths and were able to develop their maritime power. In 428, Gunderic, the Vandal king, died and was succeeded by his brother, Gaiseric, whose leadership carried the tribe to its greatest heights. Pressed by the Goths, and taking advantage of unsettled conditions in Africa, the Vandals crossed (429) to that continent and defeated the Roman general Boniface. The tradition that they came at Boniface's invitation is probably false. By 435 the Vandals controlled most of the Roman province of Africa, and in 439 they took Carthage, Their vessels made pirate attacks on ships in the Mediterranean, and they went on plundering expeditions to Sicily and S Italy. In 442, Valentinian III recognized Gaiseric as an independent ruler, and Vandal migration ceased. The next years were spent in building a powerful kingdom. Their fleet controlled the Mediterranean, and even the Eastern Empire felt their power. In 455, Rome was sacked by Gaiseric's troops, and Empress Eudoxia and her two daughters were taken as hostages. The Vandals were Arian Christians, and, especially under Gaiseric and his son, Hunneric, they harshly persecuted Orthodox Christianity. The Roman emperors Marjorian and Leo I made attempts to destroy Vandal power, but Zeno was forced to make peace (476) with

Gaiseric. After the death (477) of Gaiseric, however, the Vandals declined quickly as a dominant power. In 533, Justinian I sent against them an army under Belisarius, which after meeting weak resistance, captured Carthage, With this overwhelming defeat the Vandals ceased to exist as a nation The Vandals were not an artistic people, and they left no monuments of their reign. The modern use of their name is probably derived from the fear and hatred felt toward them by African Catholics and a reminiscence of the sack of Rome.

৩. সামাজিক প্রবন্ধ। ১২৯৯ সাল। ৩১৯ পৃষ্ঠা সংবলিত গ্রন্থ। গ্রন্থের আভাস অংশে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) বলেছেন : 'এই সামাজিক প্রবন্ধগুলি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয়ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, জাতীয়ভাব পরিগ্রহের পথ আমাদিগের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে। এই কথার বিশেষ সমর্থনের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইউরোপ প্রচলিত সমাজতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটী মতবাদের উল্লেখ এবং ভ্রমপ্রদর্শন করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমন হওয়াতে যে যে ফল জন্মিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে, তৃতীয় অধ্যায়ে সেগুলির প্রকৃতি বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সংস্রব যে যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, ইংরাজ আগমনের পরবর্ত্তী ফল কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। আমাদের সমাজের গতি জাতীয় প্রকৃত্যনুযায়ী পথে রাখিবার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।'...

৪. চণ্ডীচরণ সেন, ১৮৪৫-১৯০৬ : জন্ম বাখরগঞ্জ জেলা। ১৮৬৩ সালে বরিশাল সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস করে কিছুকাল কলকাতার ফ্রি-চার্চ ইনস্টিট্যুট-এ পড়াশোনা করেন। ১৮৬৯ সালে আইন পাস করে বরিশালে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭৩ সালে প্রথমে মুনসেফ ও পরে সাবজজ হন। দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্মনেতাদের সংস্পর্শে এসে ১৮৭০ সালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। 'টমকাকার কুটীর' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রন্থ। 'অযোধ্যার বেগম', 'ঝাঁসির রানী', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'মহারাজ নন্দকুমার' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিনি রচয়িতা। শেষোক্ত বইটির জন্য তিনি ইংরাজ-সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হন।

৫. অশ্বিনীকুমার দত্ত [মহাত্মা] : জন্ম ১৮৫৬, ২৫ জানুয়ারি, পটুয়াখালি, বরিশাল। পিতা ব্রজমোহন দত্ত। শিক্ষা : বি. এ. (কৃষ্ণনগর কলেজ, ১৮৭৮), এম. এ. (প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১৮৭৯), বি. এল. (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮০)। বরিশালে ১৮৮০ সাল থেকে ওকালতি শুরুর আগে কিছুদিন শ্রীরামপুর চাতরা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন। ওকালতি ব্যবসায় ত্যাগ। পিতার নামে ব্রজমোহন ইনস্টিট্যুট স্থাপনা (১৮৮৪, ২৭ জুন)। ১৮৮৯-তে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠা। লোকাল বোর্ডের সভাপতি (১৮৮৭), মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান, মাদকতা-নিবারণী সভার সম্পাদক প্রভৃতি জনহিতকর কাজের পুরোধা ছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সহ-সভাপতি (১৯০৫), ঢাকা প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতি (১৯১৩), বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান (১৯০৫), কারাবাস (১৯০৮-১০)। গ্রন্থ : ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রেম, দুর্গোৎসব-তত্ত্ব, ভারতগীতি। মৃত্যু : ১৯২৩-এর ৭ নভেম্বর, কলকাতায়।

৬. ললিতমোহন দাস, ১৮৬৮-১৯৩২ : জন্মস্থান গৈলা, বরিশাল। ১৮৮৪ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের প্রথম দলের ছাত্র। ঐ স্কুল থেকেই ১৮৮৮ খ্রী. ১৫ টাকা বৃত্তিসহ এন্ট্রাস পাস করেন। ১৮৯২ খ্রী. কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৮৯৩ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাস করেন। এরপর কিছুদিন যশোহর জেলার নলদা গ্রামে ও পরে কলিকাতার সিটি স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের 'সত্য-প্রেম-পবিত্রতার' আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। Risley Circular দ্বারা শিক্ষকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে সিটি কলেজের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে তিনি আজীবন গৃহশিক্ষকতা করেছেন। ১৯২৪ খ্রী. বরিশালের পিরোজপুরে জেলা কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে কারাবরণ করেন। এর আগে ১৯০৯ খ্রী. কলিকাতায় 'বরিশাল সেবা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমরণ তার কর্ণধার ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। রচিত গ্রন্থ : 'ধর্ম-সাধন' (১৯০০), 'নিবেদন' (পূর্বার্ধ), 'নিবেদন' (উত্তরার্ধ)। 'করুণার লীলা' নামে তাঁর একটি অপ্রকাশিত জীবন-কাহিনী আছে।

৭. ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে সংঘটিত পণপ্রথাজনিত স্নেহলতার আত্মহত্যা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য অধ্যাপক স্বপন বসুর লেখা 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই' (*দেশ*, বর্ষ ৬৩/সংখ্যা ২৬, ১৯ অক্টোবর, ১৯৯৬) দ্রষ্টব্য।

৮. হরিহর শেঠ, ১৮৭৮-১৯৭২ : জন্মস্থান/পৈতৃকনিবাস-পালপাড়া, চন্দননগর। পিতা : নৃত্যগোপাল। বিদগ্ধ সাহিত্যিক, ইতিহাসবেত্তা এবং সমাজসেবী হিসাবে তৎকালীন বঙ্গসমাজের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, বঙ্গবাণী, ভারতী, বিচিত্রা, প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ফরাসী সরকার প্রবর্তিত স্বাধীন শহর চন্দননগরের প্রথম মনোনীত সভাপতি। চন্দননগরে মাতার নামে কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির (প্রথম মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়), নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির, দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য এবং রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত ২০শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন। ফরাসী সরকার ১৯৩৪ খ্রী. 'Chevalier de l'Ordre National de la Legion d'Honneur', ১৯৩৫ খ্রী. 'Officer de l'Instruction Publique' এবং ১৯৩৬ খ্রী. 'Officer d'Academie' উপাধি প্রদান করেন। 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' নামে কলিকাতা মহানগরীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা তাঁর একটি বিশেষ কীর্তি। এছাড়া তাঁর 'চন্দননগর পরিচয়' প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'মুক্তিসংগ্রামে চন্দননগর', 'অভিশাপ', 'প্রতিভা', 'স্রোতের ঢেউ', 'অমৃতে গরল', 'পুরাতনী' প্রভৃতি। স্বদেশী বাজার পত্রিকার সম্পাদক দুর্গাদাস শেঠ তাঁর অনুজ।

৯. টম্‌কাকার কুটীর (উপন্যাস)। ১২৯১ সাল (২০.১.১৮৮৫) পৃ. ৪৫৮। *Uncle Tom's Cabin*-এর বঙ্গানুবাদ।

মহারাজা নন্দকুমার (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ১২৯২ সাল (২৫. ১২. ১৮৮৫)। পৃ. ৩৯২+১৬।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ইং ১৮৮৬ (১ জুন)। পৃ. ১০৮।

অযোধ্যার বেগম (ঐতিহাসিক উপন্যাস) :

প্রথম খণ্ড। ইং ১৮৮৬ (১০ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৫৭।

দ্বিতীয় খণ্ড। ইং ১৮৮৬ (১৫ ডিসেম্বর)। পৃ. ৩৫৮।

ঝান্সীর রাণী (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। (১৩. ৭. ১৮৮৮)। পৃ. ৩৮০।

১০. আলো ও ছায়া (১৮৮৯) : লেখিকা কামিনী রায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ বইটি প্রকাশ হওয়া মাত্র কামিনী রায়ের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ভূমিকায় হেমচন্দ্র লিখেছিলেন, "এই কবিতাগুলি আমার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে ; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলত বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।"-বইটির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ সংস্করণটি তিনি হেমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন এইভাবে-

বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার,
লুকাইয়া ক্ষুদ্র তনু, ঢালে গীতধার,
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্র পাখী,
সেইরূপ আপনারে লুকাইয়া রাখি
তব স্নেহ-পত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান
লাজুক এ ভীরু কবি খুলি' কণ্ঠ, প্রাণ।
তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্ব্বাদ তব
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
বিংশতি বরষ ধরি' যেই গীতহার,
আজ লোকান্তর হ'তে তা'ই উপহার
লহ এ ভক্তের হাতে,-আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা' নয় ;
বিংশ বরষের মম পুরাতন গীত
ভকতি-চন্দন-লিপ্ত, নব-সুবাসিত-
পাবে তুমি আশা এই। আছে আশা আর,
পৌঁছে ধরণীর বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার।

১১. 'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থা : স্কুল কলেজের পাঠের ব্যবস্থার জন্য দ্বারকানাথ যখন লিপ্ত ছিলেন, দেশের তখনকার সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া পুরনারীদের তিনি সে সময়

বিস্মৃত হন নাই। তত্ত্ববোধিনীর দল, যেমন বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তনের জন্য দেশের শহরে শহরে পল্লীতে পল্লীতে "সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী" "নিত্যজ্ঞান প্রদায়িনী" প্রভৃতি সভা স্থাপন করিতেছিলেন, তেমনি লোক ও সমাজ হিতকর কার্য্য প্রবর্ত্তনের জন্য, 'হিতকরী সভা' 'শুভসাধিনী সভা' প্রভৃতি নামে সভা প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় স্থাপন, সুরাপান নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কাজ আরম্ভ করিয়া দেন।'
[দ্র. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : *বাংলার নারী-জাগরণ*, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, চৈত্র ১৩৫২, পৃ. ৭৭-৭৮]

১২. ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য 'ভারত সংস্কার সভা' স্থাপন রাষ্ট্রসাধনায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। একত্রে, মিলিত উপার্জনে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি স্থাপনপূর্বক জীবন নির্বাহের শিক্ষালাভের উদ্দেশে তিনি ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।
[দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল : 'বামাহিতৈষিণী সভা ও ভারতাশ্রম', *প্রবাসী*, আষাঢ় ১৩৫৭]

১৩. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী : শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশে ১২৫১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ এবং অনেকদিন অবধি প্রচারকের কাজ করেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু কোচবিহার-বিবাহসূত্রে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি কেশবচন্দ্রের সংসর্গ ত্যাগ করেন। বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একবার গয়াধামে এক যোগীবরের প্রভাবে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং কাশীতে উপবীত গ্রহণ করে পুনরায় তা পরিত্যাগ করেন। জীবনের শেষ অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ পুরীধামে বসবাস এবং হরিনাম ও ভগবৎপ্রসঙ্গ নিয়ে কালযাপন করতেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি প্রয়াত হন।

১৪. (উপাধ্যায়) গৌরগোবিন্দ রায়, ১৮৪১-১৯১২ : পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় জন্ম। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৬ অবধি পুলিশ বিভাগে সাব-ইন্‌সপেক্টর পদে কাজ করেন। অঘোরনাথ গুপ্তের প্রভাবে কেশবচন্দ্রের দলে যোগদান করে প্রচারকব্রত গ্রহণ করেন। 'কমলকুটির' সংলগ্ন প্রচারকদের আবাস ও পরে পত্নীবিয়োগের পর 'প্রচারাশ্রমে' বসবাস করতে থাকেন। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার সম্পাদনা করেন, ভিক্টোরিয়া স্কুলের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁকে ১৮৭৯ সালে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা নির্বাচন করেন ও 'উপাধ্যায়' উপাধি দেন। সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত তাঁর কয়েকটি বইয়ের নাম : 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা-সমন্বয়ভাষ্য' (১৮৯৮), 'বেদান্ত সমন্বয়ভাষ্য' (১৯০৬), 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' (১৯০৫), 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠযোগ' (১৯১০) ইত্যাদি।

১৫. হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় : ১৮৭৩ সালের ১৮ নভেম্বর এন্টালির ২২ নম্বর বেনিয়াপুকুর লেনে শ্রীমতী অ্যানেট্ অ্যাক্রয়েড হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। বেথুন স্কুলের তখনকার সেক্রেটারি মনোমোহন ঘোষ এই বিদ্যালয়টির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অ্যানেটের বিবাহের পর পরিচালনার অভাবে বিদ্যালয়টি ১৮৭৬-এর প্রথমদিকে বন্ধ হয়ে যায়। ১ জুন, ১৮৭৬ তারিখে দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির প্রচেষ্টায় স্কুলটি আবার নতুন করে খোলে। *Report on Public Instruction for 1876-77*-এ স্কুলটিকে সবচেয়ে উচ্চমানের মহিলা-বিদ্যালয় হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। ১ আগস্ট,

১৮৭৮ তারিখে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে একত্র হয়ে যায়।

১৫ক. রঘুনাথ শিরোমণি, ১৪৫৫-৬০-?। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গেশ উপাধ্যায় কর্তৃক 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থরচনার পর একাধিক নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি এবং মিথিলার পক্ষধর মিশ্র নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অল্পবয়সে পাঠ সমাপ্ত করে অধ্যাপনাকার্য শুরু করেন ও বিচারার্থ মিথিলার পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করেন (আনুমানিক ১৪৮০-৮৫)। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সহপাঠী ছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণির প্রধান গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি' প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে তাঁর জীবৎকালেই বাঙলায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

১৬. হেমলতা সরকার, ১৮৬৮-১৯৪৩ : পিতা : আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। মাতা : প্রসন্নময়ী। শিক্ষা : দুর্গামোহন দাস প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে এবং পরে বেথুন বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বেথুন কলেজে উচ্চশিক্ষালাভ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কামিনী সেন (পরে রায়), লাবণ্যপ্রভা বসু (পরে সরকার), কুমুদিনী খাস্তগীর (পরে দাস), সরলা মহলানবিশ প্রমুখ। ১৮৯৩ সালে ডাঃ বিপিনবিহারী সরকারের সঙ্গে বিবাহ। আনুমানিক ১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর সঙ্গে নেপাল গমন। এই প্রবাসবাসের ফল 'নেপালে বঙ্গনারী' (১৯১২)। স্বামীর সঙ্গে দার্জিলিং-এ থাকার সময় বর্ধমান, কুচবিহার ও ময়ূরভঞ্জের মহারাণীদের অর্থানুকূল্যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর মহারাণী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু তার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। দার্জিলিং-এ থাকাকালীনই ১৯০৮ সালে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ডেপুটি কলেক্টর ব্রজসুন্দর মিত্রের জীবন-চরিত রচনা শুরু করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭০ পৃষ্ঠার এই জীবনচরিত 'স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্মান্দোলনের আংশিক চিত্র' নামে ভ্রাতা প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। শ্রমসাধ্য ও তথ্যবহুল জীবনচরিত ও ইতিবৃত্ত রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত' (১৯২১) রচনা করেন। মুকুল ও প্রবাসী পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখা প্রকাশ করেছেন। তিনি ছোটদের উপযোগী 'মিবার গৌরব কথা' ও 'চিরদিন কি দুঃখে যায়' নামক দুটি পুস্তিকা ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক বিদ্যালয়পাঠ্য একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ৭৫ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রিয়ম্বদা দেবী, ১৮৭১-১৯৩৫ : কবি ও গদ্যলেখিকা। জন্ম : গুনাইগাছা, পাবনা। মাতা : প্রসন্নময়ী দেবী। স্বামী : মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের আইনজীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা : প্রবেশিকা (কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়, ১৮৮৮), এফ এ (১৮৯০), বি. এ. (বীটন কলেজ, ১৮৯২)। বৈধব্য (১৮৯৫)। একমাত্র সন্তান তারাকুমারের কাশীতে ছাত্রাবস্থায় প্রয়াণ (১৯০৬)। দীর্ঘদিন নারী-শিক্ষা প্রচারিকা ও ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কর্মাধ্যক্ষ। কাব্যগ্রন্থ : রেণু (১৯০০), তারা (১৯০৭), পত্রলেখা (১৯১১), অংশু (১৯২৭), চম্পা ও পাটল (১৯৩৯)। অন্যান্য রচনা : ঝিলে জঙ্গলে শিকার (অনুবাদ, ১৯২৪), অনাথ (১৯১৫), কথা ও উপকথা (১৯১৫), পঞ্চুলাল (১৯২৩) ইত্যাদি।

১৭. হ্যারিয়েট ডাফরিন (লেডি ডাফরিন) : ভারতমহিলাদের সুচিকিৎসার জন্য Countess of Dufferin's Fund নামে একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করেন। এই ভাণ্ডার থেকে কলকাতা-সহ ভারতের একাধিক শহরে স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল খোলা হয়। লেডি ডাফরিনের নামাঙ্কিত হাসপাতালটি স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য কলকাতার একটি অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান।

১৮. প্রসন্নকুমার রায় [ডঃ পি. কে. রায়], ১৮৪৯-১৯৩২ : ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। গিলক্রিস্ট বৃত্তিলাভ করে বিলেতে যান এবং মনোবিজ্ঞানে লন্ডন ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস-সি উপাধি অর্জন করেন। পাটনা, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হন (১৯০২-০৪)।

১৯. East India House is a vast edifice, it was originally founded in 1726, but was in 1798 so much altered and enlarged as to become almost an entire new building ; it comprises the principal offices of the East India Company, and contains several noble apartments. The Grand Court Room is a light and elegant apartment. The New Sale Room, a noble apartment, is ornamented with pilasters, and contains several paintings illustrative of Indian and other commerce. The Old Sale Room is embellished with the statues of Sir Eyre Coote, Lord Clive, Sir G. Pocock, and General Laurence. The room for the Committee of Correspondence is embellished with portraits of the Marquis Cornwallis and Warren Hastings, and with numerous views of Indian scenery. The Library, well stored with works on general literature, possesses, in addition, every book published upon the subject of Asia, and a fine collection of Chinese and Indian manuscripts, and the Museum adjoining it abounds in Indian Curiosities of every description.
[Source : www. victorianlondon. org]

২০. কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত [স্যার কে. জি. গুপ্ত, আই সি এস], ১৮৫১-১৯২৬ : জন্ম ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রামে। ঢাকা কলেজ থেকে পাস করে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৭৩ সালে আই সি এস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকার করেন। ১৮৮৭-তে বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। তিনিই বোর্ড অব রেভিনিউ-এর প্রথম ভারতীয় সদস্য (১৯০৪)। ১৯১৫ সালে ইন্ডিয়া অফিস থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

২১. Schreiner, Olive, 1855-1920 : South African author and feminist, b. Wittebergen Reserve, Cape Colony. After several years as a governess, she went to England in 1881, taking with her the manuscript of her famous novel, *The Story of an African Farm* (1883). Her later works included *Dreams* (1921), a collection of allegories ; *Women and Labour* (1911) ; and a significant novel, unfinished, *From Man to Man* (1926).

২২. ১৩৩৯-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ বসু।

২৩. "গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহু-সংখ্য ভদ্রলোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।..."
[এই বিবাহ প্রণালীর বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, পৌষ ১৭৮৯ শক।]

২৪. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৮১৭-১৮৫৮ : জন্মস্থান/পৈতৃকনিবাস : বিল্বগ্রাম-নদীয়া। পিতা : রামধন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীর্থ। অসাধারণ কবিত্বশক্তির জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী কর্তৃক 'কাব্যরত্নাকর' এবং বন্ধুবর্গ কর্তৃক 'তর্কলঙ্কার' উপাধি লাভ। ছাত্রাবস্থাতেই 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দু কলেজের পাঠ শেষে প্রথমে হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট পাঠশালায় ও পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করেন। মদনমোহন ১৮৪৬ খ্রী. সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৫০ খ্রী. অবশ্য ঐ কলেজ ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের পদ লাভ করেন ও ১৮৫৫ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। কলিকাতায় 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে অনেকগুলি প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করে মুদ্রিত করেন। ১৮৪৯ খ্রী. বেথুন কর্তৃক হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে তিনি সেই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন এবং নিজে বিনা বেতনে প্রতিদিন ঐ স্কুলে পড়াতেন। 'শিশুশিক্ষা' (তিন ভাগ) রচনা করে তাদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৮৫০) স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধও লিখেছিলেন।
'প্রারম্ভিক আয়োজনাদি সম্পূর্ণ হইলে বেথুন একুশটি মাত্র ছাত্রী লইয়া ১৮৪৯ সনের ৭ই মে দক্ষিণারঞ্জনের শিমুলিয়াস্থ বৈঠকখানা বাটীতে বিনা আড়ম্বরে বালিকা বিদ্যালয় খুলিলেন। ...পাছে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি আড়ম্বরপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া আখ্যাত হয় এই আশঙ্কায় তিনি ইংরেজ ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকেও আহ্বানে বিরত হইয়াছিলেন।... এখানকার প্রথম একুশ জন ছাত্রীর মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভুবনমালা ও কুন্দমালা নাম্নী দুই কন্যা। এরূপ প্রকাশ, তিনিই সর্ব্বাগ্রে কন্যাদের এখানে পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মদনমোহন বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবে ছাত্রীদের কিছুকাল পড়াইয়াছিলেন। তাহাদেরই উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিখ্যাত বাংলা বর্ণমালা রচিত হয়।'
[দ্র, যোগেশচন্দ্র বাগল : 'বেথুন স্কুল ও কলেজের কথা', *Bethune College and School Centenary Volume. 1849-1949*, ed. Dr. Kalidas Nag. Calcutta, n. d., পৃ. ২১৩-২১৪]

২৫. দীপ-নির্ব্বাণ। "কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলি-তেজে/উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম, রে আছিল/এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে/শুকাইল ফুল এবে, নিবিল দেউটী।"/মেঘনাদবধ কাব্য।/দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শ্রাবণ ১৮০৫ শক। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৷৷/০, ৩১৬, [29]।

২৬. বসন্ত-উৎসব। গীতিনাট্য। "দীপনির্ব্বাণ"-লেখনী-প্রসূত। কলিকাতা। বাল্মীকি যন্ত্রে। শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শক ১৮০১। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪০।

২৭. প্রফুল্লময়ী দেবী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক-রোগগ্রস্ত চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পত্নী এবং অকালপ্রয়াত প্রতিভাবান কবি ও প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের মা। পুত্র, পুত্রবধূ সাহানা দেবী ও স্বামীকে একাদিক্রমে হারিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। সম্ভবত ১৯৪০ সাল নাগাদ প্রফুল্লময়ীর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর একমাত্র রচনা 'আমাদের কথা' এক অসাধারণ স্মৃতিচারণ, *প্রবাসী* পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩৭ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়।

২৮. কাদম্বরী দেবী, ১৮৫৯-৮৫ : পিতা কলিকাতা নিবাসী শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ৫ জুলাই, ১৮৬৮ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কাদম্বরী পরিণীতা হন। প্রায় সমবয়সী রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনাকে 'নতুন বৌঠান' বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। কাদম্বরী দেবীকে কেন্দ্র করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারে নতুন একধরনের সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল। 'ভারতী'-গোষ্ঠীর বিভিন্ন লেখক, বিশেষ করে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ২১ এপ্রিল, ১৮৮৫ তিনি আত্মহত্যা করেন।

২৯. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৭০-৯৯ : কবি ও প্রাবন্ধিক। জন্ম জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। পিতা বীরেন্দ্রনাথ, মাতা প্রফুল্লময়ী, পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, স্ত্রী সাহানা দেবী (বিবাহ : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬)। শিক্ষা : সংস্কৃত কলেজ, প্রবেশিকা (হেয়ার স্কুল, ১৮৮৬)। স্বদেশী কারবারের প্রচেষ্টা ; কাব্য ও প্রবন্ধ রচনা। গ্রন্থ : চিত্র ও কাব্য (প্রবন্ধ, ১৩০১), মাধবিকা (কাব্য, ১৩০৩), শ্রাবণী (কাব্য, ১৩০৪)।

৩০. মালতী। উপন্যাস। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। "হৃদয়ে রয়েছ ত অবিরত, মদির-আঁখি,/হিয়া তোমারি কাছে বাঁধা আছে-জাননা তা' কি?/যদি আরেকতর মনে কর, বলিলো শুন,/একে অতনুশরে আছি মরো্যে মরিব পুন।।" —শকুন্তলা। শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত। কলিকাতা। অপার সারকুল্যার রোড, কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে। "ভারতী" যন্ত্রে। শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩০১ আষাঢ়। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪২।

৩১. ছিন্ন-মুকুল। দীপ-নির্ব্বাণ ও বসন্ত-উৎসব-রচয়িত্রী প্রণীত। "ওরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,/এ হেন কোমল পুষ্পে তোর কিরে বাসা।"/তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। কলিকাতা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে, শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৩৮।

গাথা। দীপ-নির্ব্বাণ-রচয়িত্রী-প্রণীত। কলিকাতা। বাল্মীকি যন্ত্রে। শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৭ সাল। মূল্য দশ আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৯৫, (6)।

৩২. ভারতী : শ্রাবণ ১২৮৪ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকল্প অনুযায়ী প্রকাশিত হয়।

'ভারতী' দীর্ঘকাল স্থায়ী একটি সাময়িকপত্র। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা দ্বারা পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হতো। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক। স্বর্ণকুমারী দেবী ১২৯১-১৩০১ এবং ১৩১৫-১৩২১-এই সময়সীমার মধ্যে 'ভারতী' সম্পাদনা করেন।

৩৩. পৃথিবী। দীপ-নির্ব্বাণ প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আশ্বিন ১২৮৯। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮৪, উপহারপত্র ১, সংশোধনপত্র ২, সূচিপত্র ৪, ভূমিকা ৪, উপক্রমণিকা ২৪, Opinion of the Press ১৪।

৩৪. মিবাররাজ। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ৫৫ নং অপর চিৎপুব রোড। জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮০।

বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭ সাল। মূল্য ১৷০। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৮২।

স্নেহলতা। সামাজিক উপন্যাস। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩১৪ ফাল্গুন। মূল্য ২ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : (প্রথমভাগ ১৯৭, দ্বিতীয়ভাগ ১৮২)।

ফুলের মালা। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১২ মার্চ, ১৮৯৫। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫৯। আমাদের ব্যবহৃত কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট।

কাহাকে?। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। কলিকাতা ; ভারতী কার্য্যালয় হইতে শ্রীচন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩০৫। আষাঢ়। ১৮৯৮। জুলাই। মূল্য ১৷০। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১২১।

হুগলীর ইমামবাড়ী। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ভবানীপুর মনোমোহন যন্ত্রে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ, আষাঢ়। মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৬০। [সচিত্র]।

৩৫. কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাস। মূল্য ১৷৷০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮১।

দেবকৌতুক। কাব্যনাট্য। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। মূল্য ১৷০। ১৩১২। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৯৬।

কবিতা ও গান। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কার্ত্তিক ১৩০২। মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৷০, ২৪০।

৩৬. সখিসমিতি : মহিলা থিয়সফিস্ট সভা ভেঙে যাবার পর সভানেত্রী স্বর্ণকুমারী এই সভার সম্ভ্রান্ত সদস্যদের নিয়ে ১৮৮৬ সালে সখিসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। 'সখিসমিতি' নামটি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। এই সমিতির উদ্যোগে অনেকবার মহিলা শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক বছর ধরে এই সমিতি সমাজসেবা, বিশেষ করে নারীদের হিতকর্মে রত ছিল।

৩৭. বিধবা-শিল্পাশ্রম : সখিসমিতির উদ্দেশ্য [দ্র. 'ভারতী ও বালক', পৌষ ১২৯৫] সঞ্জীবিত রাখার জন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী ১৯০৬ সালে পরিবর্তিত আকারে বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। হিরণ্ময়ী তাঁর মৃত্যুকাল (১৯২৫) অবধি শিল্পাশ্রম পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্বর্ণকুমারী দেবীর অধ্যক্ষতায় প্রতিষ্ঠানটি হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম নাম পরিগ্রহ করে পরিচালিত হতে থাকে।

৩৮. Freemasonry : Because of its identification with 19th century bourgeois liberalism, there has been much opposition to Freemasonry. Freemasonry's anticlerical attitude has also led to strong opposition from the Roman Catholic Church, which first expressed its anti-Masonic attitude in a bull of Pope Clement XII (1738). The Catholic Church still discourages its members from joining the order. Totalitarian states have always suppressed Freemasonry ; the lodges in Italy, Austria and Germany were forcibly eradicated under fascim and Nazism, and there are now no lodges in China.

৩৯. শ্রাদ্ধিকী [লেখকের নাম নেই]। কলিকাতা, আর্ট প্রেস। ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। ৩১ পৃষ্ঠা।

৩৯ক. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮)-এর 'কবিগাথা'-জাতীয় পাঠ্য পুস্তকাবলী (সংকলন), আশ্বিন ১২৮৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

৩৯খ. 'সাহিত্য' পত্রিকায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ-কৃত 'আলো ও ছায়া'র সমালোচনা কার্ত্তিক ১২৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৪০. ফণীন্দ্রনাথ পাল, ১২৮৮-১৩৪৬ ব. : সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। সম্পাদক : যমুনা (১৩১৯-৩০), ঝঙ্কার (১৩২২), গল্পলহরী (১৩৩২-৩৬), গল্পারতি (১৩৩৭-৩৮)। গ্রন্থ : ইন্দুমতী, সইমা (১৩১২), স্বামীর ভিটা, জীবন্ত সমাধি, রূপসী, ভৌতিক কাহিনী ইত্যাদি।

৪১. 'যমুনা' পত্রিকাটি ধীরেন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৩১১ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'যমুনা' প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালে, ধীরেন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায়। পরবর্তী যাঁরা সম্পাদক ছিলেন তাঁরা হলেন :

ধীরেন্দ্রনাথ পাল ও অন্যান্যেরা : ১৩১৭-১৮
ফণীন্দ্রনাথ পাল : ১৩১৯-২০
ফণীন্দ্রনাথ পাল ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ১৩২১-২৭

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও ফণীন্দ্রনাথ পাল : ১৩২৮-২৯
ফণীন্দ্রনাথ পাল ও চারুচন্দ্র মিত্র : ১৩৩০

৪২. অম্বা : লেখিকা কামিনী রায়। প্রকাশকাল : ১৯১৫। কামিনী রায়ের এই নাট্যকাব্যটি প্রকাশিত হবার ২৪ বছর আগে লিখিত হয়েছিল। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছিলেন-"আমার পরম স্নেহের পাত্রী কুমারী শ্রীমতী যামিনী দেবী ও স্বর্গীয়া প্রেমকুসুম দেবী সোদরাদ্বয়, এবং প্রিয়তমা ছাত্রী স্বর্গীয়া সরলা দেবী এই তিনজনের সহিত অম্বা রচনার স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত, সেই জন্য ইহাদের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।"

৪৩. হেমচন্দ্র (প্রথম খণ্ড : ১৮৩৮-১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ। ৮+৩৫১ পৃষ্ঠা। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩২৪ থেকে মাঘ ১৩২৫ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

হেমচন্দ্র (দ্বিতীয় খণ্ড . ১৮৭৫-১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ। [৭] + ৩৬০ পৃষ্ঠা। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩২৫ থেকে শ্রাবণ ১৩২৭ সংখ্যায় ধারাাহিকভাবে প্রকাশিত।

হেমচন্দ্র (তৃতীয় খণ্ড : ১৮৮২-১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ। [৮] + ৪১৩ পৃষ্ঠা। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩২৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।
[দ্র. অলোক রায় : 'মন্মথনাথ ঘোষ', *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* ১৫, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আশ্বিন ১৩৯১]।

৪৪. সরলা রায়, আনুমানিক ১৮৫৯-১৯৪৬ : পিতা দুর্গামোহন দাস। স্বামী অধ্যাপক পি. কে. রায়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রথম মহিলা সেক্রেটারি, গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ও নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের সভানেত্রী ছিলেন। লেডি অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১) তাঁর কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন।

লেডি অবলা বসু, ১৮৬৪-১৯৫১ : বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মসমাজের কর্মী ও নেতা দুর্গামোহন দাসের মধ্যম কন্যা এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী। ১৮৮২ সালে বেথুন স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৫ সালে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি এল. এম. এফ. পরীক্ষা পাস করেন। পরবর্তীকালে তিনি ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদামণির সংস্রবে আসেন ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৯১৯ সালে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন এবং শিল্পভবন ও বাণীভবন বিভাগদ্বয়ের মাধ্যমে বালবিধবা ও দুর্গতা নারীদের সাধারণ বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষার আয়োজন করেন। আমৃত্যু তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দুর্গামোহন দাস, আনুমানিক ১৮৪০-৯৭ : ব্রাহ্মনেতা ও প্রথমে বরিশাল শহরের ও পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যবহারজীবি। তাঁর উপার্জিত অর্থের বড় একটি অংশ তিনি জনহিতে ব্যয় করতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় যাঁরা অগ্রণী ছিলেন দুর্গমোহন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কলকাতার হিন্দু-মহিলা বিদ্যালয় ও পরে বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর সহায়তা অপবিসীম ছিল। পরবর্তী সময়ে বেথুন স্কুল ও কলেজ পরিচালনায়ও তিনি সহযোগিতা করেছিলেন।

৪৫. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১১) 'ভারত-উদ্ধার'-এর আখ্যাপত্রটি এরকম · ভাবত-উদ্ধার (খণ্ড-কাব্য)। ১২৮৪ সাল (২ জানুয়ারী ১৮৭৮)। পৃ. ৪৩। পর্ব্বোপলক্ষে উপহাব। ভারত-উদ্ধার। অথবা চারি আনা মাত্র। (ভবিষ্য ইতিহাসেব এক পৃষ্ঠা) শ্রীরামদাস শর্ম্ম-বিরচিত। "One must understand a thing to be able to enjoy it." "Every man is a caricature of himself when you strip him." কলিকাতা ক্যানিঙ্ লাইব্রেরী শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২৮৪।

৪৬. কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ১৮৪৩-১৯৩২ · জন্মস্থান কলিকাতা। পিতা : রামজয় তর্কালঙ্কার। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। ১৮৫৭ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৬০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাস করেন। প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, এবং পবে বিদ্যালযের উপ-পরিদর্শক ও শেষে প্রেসিডেন্সী কলেজেব অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮৬২)। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পাস করার পব অধ্যাপনা ছেড়ে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৮৪-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৮৯১ সালে রিপন কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন এবং ১৯০৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। কঁৎ-এর পজিটিভিজম্-এ বিশ্বাসী কৃষ্ণকমল সে যুগের তীক্ষ্ণধী নাস্তিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত 'দুবাকাঙ্ক্ষের বৃথা-ভ্রমণ' ও 'বিচিত্রবীর্য্য' গ্রন্থ দুটি অপবিণত বয়সের রচনা হলেও প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী। তাঁর 'পৌল ও বর্জিনী' মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ। সাপ্তাহিক পত্রিকা *হিতবাদী*-র প্রথম সম্পাদক। ভারতী, অবোধবন্ধু ও পূর্ণিমা-য় প্রকাশিত তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুশাস্ত্র চতুর্থ ভাগের সংকলক। তিনি *বাচস্পত্যাভিধান* সংকলনে তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে সাহায্য করেছিলেন এবং তারানাথ কর্তৃক 'বিদ্যাম্বুধি' উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সংস্কৃত কাব্যাদির ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশ করে ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য। প্রখ্যাত পণ্ডিত রামকমল তাঁর অগ্রজ।

৪৭. ..."১২৭৮ সালে প্রকাশিত 'কবিতাবলী'র ২য় [সংস্করণে] 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি বর্জ্জিত হইয়াছে, ...-বিশেষত এই জাতীয়তাবোধক কবিতাটি প্রথমে যখন 'এডুকেশন গেজেটে' (৭ শ্রাবণ, ১২৭৭) প্রকাশিত হয়, সেই সময় গবর্মেন্ট ভূদেববাবুর কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন।"
[দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়', *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* ৩, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ভাদ্র ১৩৬৮]।

৪৮. দশমহাবিদ্যা (১৮৮২) : রচয়িতা : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তার মিশ্রণে রচিত এই কাব্যটি এক সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

৪৯. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (স্যার, সি. আই. ই.), ১৮৬২-১৯৩৫ : জন্ম খানাকুল কৃষ্ণনগর, হুগলী। পিতা তখনকাব দিনেব নামী চিকিৎসক সূর্যকুমার। হেয়ার স্কুল থেকে ১৮৭৬ সালে একাধিক বৃত্তিসহ প্রবেশিকা, ১৮৮২-তে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম. এ. এবং ১৮৮৮ সালে অ্যাটর্নিশিপ পাস কবে দেবপ্রসাদ কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। রাজনীতিতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে 'ভারতসভা'র কাজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান সহকর্মী হন। ১৯১৩ সালে অ্যাবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল-এল ডি. উপাধি লাভ করেন। ১৯১৪-১৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারী উপাচার্য হন। ১৯২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতবাসীদের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য সেখানে যান। তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৩০ সালে জাতিসংঘে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। রচিত গ্রন্থ : 'ইউরোপে তিন মাস' এবং 'স্মৃতিবেখা'।

৫০. অশোক-সঙ্গীত : ১৯১৩ সালে কামিনী রায়েব ১৩ বছরের বালকপুত্র অশোক অ্যাপেন্ডিসাইটিস্ রোগে অস্ত্রোপচাবের পর প্রাণত্যাগ করে। শোকের আবেগে লেখা এই কাব্যপুস্তকটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৫১. 'মন্মথনাথের তিন পুত্র..., এবং চার কন্যা. । নিতান্ত অকালে অমল (১৯১১-২১)...পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে।'
[দ্র. অলোক রায়, 'মন্মথনাথ ঘোষ', *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* ১৫, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আশ্বিন ১৩৯১]।

৫২. নব্যভারত · মাসিকপত্র। সম্পাদকদের তালিকা :

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (বর্ষ ১ : ১২৯০-বর্ষ ৩৭ : ১৩২৬)
দেবীপ্রসন্ন ও প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী (বর্ষ ৩৮ : ১৩২৭)
ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী (বর্ষ ৩৯ : ১৩২৮-বর্ষ ৪৩ : ১৩৩২)

ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী : মৃত্যু ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। স্বামী প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী। স্বামীর মৃত্যুর পর 'নব্যভারত' মাসিকপত্রের ৩৯ বর্ষ থেকে ৪৩ বর্ষ (১৩২৮-১৩৩২) সম্পাদনার পর প্রয়াত হন। ফুল্লনলিনীর প্রয়াণের পর পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "প্রাচী", *প্রাচী,* বর্ষ ১/সংখ্যা ১, আষাঢ় ১৩৩০, পৃ. ১-২।
কামিনী রায় : "নব জাগরণ", *প্রাচী,* বর্ষ ১/সংখ্যা ২, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ১০৩-১০৪।

৫৪. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬৯-১৯৩৭ : সাহিত্যিক ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। জন্ম জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারে। পিতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। শিক্ষা : বি. এ. (প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১৮৯০)। 'তত্ত্বনিধি' উপাধিলাভ। আদি ব্রাহ্মসমাজের যুগ্ম-

সম্পাদক (১৮৯১)। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। গ্রন্থ : অভিব্যক্তিবাদ (১৩০১), আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা (১৯০১), ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি (১৩১৬), ওঁ পিতা নোঽসি (১৩২১), জর্ম্মণীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি (১৩২৭), কলিকাতায় চলাফেরা প্রভৃতি। সম্পাদক : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৯১৫-২৩)।

৫৫. দীপ ও ধূপ : ১৯২৯ সালে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থে নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত, বিভিন্ন সময়ে লেখা অনেক কবিতা সংকলিত হয়েছে।

৫৬. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৮৮১-১৯৬০ : জন্মস্থান : ভাগলপুর। পিতা : মহেন্দ্রনাথ। বি. এল. পাস করে ভাগলপুরে ওকালতি এবং পরে ওকালতি ত্যাগ করে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ। মাসিক পত্রিকা *বিচিত্রা*-র সম্পাদক। পরে আট বছর ধরে *গল্পভারতী*-র সম্পাদক ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সপ্তক' (১৯১২)। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : রাজপথ, দিকশূল, অন্তরাগ, স্মৃতিকথা (৪ খণ্ড) প্রভৃতি। সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নরসিংদাস পুরস্কার' এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'আনন্দবাজার পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লীলা বক্তৃতা' প্রদান করেন। সম্পর্কে তিনি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মামা ছিলেন।

৫৭. জীবন-পথে : কামিনী রায়-কৃত এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩০-এ প্রকাশিত হয়। তিন ভাগে বিভক্ত এই বইয়ের প্রথম ভাগে বিবাহিত জীবনের, দ্বিতীয় ভাগে বৈধব্য জীবনের এবং শেষভাগে নানা পারিবারিক ঘটনার স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তিনটি পর্বের নাম যথাক্রমে : সহযাত্রা, একলা ও ঝরাফুল।

৫৮. '১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দিল্লী গেলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তরুণকুমারের কয়েকদিনের জ্বরে মৃত্যু হইলে (২৯শে অক্টোবর ১৯৩২) তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাহার পর কয়েক মাসের মধ্যে দৌহিত্রী (১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) ও মাতৃদেবীর (১১ই মার্চ ১৯৩৩) মৃত্যু হওয়ায় তিনি আর দিল্লী ফিরিয়া যাইতে সম্মত হন না।...'
[দ্র. অলোক রায়, 'মন্মথনাথ ঘোষ', *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* ১৫, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আশ্বিন ১৩৯১, পৃ. ৮]।

—